
শেকড়হীন
শৈশব
গল্পেরা
অভীক দত্ত

লকডাউনে লেখা গল্পেরা

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

প্রথম প্রকাশ- জুলাই,২০২০

প্রচ্ছদ-সন্তু কর্মকার

https ://iwrite.app

যা যা গল্প রইল

মেঘ ছায়া

১

কলকাতা শহরটা সুপর্ণার ভাল লাগে না।

ঠিক ভাল খারাপের ব্যাপার নয় অবশ্য। শহরটাকে সে আদতে ভয় পায়। এই বড় একটা শহর, এত মানুষজন, বড় ভয় পাওয়ায় তাকে।

তাদের অশোকনগরে তো এত লোক ছিল না! বড় বড় মাঠ, মফঃস্বলের মাঝে একটা বড় গোলবাজার। সবই ফাঁকা ফাঁকা। গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি ব্যাপারটাই নেই।

অথচ অদ্রীশের সঙ্গে বিয়ের পর কলকাতায় আসার পর যেন দম বন্ধ হয়ে এল। এইটুকু একটা ফ্ল্যাটে, এভাবে বেঁচে থাকা বড় কষ্টকর।

অদ্রীশের উত্তরবঙ্গে বাড়ি। সে কলকাতায় একাই থাকে। বিয়ের পর প্রথম ক'টা দিন শিলিগুড়িতে থেকে তাদের কলকাতায় আসতে হল। শিলিগুড়িও বেশ খোলামেলা ছিল। সুপর্ণার ভাল লেগে গেছিল। কিন্তু এই ছোট ফ্ল্যাটটায় থাকা বড় কষ্টকর।

প্রথম প্রথম অদ্রীশ অফিস ডুব মারত। তখন অতটা খারাপ লাগত না।

ধীরে ধীরে সেটাও আর হল না। সোম থেকে শুক্র সুপর্ণার খুব খারাপ কাটে।

বিশেষত দুপুরগুলো। দুপুরে তার ঘুম আসে না। এ পাশ ও পাশ করেই সময় নষ্ট হয় যায়।

সকালে খেয়ে দেয়ে অদ্রীশ বেরোলে সুপর্ণা খুঁটিনাটি কাজ সারে।

এই সময়টা পাশের ফ্ল্যাটের গোপা কাকীমা এসে সিরিয়ালের গল্প করেন। সুপর্ণা আগে সিরিয়াল দেখত না। ইদানীং দেখতে শুরু করেছে। সময় কাটাতে হবে।

বাড়িতে আজকাল যেতে ইচ্ছা করে না। গেলেই কেন বাচ্চা হচ্ছে না শুনে শুনে মাথা খারাপ হয়ে যায়। অদ্রীশের এখনই কোন প্ল্যান নেই। অন্তত দু বছর পরে আরেকটা বড় কোন ফ্ল্যাটে ওঠার ইচ্ছা আছে, তখন দেখা যাবে বলেছে।

সুপর্ণা ইনিয়ে বিনিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেছে ফ্ল্যাটে থাকতে তার ইচ্ছা করে না। অদ্রীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। একটা গোটা বাড়ি কলকাতা শহরে নেওয়ার সাধ্য তার নেই।

সুপর্ণা রান্না করছিল, কলিং বেল বেজে উঠল।

সুপর্ণা দরজা খুলে দেখল মণীষা কাকীমা দাঁড়িয়ে। উপরের ফ্ল্যাটের। সে বলল "কিছু লাগবে কাকীমা?"

মণীষা কাকীমা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমায় কিছু টাকা ধার দিতে পারবে? রবিবারের মধ্যে দিয়ে দেব"।

সুপর্ণা বলল "কত লাগবে? আমার কাছে পাঁচশো মত আছে এখন"।

অদ্রীশ সুপর্ণাকে টাকা দিয়ে রাখতে চেয়েছিল। সুপর্ণা রাখে না। তার বড় টাকা হারাবার অভ্যাস। হিসেবের টাকা হারিয়ে গেলে সমস্যার শেষ থাকবে না।

কাকীমা বললেন "ওতে অবশ্য কিছু হবে না, তবু তাই দাও"।

সুপর্ণা কাকীমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরের ভিতর গেল। আলমারি খুলতে গিয়ে খেয়াল হল বাইরের ঘরে খস খস শব্দ হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে দরজার ফাঁকে চোখ লাগাল সে।

যা দেখল তাতে অবাক হল। কাকীমা কেমন পাগলের মত সোফা, টিভির শেলফ সব ঘাঁটছেন। অস্বস্তি হল সুপর্ণার। সে টাকাটা সরে দাঁড়াল। যা খোঁজার খুঁজে নিক। সে ঢুকলে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন ভদ্রমহিয়া। সেকেন্ড তিরিশেক পরে টাকাটা নিয়ে খানিকটা জোরে শব্দ করেই বসার ঘরে প্রবেশ করল। কাকীমা স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন "পেলে?"

সুপর্ণা পাঁচশোটাকার নোটটা কাকীমার দিকে এগিয়ে বলল "হ্যাঁ। এই যে"।

কাকীমা টাকাটা নিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেলেন।

সুপর্ণা অবাক হল। এটা ঠিক কী ব্যাপার হল?

ভদ্রমহিলা যদিও খুব বেশি এই ফ্ল্যাটে আসেন না, কিন্তু এরকম অদ্ভুত আচরণের অর্থ কী? ওর কী টাকার খুব দরকার? সুপর্ণা কৌতূহলী হল।

সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরোল। সিড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দেখল একজন লোক উপর থেকে মাথা নিচু করে নেমে চলে গেল।

এই লোকটাকে তো কখনও এখানে দেখা যায় নি। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ অপরিচিত।

সুপর্ণা ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকে গেল। গুচ্ছের কাজ বাকি।

কয়েক মিনিট পরে আবার বেল বাজল।

মণীষা কাকীমা।

সুপর্ণাকে দেখেই বললেন "তুমি কিছু মনে কর নি তো? আমি কয়েক দিনের মধ্যে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব"।

সুপর্ণা কিছু না বুঝেও হাসার চেষ্টা করল, "আচ্ছা কাকীমা। সে দেবেন"।

কাকীমা গলা নিচু করলেন, "এই কথাটা কেউ যেন না জানে। ঠিক আছে? আমি না হয় তোমাকে আরও পঞ্চাশটাকা বেশি ফেরত দেব"।

সুপর্ণা মাথা নাড়ল, "না না কাকীমা, আমি কাউকে বলব না। আপনাকে কোন টাকা বেশি দেওয়ার দরকার নেই"।

কাকীমা তার হাত ধরে তাতে আলতো চাপ দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। এলাম"।

বলে আর অপেক্ষা না করে চলে গেলেন।

সুপর্ণা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। এই কথাটা তার মানে গোপা কাকীমার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে না। মহা সমস্যা হল তো!

বেশিক্ষণ কথা পেটে চেপে রাখলে তার পেট ব্যথা করে। এক্ষেত্রে মণীষা কাকীমা বলেছেন যখন, তখন সত্যিই বলা যাবে না। মহা সমস্যা হল।

সুপর্ণা দরজা বন্ধ করল। লোকটা ওরকম করে চলে যাবে কেন? কী ব্যাপার কে জানে!

২।

সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে।

গোপা কাকীমা এসেছেন। টিভিতে সিরিয়াল চলছে।

দুজনে মিলে সিরিয়াল দেখছে।

গোপা কাকীমা বললেন, "তোমার মুখটা আজ একটু কেমন কেমন লাগছে বৌমা? কিছু হয়েছে নাকি?"

সুপর্ণা বুঝতে পারল না মণীষা কাকীমার কথাটা বলবে নাকি। সে একটু ভেবে না বলাই মনস্থ করল। বলল "না কাকীমা, সেরকম কিছু না তো"।

গোপা বললেন, "তা ভাল। বলবে না মানে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তাই না? ও এখন তো ঝগড়ার সময়। আমরাও কত ঝগড়া করতুম। এখনও ঝগড়া হয়। তবে কি এখন আর সেরকম মানভঞ্জন হয়? ঝগড়া হত সকালে, বিকেলে অফিস থেকে ফেরার সময় তোমার কাকু হাতে করে আলুর চপ বা বেগনী নিয়ে চলে এলেন। এখন সেসবের বালাই নেই কো!"

সুপর্ণা হাসল, "আরে না না, কাকীমা সত্যিই সেসব কিছু হয় নি। কেন বলুন তো? কীরকম লাগছে আমার মুখ?"

গোপা বললেন, "সে বোঝা যায়। বয়স কম হল বৌমা?"

সুপর্ণা মাথা নাড়ল, "না না সেসব কিছু না"।

বিজ্ঞাপনের বিরতির পর সিরিয়াল শুরু হল। দুজনে আবার মন দিল টিভিতে।

কলিং বেল বেজে উঠল। গোপা বললেন, "দ্যাখো গে, কে এল আবার"।

সুপর্ণা উঠে দরজা খুলে দেখল মণীষা কাকীমাই দাঁড়িয়ে। সে বলল "হ্যাঁ কাকীমা বলুন"।

মণীষা কাকীমা ঘরের ভিতর গোপা কাকীমাকে এক পলক দেখে তাকে বললেন, "আমি পরে আসব। কথা আছে", বলে চলে গেলেন।

সুপর্ণা বুঝতে পারল না কী বলবে। গোপা কাকীমা মণীষাকে দেখতে পেয়েছিলেন। সুপর্ণা দরজা বন্ধ করলে বললেন "কী জন্য এসেছিল?"

সুপর্ণা বলল, "জানি না কাকীমা। বললেন পরে আসবে"।

গোপা গম্ভীর মুখে বললেন "অদ্ভুত মানুষ একটা। অদ্রীশ এখানে আসার দু তিন মাস আগে ফ্ল্যাট কিনে এসেছে। কারও সঙ্গে কথা বলে না। চুপ চাপ থাকে। দুয়েকবার গেছিলুম আড্ডা মারতে। সে পারলে তাড়াতে পারলে বাঁচে। বড় খারাপ লেগেছিল বুঝলে"।

সুপর্ণা বলল "এ বাবা, তাই নাকি? তারপরে আর যান নি?"

গোপা মাথা নাড়লেন, "না। তারপরে আমি আর যাই নি। আমার কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে পরের ঘরে নাক গলাতে যাব? তবে আমার মনে হয় এর বরের অন্য কোথাও সংসার আছে"।

সুপর্ণা অবাক হয়ে বলল "মানে?"

গোপা গলা নামিয়ে বললেন, "প্রায়ই তো ভদ্রলোক বাড়িতে ফেরেন না। ইনি একাই থাকেন। সন্তান সন্ততি নেই। কী করে সারাদিন ঘরের মধ্যে কে জানে। আমার কী বাপু, আমার অন্যের সংসারে নাক গলাতে ভাল লাগে না"।

সুপর্ণা মাথা নাড়ল, "আচ্ছা"।

গোপা গজগজ করতে করতে টিভি দেখতে লাগলেন, "কে জানে তোমার কাছে কেন এসেছিল। উনি যাই বলুক, তুমি কিন্তু আমাকে জানাবে। আবার কী চায়, দেখতে হবে তো"!

সুপর্ণা বলল "ঠিক আছে, কাকীমা, উনি যা বলবেন, আমি সব বলব আপনাকে"।

গোপা বললেন, "এরকম ফ্ল্যাটবাড়িতে থেকে দম আটকে যায় বাপু। কবে যে তোমার কাকু মেন্ট করবেন, আর আমরা উত্তরপাড়ার বাড়িতে চলে যাব। গেলে বাঁচি"।

সুপর্ণা মন খারাপের মুখ করে বলল, "সে কী কাকীমা, আমি তো একা হয়ে যাব তবে? এরকম দুপুরগুলো কাটবে কী করে?"

গোপা চিন্তিত মুখে বললেন ,"তাও অবিশ্যি ঠিক। আচ্ছা এখনও তো এক বছর আছে, সে দেখা যাবে কী করব। তা কী রান্না করলে আজ?"

সুপর্ণা বলল, "ভাত, ডাল, লাউয়ের ছিলকা ভাজা, মাছের ঝোল, আর একটু টমেটোর চাটনি করেছি"।

গোপা বললেন “বাহ। আমি একটু মুড়িঘন্ট করেছি। দিয়ে যাব তোমায়”।
সুপর্ণা খুশি হল। কাকীমা ভাল রান্না করেন। এদিকে মনটা কৌতূহলী হয়ে উঠছে। মণীষা কাকীমা কী বলতে চান শুনতে ইচ্ছে করছিল। সে চুপ করে বসে টিভি দেখতে লাগল।
৩।
মণীষাকাকীমা দুপুরের দিকে এলেন। সুপর্ণা খেয়ে ঘুমাবে ঠিক করছিল।
মুড়িঘন্ট খেতে এত ভাল হয়েছিল যে অন্য কিছু ছোঁয় নি আর। চাটনি খেয়েছিল অল্প।
খেয়ে উঠে ফেসবুক ঘাঁটতে শুরু করতে না করতেই মণীষাকাকীমা এলেন। সে দরজা খুলতে তড়িঘড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে বললেন, “দরজাটা বন্ধ কর”।
সুপর্ণা দরজা বন্ধ করল।
মণীষাকাকীমা তার হাত ধরে বললেন, “শোন, তুমি যে আমাকে টাকাটা দিয়েছো, গোপাদিকে বলো নি তো?”
সুপর্ণা বলল “না না, আপনি তো কাউকে বলতে বারণ করেছেন”।
মণীষা তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে কিছু একটা বুঝতে চাইলেন যেন। তারপর বললেন, “আমি একটু বসতে পারি?”
সুপর্ণা বলল “নিশ্চয়ই”।
মণীষা বসলেন। হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন, “আমার খারাপ লাগছে। তোমাকে হয়ত তোমার বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। টাকার হিসেব দিতে হয়, না?”
সুপর্ণা মাথা নাড়ল, “না না। কী যে বলেন। সেসব কিছু দিতে হয় না”।
মণীষা বললেন “তাও ভাল। তুমি কিন্তু খুব সুন্দর ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে রেখেছো”।
সুপর্ণার মনে পড়ে গেল সে যখন টাকা আনতে গেছিল, কাকীমা ঘরে কিছু একটা খুঁজছিলেন। তখন থেকেই তার মনটা অস্থির হয়ে আছে। ভীষণ ভাবে জানতে ইচ্ছা করছে কাকীমা কী খুঁজছিলেন। ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করতে পারছিল না।
সে বলল “কিছু খাবেন কাকীমা? মিষ্টি খাবেন?”
মণীষা বললেন, “না না। আমি কিছু খাব না। আচ্ছা তুমি একা একা সারাদিন কী কর?”
সুপর্ণা বলল, “টিভি দেখি, রান্না করি। তেমন কিছু করার নেই”।
মণীষা বললেন, “সেটাই। কীই বা করার থাকে”।
দুজনেই চুপ করে গেল।
সুপর্ণার অস্বস্তি হচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল না মণীষা কেন এসেছেন।
মণীষা কয়েক সেকেন্ড পর বললেন, “তোমার বাপের বাড়ি কোথায়?”
সুপর্ণা বলল “অশোকনগর”।
মণীষা বললেন, “টালিগঞ্জ অশোকনগর?”
সুপর্ণা মাথা নাড়ল, “না না। হাবড়া অশোকনগর”।
মণীষার চোখ উজ্জ্বল হল, “ওহ, আচ্ছা। আমারও তো ঐ লাইনেই বাপের বাড়ি। চাঁদপাড়ায়। তুমি গেছো কোন দিন চাঁদপাড়া?”
সুপর্ণা বলল “না। ওদিকটা কোন দিন যাওয়া হয় নি”।
মণীষা বললেন “তোমরা তো বিয়ে হবার পরে এই ফ্ল্যাটে এলে। তার কিছুদিন আগে তোমার হাজব্যান্ড একা ছিল। ভাল ছেলে। কোন সাড়াশব্দ নেই”।

সুপর্ণা চুপ করে রইল। অদ্রীশের প্রশংসায় তার কীই বা বলার আছে।
মণীষা খানিক ইতস্তত করে বললেন "তোমাকে একটা কথা বলি। কিছু মনে করবে না তো?"
সুপর্ণা বলল "না। বলুন না"।
মণীষা সুপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি স্বামীর দিব্যি খাও, কাউকে কথাটা বলবে না?"
সুপর্ণা বলল, "দিব্যি খেলাম। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন"।
মণীষা কেঁদে ফেললেন হঠাৎ করে। সুপর্ণা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তবে কিছু করল না। চুপ করে বসে রইল। কয়েক মিনিট কেঁদে শান্ত হলেন মণীষা। বললেন, "আমি খুব অশান্তিতে আছি। আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আমার অনেক দিন ধরেই ঝামেলা লেগে রয়েছে। আমি কী করব বুঝতে না পেরে একটা সময় ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ি। তারপর থেকে কিছুতেই সামলাতে পারি না। তোমার কাছে এই জন্যই আমি টাকাটা চেয়েছিলাম। আমি ফেরত দিয়ে দেব। আমার হাজব্যান্ড ফিরলেই আমি টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেব"।
সুপর্ণা হতভম্ব হয়ে মণীষার দিকে তাকাল। এ কী সমস্যা হল? এই জন্যই তখন পাগলের মত খুঁজছিলেন যাতে কিছু নিয়ে গিয়ে বেচতে পারেন। তার এক বন্ধু ছিল একই ধরণের। শিবু নাম। এরা ঠিক সুবিধের প্রকৃতির হয় না। টাকার জন্য মানুষ খুন পর্যন্ত করতে পারে। সে বলল, "ঠিক আছে কাকীমা। কোন অসুবিধা নেই। আপনি দেবেন যখন খুশি"।
মণীষা উদভ্রান্তের মত উঠে চলে গেলেন। সুপর্ণা মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। এ তো মহা সমস্যা হল! কাকে বলা যায় কথাটা? অদ্রীশকেই বলতে হবে।
সুপর্ণা ঠিক করল, অদ্রীশ অফিস থেকে ফিরলে কথাটা তুলবে।

৪।

দুপুরে এপাশ ওপাশ করে ঘুম আসছিল না প্রথমে। তবে এলো খানিকক্ষণ পরে।
ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে। সুপর্ণা দরজা খুলে দেখল অদ্রীশ এসে গেছে। হাতে একটা মিষ্টির প্যাকেট। সে অবাক হয়ে বলল "কী ব্যাপার? মিষ্টি কেন হঠাৎ?"
অদ্রীশ চোখ নাচিয়ে বলল "সারপ্রাইজ আছে"।
সুপর্ণা বলল "প্রমোশোন হয়েছে?"
অদ্রীশ দরজা বন্ধ করে ব্যাগ আর মিষ্টির প্যাকেট টেবিলের ওপর সুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "শুধু তাই না, একটা বড় ফ্ল্যাটে শিফটও করাচ্ছে কোম্পানি"।
সুপর্ণা খুশি হয়ে বলল "সিরিয়াসলি?"
অদ্রীশ সুপর্ণার ঘাড়ে চুমু দিয়ে বলল "ভীষণ সিরিয়াসলি। যত সিরিয়াসলি তোমাকে ভালবাসি, তত সিরিয়াসলি"।
সুপর্ণা অদ্রীশকে সরাতে গেল, "ধুস, জামা প্যান্ট ছাড়ল না, হাত পা ধুলো না, শুরু করে দিল"।
অদ্রীশ সুপর্ণাকে কোলে তুলে বেডরুমে নিয়ে গেল সুপর্ণার শত আপত্তি সত্ত্বেও। সুপর্ণা আর বাধা দিতে পারল না। তারও ভাল লাগছিল। পরস্পরকে আদর করল অনেকক্ষণ ধরে তারা।
অনেক আদর করার পরে অদ্রীশ বলল "আমার জীবনের লাকি চার্ম তুমি। দেখো, এখানে এলে, আর সঙ্গে সঙ্গে কতটা এগিয়ে গেলাম কেরিয়রে"।
সুপর্ণা অদ্রীশের বুকে চুমু খেয়ে বলল "সেসব কিচ্ছু না। সব তুমি নিজের পরিশ্রমে পেয়েছো। একদম বলবে না এগুলো"।
অদ্রীশ বলল "আচ্ছা শোন, তিনটে বেডরুম হবে। একটা তাহলে আমাদের সোনার ঘর হবে বল?"
সুপর্ণা অবাক হয়ে বলল "কে সোনা?"

অদ্রীশ সুপর্ণার কোমর খামচে ধরে বলল “বোঝো না তুমি? আমাদের সন্তান”।
সুপর্ণা লজ্জা পেয়ে বলল “ধ্যাত”।
বাইরে সন্ধ্যে নেমেছে। সুপর্ণা বেশ খানিকক্ষণ অদ্রীশের বুকে শুয়ে থেকে বলল, “এবার আমাকে ছাড়া যায়? চা করি? কিছু খাও”।
অদ্রীশ বলল “আজ অনলাইন অর্ডার হোক। কোথাও উঠতে হবে না তোমায়। বল কী খাবে?”
সুপর্ণা বলল “হ্যাঁ, আমি হাত পুড়িয়ে রান্না করেছি সকালে, সেগুলো সব ফেলে দেব না? আর গোপা কাকীমা মুড়িঘন্ট দিয়েছে, সেটার কী হবে?”
অদ্রীশ বলল “কাল খাব সেসব গরম করে। শোও না। থাকো আমার কাছে”।
সুপর্ণা অদ্রীশকে জড়িয়ে ধরে বলল “আচ্ছা, শুলাম। এবার বল”।
অদ্রীশ বলল “একটা ঘরে লাইব্রেরী করব। বইপত্র থাকবে। আর তোমার জন্য মডিউলার কিচেন”।
সুপর্ণা বলল “তোমাকে শুধু শিফট করাচ্ছে। ফ্ল্যাটটা দিয়ে দিচ্ছে না। এত খরচ কেন করতে যাবে বলতো?”
অদ্রীশ বলল “করব। কী সমস্যা? ভাল থাকতে ইচ্ছা করে না? আমাদের ব্যাংকের অনেক অফিসারই কত ভাল থাকে। আমি অনেক কষ্ট করেছি। তোমাকেও অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এখন ভালভাবে বাঁচি। সমস্যা আছে তোমার?”
সুপর্ণা অদ্রীশের গালে চুমু খেয়ে বলল “কষ্ট করতে হলে করতে হবে। তুমি সেভিংস কর। যতটা প্রয়োজন, আমরা ততটা থাকব। অত বড়লোকি চালচলন দরকার নেই আমার। মডিউলার কিচেন না হলে কি রান্না হবে না? সবই হবে। ভাল থাকাটা বড় কথা। বড়লোকি থাকাটা না”।
অদ্রীশ বলল “ঠিক আছে, কিন্তু আমার বুক শেলফটা কিন্তু চাই”।
সুপর্ণা বলল, “আচ্ছা। কিনো”।
অদ্রীশ বলল “আর একটা বিরাট বড় টিভি”।
সুপর্ণা বলল “বিরাট টিভি লাগবে না। এটাই ঠিক আছে। টিভি তো তুমি দেখো না। বড় টিভি দিয়ে কী হবে?”
অদ্রীশ সুপর্ণার ঘাড়ে আদর করে বলল, “তোমাকে এত কষ্ট করতে কে বলেছে বল তো? তোমার জন্য কি আমাকে কিছুই করতে দেবে না?”
সুপর্ণা বলল “না। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাও। বুকশেলফ অবশ্য দরকার। বইপত্রগুলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় রেখে দিয়েছো। আচ্ছা শিফট কবে করছি?”
অদ্রীশ বলল “এই সপ্তাহেই”।
সুপর্ণা অবাক হয়ে বলল “ওরে বাবা। এত তাড়াতাড়ি? ঈশ, গোপাকাকীমার জন্য মন খারাপ হবে”।
অদ্রীশ বলল “তা হবে। কাকীমা তোমাকে অনেক হেল্প করেন। আচ্ছা, ফোনে যোগাযোগ রাখবে। অসুবিধা কী আছে?”
সুপর্ণা বলল “ওখানে আবার নতুন বন্ধু করতে হবে। কেমন লোক থাকবে কে জানে”।
অদ্রীশ বলল “সেরকম হলে বন্ধু করবে না। আর যদি তোমার ওয়েভলেংথের কাউকে পাও, তাহলে তো হয়েই গেল”।
সুপর্ণা অদ্রীশের বুকে মাথা রেখে বলল “একজন মানুষের কত জায়গা লাগে?”
অদ্রীশ বলল “এখন ওরকম মনে হচ্ছে। আমার তোমার বাড়ি থেকে লোক এলে, আমাদের সন্তান এলে, দেখবে এইটুকু ফ্ল্যাটে খুব সমস্যা হয়ে যাবে”।

সুপর্ণা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কলিং বেল বেজে উঠল। সুপর্ণা বলল "ঈশ! কে এল এখন। সর সর, উঠে দেখে আসি"।

অদ্রীশ রেগে গিয়ে বলল "খেয়ে দেয়ে কাজ নেই লোকের। বউকে আদরও করতে দেবে না। যতসব!"

৫

দরজা খুলে সুপর্ণা দেখল একজন ছেলে একটা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক হয়ে বলল "আপনি?"

ছেলেটা বলল "সুপর্ণা সেন আপনি?"

সুপর্ণা মাথা নাড়ল। ছেলেটা বুকেটা তাকে দিয়ে বলল "আপনার জন্য এটা"।

সুপর্ণা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থাতে বুকেটা নিতে না নিতেই ছেলেটা চলে গেল। বিস্মিত অবস্থায় বুকেটা হাতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজা বন্ধ করল সে।

বেডরুম থেকে অদ্রীশ গলা তুলল "কে গো?"

সুপর্ণা বুকেটা নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল "দেখো। কে পাঠিয়েছে"।

অদ্রীশ বিবস্ত্র ছিল। উঠে পায়জামা পরে অবাক হয়ে বুকেটার ধরে বলল "এ দেখি তোমাকে পাঠিয়েছে। এই তো, কার্ড"।

সুপর্ণা বলল "সেটাই তো বুঝতে পারছি না। কে পাঠাবে আমাকে?"

অদ্রীশ হাসতে হাসতে বলল, "তোমার কোন সিক্রেট অ্যাডমায়ারার!"

সুপর্ণা বলল "ধ্যাত। সেসব আমার কোন কালেই ছিল না"।

অদ্রীশ বলল "হ্যাঁ। তোমাকে দেখে সেরকম ছেলে চড়ানো মেয়ে কখনই লাগে নি আমার"।

সুপর্ণা অদ্রীশকে চিমটি কেটে বলল,"উল্টো পালটা কথা না বলে দয়া করে একটু উদ্ধার করার চেষ্টা কর কে পাঠাল। আচ্ছা, এটা তোমারই কাজ না? আমি শিওর"

অদ্রীশ মাথা নাড়ল, "না রে বাবা। এটা আমার কাজ না"।

সুপর্ণা ভয় পেয়ে বলল "তাহলে বুকেটা ফেলে দাও। আমার কেমন ভয় ভয় করছে। কী না কী আছে এর ভেতরে কে জানে"!

অদ্রীশ বলল "ধুস, ফেলে দেওয়ার কী আছে? ড্রয়িং রুমে রেখে দাও। শোভা বর্ধন করুক। হয়ত দেখা গেল তোমাদের বাড়ি বা আমাদের বাড়ি থেকে কেউ পাঠিয়েছে। পরে ফোন করে খোঁজ নিল। তখন যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি যদি জানতে পারেন আমরা জিনিসটা ফেলে দিয়েছি, তাহলে আরেক কেলো"।

সুপর্ণা বলল "সকাল থেকে যে কী কী সব হচ্ছে! ভাল লাগছে না আর"।

অদ্রীশ বলল "কী হচ্ছে? কিছু বল নি তো। কী হয়েছে সকাল থেকে?"

সুপর্ণার হঠাৎ করে মণীষা কাকীমার কাতর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল "কী আর হবে? ঐ যে তুমি বললে চলে যেতে হবে এখানে ছেড়ে। আমার কেমন কেমন লাগছে গোপা কাকিমাদের জন্য"।

অদ্রীশ হেসে সুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বলল "দূর পাগলী। সব জায়গা এত মায়ায় মাখিয়ে ফেললে হয় বুঝি? আমরা আসব তো। এরকম ভাবছো কেন?"

সুপর্ণা বলল "ছাই আসব। ওরকম মনে হয়। আসলে আর আসা হয়ে উঠবে না। ধীরে ধীরে যোগাযোগটাও কমে যাবে। দ্যাখো না, ছোটবেলা থেকে অশোকনগরে জন্মালাম, বড় হলাম। এখন নিজের বাড়িতে কতবার ফোন করা হয়? আমরা যেখানে থাকি, সেখান থেকে শিকড় উপড়ে চলে এলে আর ফিরে যাওয়া হয় বুঝি?"

অদ্রীশ সুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আচ্ছা, আমি যদি কোন দিন মরে যাই, তুমি যদি আরেকটা বিয়ে কর, তাহলে বুঝি তুমি আমাকে পুরোপুরি ভুলে যাবে?"
সুপর্ণা অদ্রীশের পেটে একটা ঢুষো মেরে বলল "এসব বললে খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু। এসব কথা আমার একদম ভাল লাগে না"।
অদ্রীশ ঢুষো খেয়ে ছিটকে খাটে বসে পড়েছিল। সে অবস্থাতেই সুপর্ণাকে টেনে কোলে বসিয়ে ঠোঁটে গভীর চুমু খেয়ে বলল "খুব ভালবাসো বুঝি?"
সুপর্ণার চোখে জল এসে গেছিল। অদ্রীশকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আবার যদি এসব কথা বলেছো, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। আবার এসব বলবে, তারপর কোনদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখবে আমি মরে পড়ে আছি"।
অদ্রীশ সুপর্ণার গলায়, বুকে চুমু খেতে খেতে বলল "আচ্ছা বাবু। আর বলব না, খুশি"?
সুপর্ণা আত্মসমর্পণ করল অদ্রীশের কাছে। পরস্পরকে আদরে ভরিয়ে তুলল তারা।
সঙ্গম শেষে অদ্রীশ সুপর্ণার বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকল।
সুপর্ণা অদ্রীশের চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলল, "ছেলে হলে কী নাম দেবে?"
অদ্রীশ বলল "মেয়ে হবে দেখবে। একদম তোমার মত। খুব আদরে রাখব"।
সুপর্ণা বলল "আচ্ছা। তুমি যেমন চাইবে"।
অদ্রীশ বলল "এই তুমিই কত পাল্টে যাবে। আচ্ছা শোন, আমার মেয়েকে মারবে না কিন্তু একবারে"।
সুপর্ণা হাসল "মারব না কেন? শাসনে রাখতে হবে না?
অদ্রীশ সুপর্ণার নাক টিপে দিয়ে বলল, "সে রাখবে। কিন্তু বেশি না একদম। আমার কষ্ট হবে"।
সুপর্ণা বলল, "আচ্ছা। তাই হবে। যেমন তুমি চাইবে, আমি তেমন করে মানুষ করব"।
অদ্রীশ বলল "দাঁড়াও, খাবার অর্ডার করা যাক? আজ চাইনিজ খাই?"
সুপর্ণা বলল "ঠিক আছে। যা বলবে"।
অদ্রীশ বলল "সেলিব্রেট করলে না বাড়িতে খাবার এনে করা উচিত না। আমাদের উচিত বাইরে গিয়ে খাওয়া। সেই তো তোমাকে থালা বাসন মাজতে হবে। যাবে?"
সুপর্ণা বলল "আচ্ছা চল। ঘুরে আসি"।
অদ্রীশ উঠে বলল "চল। তৈরী হও। সময় নিও না বেশি"।
সুপর্ণা বলল "আচ্ছা। সালোয়ার কামিজ পরে নি"।
অদ্রীশ বলল "আমি তাহলে ক্যাব বুক করি"।
দুজনেই তড়িঘড়ি তৈরী হতে শুরু করল।

৬

তাদের ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা বাজল। ঘরে ঢুকে সুপর্ণা বলল "একগাদা বিল করে ফেললে আজ। এত টাকা খরচা করার কোন দরকার ছিল না। আগে জানলে আমি বারণ করতাম"।
অদ্রীশ সুপর্ণার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, "বেশ করেছি। আমার বউকেই তো খাইয়েছি। আর কাকে খাওয়াব?"
সুপর্ণা বলল "হু। যত উল্টো পালটা কথা"।
ঘরে ঢুকে অদ্রীশের চোখ পড়ল ব্যুকেটার ওপর। বলল "ব্যুকেটার ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত লাগছে বল?"
সুপর্ণা বলল "লাগছে তো। আমি তো বুঝতেই পারছি না কে দিতে পারে"।

অদ্রীশ বলল "এরকম হতে পারে, আমাদের বিয়েতে আমন্ত্রিত ছিল, তখন আসতে পারে নি, এখন পাঠিয়ে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ফোন করে পাঠাতে পারত। এভাবে পাঠানোর মানে কী? তাছাড়া ব্যুকেটা বেশ দামী। তুমি দেখো, মামুলি জায়গা থেকে পাঠায় নি। সেই যে অনলাইন সাইটগুলো হয় না, সেখান থেকে পাঠিয়েছে। এ অর্কিডের ব্যুকে। বেশ দামী"।

সুপর্ণা বলল "ফেলে দি। আমার কেমন লাগছে"।

অদ্রীশ রেগে গেল, "এই তুমি বার বার ফেলে দি বলছ কেন বলত? থাক না। আচ্ছা, দাঁড়াও আমি চেঞ্জ করে আসি। তোমার আজ হচ্ছে"।

সুপর্ণা হেসে ফেলল, "আচ্ছা। বাথরুমে বেশিক্ষণ নিও না। তুমি তো বাথরুমে ঢুকলে আর বেরোতেই চাও না"।

অদ্রীশ বলল "আচ্ছা হুজুরাইন। আমি বেশিক্ষণ নেবো না"।

অদ্রীশ বাথরুমে ঢুকল। কামিজ ছাড়তে গিয়ে হঠাৎ করে ব্যুকেটার ওপর চোখ পড়ল তার। কার্ডটা টেবিলের ওপরেই আছে। তার নাম লেখা।

ব্যুকেটা হাতে নিল সে। অর্কিডগুলো কী সুন্দর! দামী হবে খুব? হাত বোলাতে আরাম লাগছিল। হঠাৎ করে সে খেয়াল করল, একটা ছোট্ট চিরকুট আছে ভিতরের দিকে।

কৌতূহলবশত চিরকুটটা বের করে দেখল সেটায় লেখা "BEWARE! Don't Trust Anyone"!

তার বুকটা ধক করে উঠল। কাউকে বিশ্বাস করবে না?

মানে অদ্রীশকেও বিশ্বাস করা যাবে না? সে চিরকুটটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে ডাস্টবিনে ফেলে দিল।

বিশ্বাস করা যাবে না মানেটা কী? নিজের বিয়ে করা বরকে বিশ্বাস করবে না? এরকম হয় নাকি?

স্পন্দিত বুকে কয়েক সেকেন্ড বসে রইল সুপর্ণা। প্রথমে মণীষাকাকীমা, এখন এই বেনামী ব্যুকে এবং তার সঙ্গে এই চিরকুটটা! ঠিক কী হচ্ছে?

অদ্রীশ বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল "কী হল, এরকম ল্যাংটো হয়ে বসে আছো কেন?"

সুপর্ণা জিভ কাটল। সে যে কিছু পড়ে নি ভুলে গেছিল। তাড়াতাড়ি নাইট ড্রেসটা পরতে গেল। অদ্রীশ তাকে জড়িয়ে ধরল, "পর নি যখন, তখন একটু আদর হয়ে যাক"।

সুপর্ণা জাগল না। সে বলল "আমি হাত পা ধুয়ে আসি?"

অদ্রীশ তার কথা শুনল না। তাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চুমু খেতে শুরু করল। সুপর্ণা ছাদের দিকে তাকাল। কাউকে বিশ্বাস করবে না? নিজের বরকেও না? কেন করবে না?

অদ্রীশ ঠোঁটে চুমু খেতে শুরু করল তার। সাড় না পেয়ে মুখ তুলে বলল "কী হল সোনা? ইচ্ছা করছে না?"

সুপর্ণা হাসার চেষ্টা করল, "দাঁত মাজি নি। আমার মুখে চিকেনের গন্ধ পাবে তো"।

অদ্রীশ নাক দিয়ে তার নাকে ঘষে বলল, "বেশ তো। আরেকবার চিকেন খাওয়া হয়ে যাবে। তোমার আপত্তি আছে?"

সুপর্ণা বলল "আচ্ছা। এসো"।

দুজনে আবার রতিক্রিয়ায় মগ্ন হল। অদ্রীশের শরীরের গন্ধ বড় ভাল লাগে সুপর্ণার। এই সময়ে তবু মনটা কেমন খচখচ করছিল। অনেক চেষ্টা করেও ডুবে যেতে পারছিল না অদ্রীশের শরীরে। বেশ খানিকক্ষণ বাদে অদ্রীশ শান্ত হল। তার শরীরের উপরে শুয়ে পড়ে বলল "সোনা"।

সুপর্ণা বলল "হু"।

অদ্রীশ বলল, "আজ একটু বেশি আদর হয়ে গেল, বল?"

সুপর্ণা বলল "হু"।

অদ্রীশ কয়েক মিনিট এ কথা সে কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ল।
সুপর্ণা সন্তর্পণে অদ্রীশকে সরিয়ে উঠে বসল। বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে এসে নাইট ড্রেস পরল। অদ্রীশের ফোনে মেসেজ আসার শব্দ হল। সুপর্ণা দেখল মেসেজ এসছে সেটা দেখাচ্ছে, কিন্তু কোত্থেকে এসেছে, কী মেসেজ এসেছে, কিছুই দেখাচ্ছে না। অদ্রীশের আই ফোন। অফিস থেকে দিয়েছে। ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর, ফেস আইডি দুটোই আছে। অদ্রীশের চোখ দেখলে ফোন আনলক হয়।
বিয়ের পর থেকে কোন বারেই সুপর্ণা অদ্রীশের ফোন খোলার চেষ্টা করে নি। এবার কৌতূহল হচ্ছিল ভীষণ। সে ফোনটা হাতে নিল। বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। অদ্রীশের ঘুমানোর সময় নাক ডাকে। এখনও নাক ডাকছে। সে ঘুমন্ত অদ্রীশের মুখের কাছে ফোনটা নিয়ে গেল। আনলক হল না।
পিন চাইছে।
সুপর্ণা হাল ছেড়ে দিল। ফোনটা টেবিলের ওপর রেখে সে অদ্রীশের পাশে শুল।
ঘুম এল না। চোখ বন্ধ করলেই চিরকুটের লেখাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতে শুরু করল, ""BEWARE! Don't Trust Anyone"! কী অদ্ভুত!
৭
অদ্রীশ তাকে ছুঁয়ে শুয়ে আছে। অদ্রীশের হাত তার শরীরে লেগে আছে।
সম্বন্ধটা এনেছিল বড়মামা। কোত্থেকে যেন যোগাযোগ হয়ে গেছিল। ছেলে কলকাতায় চাকরি করে। উত্তরবঙ্গে বাড়ি। বাবা, মা, জ্যেঠু, জ্যেঠিমা, মামা, মামী সবাই উত্তরবঙ্গে অদ্রীশের বাড়ি থেকে ঘুরে এল। বাবা খোঁজখবর নিল অদ্রীশের অফিসে। সব জানাশোনা করেই বিয়েটা হল।
বিয়ের আগে ফোনে কথা হত মাঝে মাঝে। বেশি কথা না। সামান্যই। সুপর্ণার লজ্জা হত। একটা অন্যরকম ভাললাগাও যে থাকত না, তা নয়। ফুলশয্যার দিন অদ্রীশের হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করা। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ একটা মেয়ের কাছে যতটা ভয়ের ব্যাপার, সুপর্ণার কাছে সেটা হয় নি। অদ্রীশ তার খুব খেয়াল রাখে। কোন রকম অসুবিধে হলে নজর রাখে। সাবান শেষ হলে, নেলপালিশ শেষ হলে, কাজল শেষ হলে ঠিক সময়ে জিনিসগুলো চলে আসে। সে যে কলকাতায় একা আছে, সে একাকীত্বটা তো সেভাবে তাকে অনুভবই করতে হয় নি। একটা অজানা, অচেনা মানুষের চিরকুট সব কিছু এভাবে গুলিয়ে দিচ্ছে কেন তবে? অদ্রীশের ফোন ধরার কথা সে কস্মিনকালেও ভাবে নি। অদ্রীশও কোন কালে তার ফোন ঘাঁটে নি। দুজনেই দুজনের প্রাইভেসীতে হাত দেয় নি। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটার সময় সুপর্ণার ইচ্ছা করছিল অদ্রীশের ফোন ঘাঁটতে।
অদ্রীশ সত্যিই কি এমন কিছু লুকিয়েছে তার কাছে যেটা থেকে তার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সুপর্ণার অস্বস্তি হচ্ছিল। এই অস্বস্তিটা তার চিরকাল হয়। যখন মনে হয় কিছু জিনিস তার জানা দরকার অথচ জানতে পারছে না, তখনই তার এই অস্বস্তিটা হয়। বুক ধড়ফড় করে। জল পিপাসা পায়। সে উঠল। বাইরের ঘরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বের করল। অনেকটা জল খেল।
নিস্তব্ধ চারদিক। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচলের শব্দ হচ্ছে শুধু। শহর ঘুমায় না। কিছু গাড়ি থাকবেই যারা রাস্তায় চলবে। মাঝে মাঝে পুলিশের গাড়ি যায় সাইরেন বাজিয়ে। বেসিনে গিয়ে সুপর্ণা চোখে মুখে জল দিল। ঘাড়ে জল দিল। ডাইনিং টেবিলে বসল। এই সংসার তার সাজানো। যখন প্রথম এসেছিল একটা তক্তপোষ ছিল। বাবা টাকা দিয়েছিল। খাট কিনল। আলমারী কিনল। একটু একটু করে ঘর সাজিয়েছে। কোন ঘর সাজানোর দোকানে গিয়ে ছোট ছোট শো পিস কিনে এনেছে সে। ছোট্ট সংসারটা একটু একটু করে গুছিয়েছে। অদ্রীশ অফিস থেকে ফিরতে প্রতিদিন তাকে জড়িয়ে ধরেছে। পরস্পরকে আদরে ভরিয়ে দিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে নব দাম্পত্য সুখে ভরে উঠেছে।

বাইরে থেকে একটা আওয়াজ আসায় সুপর্ণা সচকিত হল। অদ্ভুত তো! এই সময়ে বিল্ডিং এর গেট বন্ধ হয়ে যায়। কে এল এখন? কী হোলে চোখ রেখে দেখল মণীষা কাকীমার স্বামী টলতে টলতে উপরে উঠছেন। সুপর্ণা ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় একটা বাজে। এত রাতে মদ খেয়ে ভদ্রলোক ফ্ল্যাটে এলেন? নিচের গেটের চাবি যদিও সব ফ্ল্যাটের লোকের কাছেই থাকে, তবু ভদ্রলোক এত রাতে এলেন? এরকম সময়ে কখনও জেগে থাকে নি সে। সাধারনত রোজ রাতেই তারা পরস্পরকে আদর করে, সুপর্ণার ঘুম বেশ গাঢ়। এজন্যই কি সে কোন দিন জানতে পারে নি মণীষাকাকীমার স্বামী রোজ এত রাতে ফেরেন?
"তুমি এখানে কী করছ?"
অদ্রীশের গলা শুনে চমকে উঠল সুপর্ণা। কখন যে অদ্রীশ উঠে পড়েছে খেয়াল করে নি সে।
স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল সে "উফ, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে পুরো। এরকম করে পিছন থেকে আসে নাকি?"
অদ্রীশ ঘুম চোখে বলল "আমার ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ করে। দেখি তুমি পাশে নেই। এসে দেখছি তুমি কী হোলে চোখ লাগিয়ে বসে আছো। কী হয়েছে কী?"
সুপর্ণা অদ্রীশের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল "মণীষা কাকীমার হাজব্যান্ড এখন এলেন। সেটাই দেখছিলাম"।
অদ্রীশ বলল "ও। উনি এরকমই। রাম মাতাল তো। তোমার ঘুম ভেঙে গেছিল?"
সুপর্ণা আর বলল না তার ঘুমই হয় নি। সে বলল "হ্যাঁ। আমি জল খেতে এলাম। এসে শব্দ শুনে দেখি এই কান্ড"।
অদ্রীশ হাসল "ভয় পেয়ে যাবে তো। একা একা এরকম দেখো না। যদি ভূত আসে?"
সুপর্ণা অদ্রীশের হাত শক্ত করে ধরে বলল "ওরে বাবা, রাত বিরেতে ভূতের কথা বোল না। আমার ভূতে বড় ভয়"।
অদ্রীশ সুপর্ণার গাল টিপে দিয়ে বলল "ওরে আমার সোনা খুকী রে, ভূত তোমার ঐ অশোকনগরেই থাকবে। কলকাতা শহরে ভূতের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। যাও শুয়ে পড়। আমি বাথরুম সেরে আসছি"।
সুপর্ণা মাথা নাড়ল "আচ্ছা"।
অদ্রীশ বাথরুমে ঢুকলে সুপর্ণা ঘরের আলো জ্বালিয়ে ব্যুকেটার ভিতরে ভাল করে খোঁজ করল। নাহ। আর কোন চিরকুট নেই। সে আলো নিভিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল।
বাথরুম থেকে ফিরে অদ্রীশ শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মনে কর খাটের তলায় একটা ভূতবাবাজী আছে, আর তুমি খাট থেকে নামতেই তোমায় ঘ্যাক করে ধরে ফেলল"।
সুপর্ণা শিউরে উঠে অদ্রীশের বুকে আলতো কিল মেরে বলল "এরকম করলে মোটেই ভাল হবে না বলে দিচ্ছি"।
অদ্রীশ বলল "কিংবা জানলার বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পর্দাটা সরালেই..."
সুপর্ণা অদ্রীশের মুখে হাত রাখল, "যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছো, থামবে?"
অদ্রীশ হাসতে হাসতে সুপর্ণাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল "আচ্ছা আর বলব না। শোও"।
সুপর্ণা অদ্রীশের আঙুল কামড়ে বলল, "অসভ্য একটা"।
৮
অদ্রীশকে জড়িয়ে ধরে সুপর্ণার চোখ খানিকটা লেগে এসেছিল।
আধো ঘুম, আধো জাগরণে তার একটা কথা মনে পড়তে চোখ খুলে গেল।

একদিন আগেই অদ্রীশ একটা বড় স্যুটকেস অফিস থেকে নিয়ে এসে এই ঘরের খাটের তলায় রেখেছে। জিজ্ঞেস করতে বলেছে অফিসের বিভিন্ন ফাইল আছে তার মধ্যে।
কথাটা মনে পড়তে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। স্যুটকেসটা যথেষ্ট বড়। কী থাকতে পারে তার মধ্যে?
সব সন্দেহ অদ্রীশের ওপরেই যাচ্ছে কেন বারবার? ওর ফোনের আনলক করার পিন চাইবে অদ্রীশের কাছে? যদি দিতে না চায় তাহলে কী হবে?
একটা মানুষ, যাকে সে একরকমভাবে চিনে এসেছে, সেই মানুষটা যদি অপরিচিত হয়ে যায় তার কাছে, তাহলে তার থেকে বড় সমস্যা আর কী হতে পারে? অদ্রীশের মধ্যে কী এমন ব্যাপার আছে যা সে জানে না।
সে তো আজ জানত না মণীষা কাকীমা ড্রাগ নেন! টাকার জন্য এরকম করতে পারেন। যখন কোন মানুষ সম্পর্কে হঠাৎ করে নতুন তথ্য জানা যায়, তখন চমকিত হতে হয় বৈকি। তার পৃথিবীটাই তো অদ্রীশ। অদ্রীশ যদি অপরিচিত কেউ হয় তাহলে কাকে বিশ্বাস করবে?
মার কথা মনে পড়ল হঠাৎ করে। বিয়ের দিন কেমন কাঁদছিল। এই পরশুও মা ফোন করেছে। সে রান্না করছিল বলে কথা বলতে পারে নি। বলেছিল পরে ফোন করবে, অথচ আর করা হয়ে উঠল না। এখন মার কাছে যেতে ইচ্ছা করছে কেন? অদ্রীশের এত আদর, এত ভালবাসা সত্ত্বেও তার নিজের খাটটায় ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। এই বিয়েটার জন্য কত প্রস্তুতি, কত আত্মীয়স্বজন দূর দূর থেকে এলো। কত মজা হল। এখন যদি জানা যায় অদ্রীশ ঠিক মানুষ নয়, তাহলে কী হবে? উল্টো পালটা ভাবতে ভাবতে সুপর্ণা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। জানলা দিয়ে রাস্তার আলো এসে পড়ছে ঘরের ভিতরে। পাড়ার কুকুরগুলো তারস্বরে ডাকতে শুরু করেছে কেন জানে না। রোজ রাতের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারগুলোই তার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। এই তো তারা চাইনিজ খেতে গেল, হাতে হাত রেখে বসল, কত কিছু খেল, খাবার পরে আবার অদ্রীশ ব্রাউনি খাওয়াল, এটা সেটা আলোচনা হল, কখনই তো ওকে অপরিচিত কেউ বলে মনে হয় নি! চিরকুটটা দেখার পর থেকে সব কেমন পাল্টে গেল। ইংরেজি কয়েকটা শব্দ এভাবে সব কিছু তোলপাড় করে দিতে পারে, ভাবতেও পারে নি সে। নিজের মনকেই প্রবোধ দিল সুপর্ণা, কাল সকালেই হয়ত দেখা যাবে, ভেতরের চিরকুটটা অন্য কারো জন্য ছিল। রাতের বেলা যে জিনিসটাকে খুব ভয়ংকর মনে হয়, দিনের আলো পড়লে সে জিনিসটাই স্বাভাবিক হয়ে ধরা দেয়। জীবনের মজাটাই এখানে।
অদ্রীশের কাজ কর্মে তো এতদিন অবধি সেরকম অস্বাভাবিক কিছুই মনে হয় নি। অফিসে কী কী হয়, রোজই বলে তাকে। আসছে শীতে অফিসের সবার সঙ্গে পিকনিকে যাওয়া হবে, সেই প্ল্যানের কথাও তাকে বলেছে অদ্রীশ। কখনো, কোন কথাতেই কোন রকম সন্দেহ জাগে নি। সুপর্ণা ঠিক করল, অদ্রীশ অফিস যাবার পরে স্যুটকেসটার মধ্যে কী আছে বোঝার চেষ্টা করবে।
কৌতূহল, আশংকা, ভয়, সব মিলিয়ে একটা মিশ্র অনুভূতি তাকে ঘিরে ধরছিল। এই ফ্ল্যাট বাড়ি ছেড়ে অদ্রীশ তাকে আরেকটা ফ্ল্যাটে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি কোম্পানি এতগুলো টাকা দিচ্ছে? একটা মেয়েকে অর্থনৈতিকভাবে যখন কোন ছেলের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়, তখন সব কিছুই মেনে নিতে হয়। অদ্রীশ ঠিক কী কাজ করে সে জানার চেষ্টা করে নি সেভাবে। তার গ্র্যাজুয়েশন বাংলা ভাষায়। অদ্রীশ কমপিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ছাত্র। চাকরিও সেসব নিয়েই। এর বাইরে তো সে কিছু জানেও না!
সুপর্ণা ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে তিনটে বাজে। একটা চিরকুট তাকে এতক্ষণ জাগিয়ে রাখল। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এল যখন, তখন চারটে বেজে গেছে।

সুপর্ণার ঘুম যখন ভাঙল তখন অদ্রীশ তৈরী হয়ে গেছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসল “আমাকে ডাকবে না? ঈস, তোমার টিফিন করে দিতে হবে তো!”
অদ্রীশ বলল “আমার সোনা বউটা ঘুমোচ্ছে, আমি তাকে তুলে দেব? পাগল আমি? খেয়ে নেব বাইরে থেকে। এসব নিয়ে ভেবো না”।
সুপর্ণা বলল “না না, তা হয় নাকি। দাঁড়াও আমি অন্তত ডিম পাউরুটি করে দি। নইলে কালকের ভাত আছে, ভাতভাজা করে দি?”
অদ্রীশ সুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বলল “কিচ্ছু করতে হবে না বাবু। আমি ঠিক খেয়ে নেব। পাগলামি কোর না। রেস্ট কর তো। সারাদিন একগাদা রান্না করে যাও শুধু”।
সুপর্ণা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল “দেখো, তুমি না খেয়ে গেলে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। প্লিজ একটু সময় দাও। মাছ আছে কালকের। আমি একটু ভাত গরম করে দিই?”
অদ্রীশ হাল ছেড়ে দিয়ে বলল “বেশ। তাই হোক। তুমি কথা শোনবার নও আমি জানি। আচ্ছা ধীরে সুস্থে কর। আমি অফিসে ফোন করে বলছি যেতে একটু দেরী হবে”।
সুপর্ণা বেসিনে গিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুল। দাঁত মাজল। রান্নাঘরে ঢুকে খাবার গরম করতে করতে কালকের চিরকুটটার কথা মনে পড়ে যেতে অস্বস্তিটা আবার জাঁকিয়ে এল।
অদ্রীশ টেবিলে বসে টেবিলে তবলা বাজাচ্ছে। গরম ভাতের থালাটা টেবিলে দিতে অদ্রীশ বলল, “আচ্ছা শোন, আমি পরশু যে স্যুটকেসটা এনেছিলাম, ওটা সাবধানে রাখবে। অফিসের কিছু ইম্পরট্যান্ট ফাইল আছে। আমি কালকে নিয়ে যাব সেটা। ঠিক আছে?”
সুপর্ণার বুকটা ধক করে উঠল। সে বলল “আচ্ছা”।
অদ্রীশ খাওয়া শুরু করল। সুপর্ণা বলল “একটা ওমলেট ভেজে দিই?”
অদ্রীশ বলল “ধুস, অত কিছুর দরকার নেই। তুমি বস তো”।
সুপর্ণা ইতস্তত করে বলল, “আচ্ছা, কালকে যে ফটোগুলো তোমার ফোনে তুললে, দেখালে না তো!”
অদ্রীশ ফোনটা পকেট থেকে বের করে আনলক করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “দেখো না। তোমাকে কী মিষ্টি লাগছে দেখো”।
কম্পিত বুকে সুপর্ণা ফোনটা হাতে নিল। গ্যালারিতে ফটোগুলো সোয়াইপ করে দেখতে লাগল।
অদ্রীশ বলল “কী ভাল ক্যামেরা না? আমি তোমাকেও একটা এরকম ফোন কিনে দেব, হাতে একটু টাকা আসুক”।
ফটোগুলো দেখে সুপর্ণা অদ্রীশকে ফোনটা ফেরত দিয়ে বলল, “ধুস, অতটাকা দিয়ে আমাকে ফোন দিতে হবে না। তোমার শুধু টাকা খরচের ছুতো। জমাও তো”।
অদ্রীশ হাসল, “আর তোমার শুধু জমানোর ছুতো। একটু খরচও কর গিন্নিমা। আমি ফ্ল্যাটটা আজকে দেখতে যাব। ফার্নিচার কিন্তু দুজনে মিলে কিনব। কেমন”?
সুপর্ণা ঘাড় নাড়ল।
অদ্রীশ তাড়াতাড়ি খাচ্ছিল। খাওয়া শেষে উঠে দাঁত মেজে জুতো পরে বলল ‘বিদায় চুম্বন দেবে না?”
সুপর্ণা খানিকটা কেঁপে উঠে বলল, “বিদায় চুম্বন মানে? এসব কী কথা?”
অদ্রীশ তার কোমরে হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, “আবার কী কথা গিন্নি? আদর কর”।
সুপর্ণা অদ্রীশের ঠোঁটে আদর করল। অদ্রীশ জড়িয়ে বলল, “যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু যেতে হবে। কী করব বল। প্রাইভেট অফিস”।
সুপর্ণা বলল “সাবধানে যেও। রাস্তা পার হবে সাবধানে”।

অদ্রীশ তার কপালে চুমু খেয়ে বলল “যদি নতুন ফ্ল্যাটে যাই, ফটো পাঠাবো। দেখো”।
সুপর্ণা ঘাড় নাড়ল, “আচ্ছা”।
অদ্রীশ বেরোলে সুপর্ণা দরজা বন্ধ করে ত্রস্ত পায়ে বেডরুমে ঢুকে স্যুটকেসটা বের করল। বেশ ভারি স্যুটকেস। নাড়িয়ে কান পাতল। নাহ, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। চাবি অদ্রীশের কাছেই আছে। অন্যদিন হলে সে ঘরের কাজ শুরু করে দিত এতক্ষণে।
এখন মেঝেতে চুপ করে বসে রইল। মনের অশান্তি কিছুতেই দূর করতে পারছিল না। অদ্রীশ কে? কোন অপরাধী? টিভিতে যেমন দেখায়?
আলমারি খুলে অদ্রীশের ভোটার আই কার্ড, পাসপোর্ট সব দেখল সে। শিলিগুড়ির ঠিকানাই আছে। সব নিখুঁত। এত নিখুঁত জিনিসই কি সন্দেহের কারণ?
বাবাকে ফোন করল সে। কয়েকটা ফোন হতেই বাবা ধরল, “কী রে, আমাদের তো ভুলেই গেছিস তুই”।
সুপর্ণা জানত বাবা এই অনুযোগটা করবেই। সে বলল “ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম আসলে। তোমরা কেমন আছো?”
বাবা বলল “যেমন থাকি। চলছে। বাজার করে ফিরলাম। আর বলিস না, জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে না!”
সুপর্ণা আর থাকতে না পেরে বলল, “আচ্ছা, বাবা, তুমি অদ্রীশের অফিসে গেছিলে না?”
বাবা বলল “হ্যাঁ, গেছিলাম তো, কেন বলত?”
সুপর্ণা বলল “না না, সেরকম কিছু না। আজকাল তো জানোই প্রাইভেট চাকরির অবস্থা কেমন, তাই একটু ভয় হয়”।
বাবা হাসল “ধুস, এত ইনসিকিউরিটিতে ভুগিস না। ছেলে হীরের টুকরো। আর অফিসটাও বেশ ভাল। ওসব জালি, ফোর টুয়েন্টি মার্কা অফিসে আমাদের জামাই কাজ করে না। নিশ্চিন্ত থাক তো। উল্টো পালটা ভাববি না। কোন কিছু সমস্যা হলে আমাকে ফোন করবি। আমরা আছি তো। একদম ভুল ভাল ভাববি না, ঠিক আছে?”
সুপর্ণা “ঠিক আছে” বলে তড়িঘড়ি ফোনটা কেটে দিল। বাবাকে বেশি কিছু বলা যাবে না। বললেই চিন্তা করতে শুরু করে দেবে। সে ভাল করে আলমারি তল্লাশি শুরু করল। যা যা ডকুমেন্ট আছে সব বের করে দেখল। কোথাও কোন সমস্যা নেই। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড থেকে এম সি এর রেজাল্ট। সব ঠিক ঠাক। তবু অস্থির লাগছিল।
স্যুটকেসটার দিকে চোখ গেল এবার তার। কী থাকতে পারে এটার ভিতরে?

১০

সুপর্ণার কিছু খেতে ইচ্ছা করছিল না। গতকালের ভাত ছিল। একটু ডাল বসাল। ঠিক করল মাছ ভাজা দিয়ে ডাল দিয়ে খাবে। মনটা অশান্ত হয়ে আছে। কোন কাজে মন বসাতে পারছে না। বিয়ের অ্যালবাম দেখল কিছুক্ষণ ধরে। অবিশ্বাস করার মত তো কিছু নেই! অদ্রীশের এরকম কোন কথা বা কাজ নেই, যা অবিশ্বাস করা যেতে পারে।
প্রতিদিন একটু পরের দিকে টিভি চালায়। এদিন আগেই চালাল। কলিং বেল বাজতে দরজা খুলতে দেখল মণীষা কাকীমা দাঁড়িয়ে আছেন।
সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।
মণীষা কাকীমা তার হাতে পাঁচশোটাকার নোটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, “আমার হাজব্যান্ড কাল এসেছেন। তুমি এই টাকাটা রাখো”।

সুপর্ণা মণীষা কাকীমার দিকে তাকাল। কেমন শীর্ণকায় চেহারা। চোখের তলায় কালি। ড্রাগ নিলে এরকম চেহারা হয়ে যায়? সে বলল "আপনার কোন অসুবিধে হলে পরেও দিতে পারেন। খুব একটা অসুবিধে নেই কাকীমা"।

মণীষা মাথা নাড়লেন, "না না, রাখো। হাউজওয়াইফদের কাছে তো টাকা থাকে না। কী অবস্থা হয় হঠাৎ করে সে তো আমি জানি"।

সুপর্ণা টাকাটা নিল। বলল "ভিতরে আসবেন না?"

কাকীমা বললেন "নাহ। ওর আবার কী লাগে কে জানে। দেখি"।

মণীষা কাকীমা চলে গেলেন। সুপর্ণা একটু অবাক হল এইবারে। কাল কেমন করে হাতড়াচ্ছিলেন তাদের ড্রয়িং রুমের সোফা, আজ ঢুকতেও চাইলেন না। তার মানে তার হাজব্যান্ড কি নেশার জিনিস নিয়ে এসেছেন, যার ফলে তিনি এখন আবার স্বাভাবিক হতে পেরেছেন?

সুপর্ণার মনে পড়ল, তার জ্যেঠতুতোদাদার এক বন্ধু ছিল শুভ্র বলে, ভীষণভাবে ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল। এমনিতে ভীষণ সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু যখনই টাকায় টান পড়ত, চুরি করে বেড়াত। তার দাদার ক্যালকুলেটর চুরি করে বেচে দিয়েছিল ছেলেটা। জ্যেঠু খুব ঝামেলা করেছিল ওদের বাড়িতে গিয়ে। শুভ্রর বাবাও ওকে ভীষণ মারধোর করেছিল, কিন্তু তাতে ওর কোন পরিবর্তন হয় নি। বাড়ি থেকে রি হ্যাবে পাঠানো হয়েছিল। মারাত্মক খাটাতো নাকি। দিনে দেড়শোটা করে রুটি করাতো ওকে দিয়ে। একদিন সেখান থেকেও পালিয়ে চলে এসেছিল। শুভ্রর বাবা ছেলের চিন্তায় স্ট্রোক হয়ে মারা গেছিলেন। তাদের সম্পত্তি ছিল। কয়েক মাসের মধ্যে শুভ্র সব সম্পত্তি ড্রাগের পিছনে খরচ করে ফেলল। একদিন ট্রেনে গলা দিল। ড্রাগের পরিণতি কখনোই ভাল হয় না। কেউ কষ্ট থেকে শুরু করে, কেউ বা নতুন অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। মণীষা কাকীমা কেন শুরু করেছিলেন? একাকীত্ব থেকে? কে জানে?

কত মানুষের যে কত রকম কষ্ট কে জানে! সেও যদি জানতে পারে অদ্রীশের অন্য কোথাও সম্পর্ক আছে বা অদ্রীশ কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে তার মধ্যেও অনেক কিছু পরিবর্তন আসবে। বাড়িতে তো আর নেবে না। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে বেশিরভাগ বাবাই মনে করে বিড়াল পার করা হয়ে গেল। অপ্রিয় সত্যি এটা। তার বাবার রিটায়ার হয়েছে। মা কান কামড়ে বলে দিয়েছে অদ্রীশের সঙ্গে সে যেন ভালভাবে থাকে। কখনো যেন রাগ দেখিয়ে বাপের বাড়ি চলে না আসে। আজকাল চারপাশে ডিভোর্সের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গেছে। অদ্রীশ যদি...

সুপর্ণার সেই অস্বস্তিটা ফিরে এল। ফ্রিজে আইসক্রিম ছিল। বের করে খেতে শুরু করল। আইসক্রিম খেলেই গলা ভাঙে তার। এখন আর সেসব মাথায় আনতে ইচ্ছা করছিল না। গলা ভাঙলে ভাঙবে। কী আর করা যাবে?

গোপা কাকীমা এলেন আরো খানিকক্ষণ বাদে। অনেকটা কচুর লতি নিয়ে এলেন। তাকে বললেন, "তুমি তো বাপু বাঙাল মানুষ। কচির লতি খাও নিশ্চয়ই"?

সুপর্ণা বলল, "হ্যাঁ। আপনি কি কাকুদের বাড়ির থেকে শিখেছেন?"

গোপা কাকীমা বললেন "হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে কচুর লতি খাওয়া হত না। আমি আমার শাশুড়ির থেকে শিখেছিলাম। উনি যা রাঁধতেন না, তুমি ভাবতে পারবে নি"।

সুপর্ণা বলল "জানো কাকীমা, কাল উপরের কাকু, অনেক রাত করে ফিরল। টলতে টলতে"।

গোপা কাকীমা বললেন, "ওরকম সময়েই ফেরেন উনি। আমি জানি তো। তাও রোজ ফেরেন না। বেহেড মাতাল। আর ওই মহিলার সঙ্গে একবার কী ঝামেলা, সে তোমাকে আর কী বলব!"

সুপর্ণা বলল "কী নিয়ে?"

গোপা কাকীমা গলা নামিয়ে বললেন, "উনি টাকা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, দেখে গেল ওনার স্ত্রীই টাকাটা সরিয়েছিল। সে বড় ঝামেলা হয়েছিল। ফ্ল্যাটের কমিটিকে যেতে হয়েছিল ঝামেলা মেটাতে"।

সুপর্ণা একটু চমকাল। তাকে ফেরত দেওয়া টাকাটা আবার বরের থেকে সরান নি তো মণীষা কাকীমা?

গোপা কাকীমা বললেন "একটু জল খাওয়াও তো"।

সুপর্ণা রান্নাঘর থেকে জল নিয়ে এল।

গোপা কাকীমা জল খেয়ে বললেন, "আচ্ছা, তুমি একটু বস, আজ যে তোমার কাকুর জন্মদিন আমি ভুলে গেছিলাম। পায়েস করেছি, নিয়ে আসি"।

সুপর্ণা বলল "সেকী? আগে বলবেন তো! কাল বেরলাম, একটা বই দিতে পারতাম কাকুকে। বই পড়তে ভালবাসেন না কাকু?"

কাকীমা হাসলেন, "ধুস। এই বয়সে কি আর ওসব হয়? দাঁড়াও, আসি"।

কাকীমা বেরোলেন। সুপর্ণার মণীষা কাকীমার কথা ভেবে খারাপ লাগছিল। ভদ্রমহিলা তার মানে স্বামীর হাতে মারধোরও খান? ঈশ, কত মানুষ কত কষ্টে থাকে, অথচ আমরা জানতেও পারি না। অদ্ভুত পৃথিবীটা।

গোপা কাকীমা একটা টিফিনবাটিতে পায়েস আর মিষ্টি নিয়ে এলেন। সুপর্ণা বলল "কাকু অফিস থেকে এলে প্রণাম করে আসব"।

কাকীমা হাসলেন "যেও। আমিও তো এটা সারপ্রাইজ হিসেবে বানিয়েছি। বুড়ো ভেবেছে আমি ভুলে গেছি। এই নাও তো"।

কাকীমা সুপর্ণাকে পায়েসটা খাইয়ে দিলেন।

খুব সুন্দর হয়েছে পায়েসটা।সুপর্ণা আরও দু চামচ নিল। কাকীমা বাটিটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন "অদ্রীশ এলে খাইও"।

সুপর্ণা বলল "সত্যি কাকীমা, আমরা যখন চলে যাব এখান থেকে, আপনাকে খুব মিস করব। কত ভাল ভাল খাবার যে খাইয়ে আমাকে বাঁচালেন"।

গোপা কাকীমা চমকে উঠে বললেন, "তোমরা চলে যাবে? কবে?"

সুপর্ণা বলল "শিগগিরই। আপনাকে বলতে ভুলে গেছিলাম"।

গোপা কাকীমা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে আমার জিনিসটা দাও"।

সুপর্ণা অবাক হল "কোন জিনিস কাকীমা?"

গোপা হাসলেন "খুব ন্যাকা তো তুমি? জানো না কোন জিনিসের কথা বলছি?"

সুপর্ণা বলল "না। কী জিনিস?"

গোপা বললেন "এরকম ন্যাকা মেয়ে আমার একেবারেই পছন্দ না। আমি ঠিক জানতাম, তুমি এরকমই বেরোবে। তুমি দেবে কী দেবে না? আর যাবেই তো, ও জিনিস পেলে কেউ আর এখানে থাকে?"

সুপর্ণার মাথা ঘুরিয়ে উঠল হঠাৎ করে। বমি বমি করতে লাগল। চোখ ঝাপসা হয়ে যেতে শুরু করল। কোন মতে বলতে পারল "কী জিনিস বলুন..."

আর পারল না সে। মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

১১

সুপর্ণার যখন জ্ঞান ফিরল তখন মণীষা তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। ঘর ভর্তি পুলিশের লোক।

সে অবাক হয়ে মণীষার দিকে তাকিয়ে বলল "গোপাকাকীমা?"

মণীষা হাসলেন, "পুলিশের জালে"।

সুপর্ণা বিস্ফারিত চোখে বলল, "মানে?"

মণীষা বললেন "গোপা পালিত উরফে সুকন্যা প্রামাণিক, একজন কুখ্যাত স্মাগলার। স্বামী স্ত্রী দুজনেই এসব কাজে দড়"।
সুপর্ণা বলল, "অ্যা?"
মণীষা হেসে বললেন, "হ্যাঁ। এক্কেবারে জিনিস ফ্যামিলি। কিছুতেই ধরা যাচ্ছিল না এদের। কয়েক বছর ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে স্মাগলিং করে বেরিয়ে এই ওয়ান বি এইচ কে ফ্ল্যাটে ডেরা বেধে থাকত। লোককে দেখাত হাসব্যান্ড চাকরি করতে যায়। আসলে ড্রাগ চেইন আর বেআইনি হীরে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট করে প্রামাণিক। দিন তিনেক আগে কলকাতার মিলিন্দ জুয়েলারসে ডাকাতিতে এদের ওপর সন্দেহ এসে পড়ে। আমি এই ফ্ল্যাটে এদের নজরদারি করার জন্যই ছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম এর ফ্ল্যাটে হানা দেব। সমস্যা হল পুলিশের মধ্যেও এদের খোঁচর আছে। সে খোঁচর এদের খবর দিয়ে যেত। তবে কপাল ভাল আমিই যে ওদের ওপর নজর রাখছি সেটা জানতে পারে নি। এরা জানতে পেরেছিল এর ফ্ল্যাটে রেইড হতে পারে। স্ত্রীকে দিয়ে ভদ্রলোক তোমার ফ্ল্যাটেই একটা জিনিস রেখে গেছিলেন। ওদের ফোন ট্যাপ করছিলাম আমরা। কাল আমি তোমার থেকে টাকা নেবার আছিলায় এসে জিনিসটা পেয়ে যাই। কোথায় রেখেছিল জানো? তোমাদের চোখের সামনেই। সোফার তলায়। আজ আমরা তক্কে তক্কে ছিলাম। জিনিসটা আজ পাচার হত। জানতাম তোমার থেকে ওটা না পেলে উনি ফেরোসাস হতে পারেন। যেই মুহূর্তে তোমাকে পায়েসটা খাইয়ে উনি ঘর থেকে বেরিয়েছেন আমরা ওনাকে আটক করেছি। মিস্টার প্রামাণিকও শিগগিরি পুলিশের জালে ধরা পড়বেন। চিন্তা নেই"।
হাসলেন মণীষা।
সুপর্ণা অবাক চোখে বলল "সেকী! আপনি পুলিশ?"
মণীষা হাসলেন "আজ্ঞে। আন্ডার কভার অফিসার। এইসব চোর ছ্যাচড় ধরতে দিনের পর দিন ছদ্মবেশে ওত পেতে থাকি। কালকে আমিই অর্কিডটার সঙ্গে চিরকুটটা পাঠিয়েছিলাম। আমি যদি তোমাকে আগে থেকে সতর্ক করতাম, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে না। উলটে গোপাকে সব বলে দিতে। ঘাবড়ে গিয়ে নিজের বুদ্ধি লাগাতে গিয়ে আরও অনেক কেলো হতে পারত। আমি বামাল সমেত ওদের ধরতে চেয়েছিলাম"।
সুপর্ণা বলল "আর আপনার হাজব্যান্ড? যিনি কাল অত রাতে মদ খেয়ে এলেন?
মণীষা হো হো করে হেসে বললেন "ও অমল নস্কর। আমার বডি গার্ড। এখানে সবাই জানে আমার বর। ব্যাটার একটাই সমস্যা। মারাত্মক মাতাল। এমনিতে মন্দ না, সে পাত্র ভাল"।
সুপর্ণা বোকার মত বলল "তার মানে আজ গোপা কাকীমা আমার থেকে জল চেয়ে ওই জিনিসটা সোফার তলায় না পেয়েই আমাকে পায়েস খাইয়ে অজ্ঞান করতে গেছিল?"
মণীষা বললেন "ইয়েস। সম্ভবত তোমাকে ওরা অজ্ঞান করে তুলে নিয়ে গিয়ে অদ্রীশের ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করত। জিনিসটা যখন ওখানে ছিল না, স্বভাবতই সন্দেহটা অদ্রীশের ওপর গিয়েই পড়বে"।
সুপর্ণা আর ভাবতে পারছিল না। কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। মণীষা বললেন, "আমাকে ড্রাগ অ্যাডিক্ট ভেবে খুব হতচ্ছেদ্দা করেছো না? তা দেখতে চাও কী জিনিস উদ্ধার করেছি? এই দেখো"।
সুপর্ণা দেখল মণীষার হাতে একটা বিরাট বড় হীরে। মণীষা হাসতে হাসতে বললেন "মুম্বই থেকে এসেছিল। চান্দ্রেয়ী জয়সওয়ালের বিয়ের জন্য অর্ডার করা স্পেশাল হিরে। চুরিটা ভালই হয়েছিল। এক্কেবারে প্ল্যানমাফিক। শুধু পাচারটা করতে পারল না। বেচারি তোমার গোপা কাকীমা। ভদ্রমহিলা সেজে আরেকটু হলেই আমাদের নাকে দড়ি পরিয়ে দিচ্ছিলেন আর কী!"
চোখের সামনে গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হল এতক্ষণে। গোপা কাকীমা তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাকে এটা ওটা আনতে পাঠিয়ে সোফার তলায় হীরেটা রেখে দিয়েছিলেন, আর মণীষা কাকীমা সেটা উদ্ধার করতে

এসেছিলেন। সাবধান হতে বলেছিলেন আসলে গোপা কাকীমার থেকে আর সে একবারও তার কথা না ভেবে অদ্রীশকে কত কিছু ভেবে গেছে কাল থেকে। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

১২

অদ্রীশ ফিরেছে অফিস থেকে। সুপর্ণা দরজা খুলতে অবাক গলায় বলল “কী ব্যাপার বল তো? নিচে পুলিশ কেন? কিছু হয়েছে?”

অদ্রীশের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, “একটাই আপডেট, আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় ভালবাসি, আর খুব সরি। কেন সরি জিজ্ঞেস করবে না। বলতে পারব না”।

অদ্রীশ কিছু না বুঝে অবাক হয়ে সুপর্ণার দিকে তাকিয়ে রইল। সাধে কি বলে মেয়েদের বোঝা শিবেরও অসাধ্য!

যেতে পারি কিন্তু...

ঘুম থেকে সকালে ওঠার পর আমার বিভিন্ন সমস্যা হয়। কী কী সমস্যা হয়, সেটা এখন ঠিক মনে করতে পারছি না, একটা ছাড়া।

সেটা হল আমার তখন আর অফিস যেতে ইচ্ছা করে না। অজুহাত খুঁজতে শুরু করি, ঠিক কী বললে অফিস কাটানো যাবে।

দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অজুহাতগুলো আগে ব্যবহার করা হয়ে গেছে।

"অফিস না যাওয়ার অজুহাত" টাইপ বই হওয়া উচিত একটা। সে বইটা অবশ্যই উৎসর্গ করা হবে অফিসের বসকে।

কিন্তু বইটা বসকে দেওয়া যাবে না।

বইয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট থাকবে-

১) **কখন বলিবেন আপনি অফিস যাবেন না-** কিছুতেই আগের দিন বলিবেন না। বসের সামনে বলিবেন না। হইতে পারে, আপনি বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বস বুঝিয়া যাইবে আপনি ঢপ মারিতেছেন। ভোর বেলা, যখন বস ঘুম হইতে উঠেন নাই, তখন বলিবেন। বসের কথা বলিবার বেশি ইচ্ছা থাকিবে না, ফোন রাখিয়া আরেকপ্রস্থ তাহার ঘুমাইতে ইচ্ছা করিবে, আপনি তখন বলিবেন। তড়িঘড়ি বলিবেন, বসও ছুটি অ্যাপ্রুভ করিয়া তড়িঘড়ি ঘুমাইয়া পড়িবেন।

২) **শরীর খারাপ অজুহাত দেওয়ার সময় কণ্ঠস্বর-** শরীর খারাপকে অজুহাত হিসেবে বলিবার সময় অবশ্যই আপনি কণ্ঠস্বর কাতর করিবেন। পেট খারাপ কহিলে এমন কণ্ঠস্বরে কহিতে হইবে, যাহাতে মনে হইবে আপনি হাগিয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন।

৩) **জয়েন করিবার দিন আপনার হুলিয়া-** শরীর খারাপ অজুহাত দেখাইয়া ছুটি লইবার পর জয়েনিং এর দিন দাড়ি কিছুতেই কাটিয়া যাইবেন না। ক্লিন শেভড হইয়া গেলে কেহ বুঝিবেই না আপনার শরীর খারাপ হইয়াছিল। ভাবিবে ঢপ মারিয়াছিলেন। শরীর খারাপকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য শেভ করিবেন না। পারিলে ফেস ওয়াশও সেদিন স্নান করিবার সময় ব্যবহার করিবেন না।

ধুস, কী সব ভাবছি। গরম জল বসালাম ইলেক্ট্রিক কেটলিতে। চায়ের ব্যাগ কিনেছি। গরম জলে টি ব্যাগ দিয়ে খেতে খেতে প্রথমে ভাবলাম অফিস না গিয়ে কী করা যেতে পারে।

ঘড়ি দেখলাম সাড়ে ছ'টা বাজে। এখনই বসকে ফোন করার সময়। গলা খাকড়িয়ে ফোন করলাম। রিং হয়ে গেল। খুশি হলাম। তার মানে ঘুমাচ্ছে। আবার ফোন করতেই ঘুম জড়ানো গলায় বললেন, "কী হল সাগ্নিক?"

আমি কাতর গলায় বললাম, "স্যার, জ্বর হয়েছে। আজ যাচ্ছি না"।

বস কথা বাড়ালেন না। "ঠিক আছে" বলে রেখে দিলেন। আমি ফোন অফ করে দিলাম। এখন ফোন অফ না করলে ঠিক আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠে গুচ্ছের জ্ঞান দেওয়া শুরু করবেন।

নিশ্চিন্তে চা শেষ করে উঠলাম। ছুটি যখন নিয়েছি তখন বেরনো যেতে পারে।

অবশ্যই অফিসের উল্টো দিকে। এই সব দিনে অফিসের ধারে কাছ দিয়ে যেতে নেই। ভাল কোথাও খেয়ে, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে ঘরে ফিরতে হবে।

স্নানে ঢুকলাম। আমার স্নান করতে সময় লাগে। শরীরের প্রতিটা অঞ্চলে সাবান প্রবেশ না করালে স্নান করে ঠিক মজা পাওয়া যায় না।
গুনগুন করে গাইতে গাইতে স্নান করতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি কলিং বেল বেজে উঠে। এই মরেছে। এখন আবার কে এল? বাথরুম থেকেই চিৎকার করলাম, "কে?"
উত্তর এল না। আবার কলিং বেল বাজছে। বিরক্ত হয়ে গামছা পরে ভেজা গায়ে দরজা খুলে দেখি অন্তরা দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে বললাম "তুমি?"
অন্তরা আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বলল, "স্নান করে এসো। আমার কথা আছে"।
আমি বললাম "তোমার আবার কী কথা আছে? আমরা না ব্রেক আপ করেছি? তোমার না সামনে বিয়ে? এখন কী কথা আছে তোমার?"
অন্তরা ঠান্ডা গলায় বলল, "বললাম তো স্নান সেরে এসো তারপর কথা হবে। যাও"।
আমি বাইরের দিকে তাকালাম। পাড়ার লোকেরা খুব ঘোড়েল। অন্তরা এখানে এসেছে দেখলেই একগাদা কথা শুরু করবে। অন্তরা এই প্রথম এ বাড়ি এল। প্রেম করার সময়েও কখনো এ দিকে আসে নি। একবার দেখিয়েছিলাম এখানে থাকি। ঠিক মনে করে রেখেছে।
আমি বললাম, "তুমি কি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে?"
অন্তরা বলল, "আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব? আমি বসছি। তুমি স্নান করে এসো"।
আমি চিন্তিত মুখ বাথরুমে ঢুকলাম। হেবি ঝগড়া করে ব্রেক আপ হয়েছিল আমাদের মাস খানেক আগে। এখন আবার কী বলতে এল? ব্রেক আপ হবার পর তো উঠেও দাঁড়িয়েছি। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত, পরে দেখলাম অনেক টাকা বাঁচছে। সেটা ভেবেই ভাল থাকতে শুরু করেছিলাম। এখন আবার কী বলতে এল কে জানে!
ভাল করে স্নানটাও করতে পারলাম না। তাড়াহুড়ো করে গায়ে কয়েক মগ ঢেলে গা শুকিয়ে বারমুডা পরে বেরিয়ে বললাম, "বল কী বলবে। আমাকে আবার বেরোতে হবে"।
অন্তরা আমার খাটে বসে বই পড়ছিল। আমার কথার উত্তর দিল না।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই। ওরই দেওয়া। কবিতা আমার ভাল লাগে না কোন কালেই। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছাড়া। অন্তরা সেটা জেনে আমার জন্মদিনে আমায় গিফট দিয়েছিল।
আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, "কী হল? বলবে কী হয়েছে?"
অন্তরা এবার বইটা রেখে আমার দিকে তাকাল, "আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে"।
আমি বললাম, "বাহ। কনগ্র্যাচুলেশনস। মিষ্টি এনেছো?"
অন্তরা বলল, "আনব। সেটাও দিয়ে যাব"।
আমি বললাম, "এটা বলতে এত সকালে চলে এলে? ফোনেই তো বলা যেত"।
অন্তরা বলল, "ফোনে বলা গেলে তোমার মুখটা তো দেখা যেত না, তাই না? তুমি আনন্দ পাচ্ছো, না দুঃখ পাচ্ছো, কিছুই বুঝতে পারতাম না। তাই চলে এলাম"।
আমি বললাম, "আনন্দ দুঃখের কিছু নেই তো। আমাদের গল্পটা শেষ হয়ে গেছে। এবার তুমি নতুন একটা গল্পে ঢুকতে যাচ্ছো। এখানে আনন্দ দুঃখের কিছু নেই"।
অন্তরা কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এত হারামি কেন সাগ্নিক?"
আমি বললাম, "মানে?"

অন্তরা বলল, "তুমি ব্রেক আপটা আমার সঙ্গে ইচ্ছে করে করেছিলে। আমি তোমার কাছে পুরনো হয়ে গেছিলাম। কিন্তু সেটা তুমি এমনভাবে সাজালে, যাতে মনে হয় ব্রেক আপটা আমিই করেছি"।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "মানেটা কী? এটা কোন কথা হল? আমি ব্রেক আপ করতে চেয়েছি? তুমি নিজেই তো একটা সময় বলতে শুরু করলে তোমার দমবন্ধ লাগছে, এই সম্পর্কটা থেকে এবার তোমার বেরনোর সময় হয়েছে, এখন এসব উল্টোপালটা বলতে শুরু করে দিলে?"

অন্তরা বলল, "সেটাই তো তোমার চাল ছিল। তুমি শেষের দিকটা ইচ্ছা করে আমার সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করে দিলে। বন্ধুর বিয়েতে কেন লাল শাড়িটা পরলাম, সেটা নিয়েও নাকি তোমার সমস্যা হয়ে গেল!"

আমি বললাম, "সেটা তো বলতামই, লাল শাড়িটা আমাদের অ্যানিভারসারির দিন পরার কথা ছিল। তুমি রূপসার বিয়েতে সেই শাড়িটা পরলে আমি রাগব না? কত প্ল্যান করা হল, তারপর সেটা ভেস্তে দিলে। রাগ হবে না?"

অন্তরা বলল, "আমি কী করতাম? আমার কোন শাড়িই পছন্দ হচ্ছিল না। সবাই কত মাঞ্জা দিয়ে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম ওটাতেই আমাকে ভাল লাগে। তুমি সেটা নিয়ে মারাত্মক একটা সীন ক্রিয়েট করে দিলে চ্যাঁচামেচি করে। মানে এটার জন্য একটা গোটা দিন ফোন ধরলে না। এগুলো তখন ভাবছিলাম রাগ। এখন বুঝি, তুমি ইচ্ছা করে করছিলে, যাতে আমিই রেগে মেগে রিলেশনটা থেকে বেরিয়ে যাই"।

আমি বললাম, "এটা আমি ইচ্ছা করে করছিলাম"?

অন্তরা চোখ মুখ শক্ত করে বলল, "হ্যাঁ, এটা তুমি ইচ্ছা করে করছিলে"।

আমার মাথা গরম হচ্ছিল। বললাম, "ঠিক আছে। যা করেছি, বেশ করেছি, এখন যাও। বিয়ে যখন ঠিক হয়েছে, বিয়ে করে শান্তিতে ঘর সংসার কর। যাও"।

অন্তরা বলল, "সেটাই তো তুমি চাও। তোমার লাইন ক্লিয়ার হয়। আমি তো আসল সিক্রেটটা জেনে গেছি"।

আমি বড় বড় চোখ করে বললাম, "কোন সিক্রেট"?

অন্তরা বলল, "তোমার সঙ্গে সোহিনীর চলছে। আমি কেটে গেলেই তুমি সোহিনীকে নিয়ে লীলা কেত্তন শুরু করবে। এখন জাস্ট একটা বাফার পিরিয়ড রেখেছো। দু মাস দেখাবে ব্রেক আপ করে তুমি কত দুঃখে আছো। তারপরেই সব খুল্লমখুল্লা শুরু হবে। তোমার সব পোস্টে সোহিনী লাভ দেয়। আমি দেখি না?"

আমি বললাম, "তুমি তো আমাকে ব্লক করে রেখেছো। তুমি কী করে দেখলে?"

অন্তরা বলল, "আমার কপালে চার অক্ষরের বোকা লেখা আছে বুঝি? আমি সব দেখি। সব বুঝি। আমাকে অত গাধা ভাবার কোন কারণ নেই"।

আমি বললাম, "তার মানে তুমি ফেক থেকে আমার অ্যাকাউন্ট স্টক কর তাই না?"

অন্তরা বলল, "সেটা তোমাকে কেন বলতে যাব?"

আমি বললাম, "দেখো, আমি অনেক ঠান্ডা মাথায় তোমার সব কথা শুনে যাচ্ছি। তোমাকে এত কিছুর পরে একটা কথাই বলব। সামনে ভাল দিন আসছে। ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে নিশ্চয়ই। ভাল থাকো। আর আমাকে এভাবে স্টক করা বন্ধ কর। ছেলে কী করে?"

অন্তরা উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি মাথা চুলকালাম বসে। আমি ইচ্ছা করে সম্পর্কটা ভেঙে দিয়েছি? কী জ্বালা! রাগও করা যাবে না? মহা ত্যাদড় মেয়ে তো! এসব গিলটি ফিলিংস দিয়ে চলে গেল।

বারমুডা আর খালি গায়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। রাস্তা দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে চলে গেছিল। পাড়ার লোক জন দেখছে অবাক হয়ে। হরেন দাদু ছোট ছোট চোখে মাপছে আমি একটা মেয়ের পিছনে দৌড়চ্ছি।

ডাকলাম, "এই অনু এই, শোন"।
অন্তরা ফিরে দাঁড়াল। রাগী গলায় বলল, "কী?"
আমি বললাম, "এই তুমি আমার ঘাড়ে সব দিয়ে দিলে কেন? আমি ব্রেক আপ করেছি? আর নিজে বল নি ওই বিয়েতে একটা হ্যান্ডু ছেলের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ঝাড়ি মেরেছো? আমি রাগবো না? আমি কি রোবট হ্যাঁ?"
পাড়ার সতুকাকা বাজার করতে বেরিয়েছে। আমার খালি গায়ের দিকে কঠিন চোখে তাকাতে তাকাতে গেল।
অন্তরা বলল, "ওহ। এতদিনে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরোল তাহলে। আমি ঝাড়ি মেরেছি বলে তুমি একদিন কথা বল নি। আর অজুহাত দেখাচ্ছিলে শাড়ির!"
আমি মাথা চুলকে বললাম, "হ্যাঁ, তুমি এদিক ওদিক ঝাড়ি মেরে বেড়াবে, আমি রাগ করব না? যাক গে, আমার কী! তোমার তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সুখের পায়রা তুমি। সুখী সুখী মুখ করে বসে বিয়ে করবে। লোক ডাকবে। যাও, আমার কী? যাও যাও। সেন্টু দিতে এসছে, হুহ। নিজে কমিটেড হয়ে অন্য ছেলেকে ঝাড়ি মারবে, আর এদিকে..."
অন্তরা বলল, "কমিটেড হয়ে? সোহিনী তোমার পোস্টে লাভ দেবে কেন? এই জানোয়ার"।
আমার এই বারমুডাটার ইলাস্টিক ঠিক টাইট না। খুলে যাচ্ছিল। এক হাতে সেটা তুলে ধরে বললাম, "বেশ করেছে লাভ দিয়েছে। তুমি সন্দেহ কর তো? বেশ সন্দেহটাই সত্যি করব এবার। আমি ওকেই বিয়ে করব। দাঁড়াও, আমি ঘরে গিয়েই ওকে ফোনে প্রপোজ করছি"।
রেগে মেগে ঘরের দিকে রওনা দিলাম। অন্তরা চিৎকার করতে লাগল, "তুমি যাও, ওকে প্রপোজ কর, আমার মরা মুখ দেখবে কথা দিলাম"।
গোটা পাড়া দেখছে। আমি নিজেকে একটু শান্ত করলাম। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল সামলে টামলে আবার অন্তরার সামনে এসে দাঁড়ালাম, "তুমি যাও। গিয়ে বিয়ে কর। শুধু আমাকে উল্টো পালটা ব্লেম দিও না। যা করেছি ভালবেসেই করেছিলাম। যাও"।
অন্তরা কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তুমি একটা শয়তান, জানোয়ার ছেলে। আমাকে একটুও ভালবাসোনি কোন দিন। আমার কোন বিয়ে ঠিক হয় নি। আমি কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে গেছি। আর তুমি আমাকে একবারও ফোন কর নি"।
আমি সভয়ে চারদিকে তাকালাম। সব বাড়ির লোক বারান্দায় এসে গেছে।
আমি অন্তরার হাত ধরলাম। সেই হাতটা, যেটা ধরে আমরা গোধুলীর সময়ে গঙ্গাতীরে হাঁটতাম। আরেকটা হাতে নিজের প্যান্ট সামলে বললাম, "রেগে যাচ্ছো কেন? আমিই ভেবেছিলাম, তুমি বেরিয়ে যেতে চাও। মাইরি বলছি বিশ্বাস কর। এই সিরিয়াসলি তোমার বিয়ে ঠিক হয় নি?"
অন্তরা আমার বুকে মাথা গুঁজে বলল, "না। তোমাকে জ্বালাতে বলেছিলাম। তাও তুমি জ্বললে না"।
আমি বললাম, "জ্বললাম না? বিয়েটা করতে, দেখতে ওই বিয়ের স্টেজেই তোমার বরকে জ্বালিয়ে দিয়ে আসতাম। শালা, আমার বউকে বিয়ে করে, এত সাহস?"
পাড়ার লোকজন হাঁ করে দেখছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "এই যে কাকারা, কাকীমারা, দিদি, জামাইবাবুরা। দেখে নিন। আমার বউ। লজ্জার কিছু নেই। আজকে ছুটি নিয়েছি। আজকেই আমি একে বিয়ে করে নেব"।
সবাই হো হো করে হেসে উঠল।
অন্তরা আমার পেটে একটা ঘুষি মেরে বলল, "ধুত। অসভ্য"।
আমি বললাম, "তুমি একটু দাঁড়াও। আমি পাঞ্জাবীটা পরে আসি। এই বারমুডাটা পরে থাকলে লোকে তাড়া দেবে এবার"।

অন্তরা হেসে ফেলল।
আমি প্যান্ট সামলাতে সামলাতে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিলাম।
পাড়ার লোকেরা আমাদের বিয়ের আগেই তাদের হবু বউমাকে রাস্তায় কাঁদতে কাঁদতে হাসতে দেখতে লাগল...

কিছু কিছু কথা

সন্ধ্যেবেলা।

একটা বিয়ার খেয়ে এসে সমুদ্রের তীরে বসল সন্দীপ।

গোয়ার ক্যালানগুটে বিচটা একটা পৃথিবীর মত। দেশের সব অঞ্চলের মানুষ তো আসেনই, সঙ্গে বিদেশীরাও গিজগিজ করে। বিচের কাছেই একটা হোটেলে আস্তানা গেড়েছে সে।

মুম্বই এসেছিল অফিসের একটা কাজে। শুক্রবার কাজটা হয়ে যাওয়ায় ফ্লাইটে গোয়া চলে এল। দুদিন নিজের সঙ্গে সময় কাটানো বড় দরকার। সারাক্ষণ কাজ করে করে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়ে যায় কলকাতায় থাকলে।

বিয়ারের নেশা মগজে চড়ে বসছে একটু একটু করে। বিচের কাছে ডিজে চলছে। তুমুল ছন্দে একগাদা যুবক যুবতী নাচছে। সন্দীপ সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কলেজ লাইফে কতবার প্ল্যান হল বন্ধুদের সঙ্গে আসবে, অথচ আসাই হল না। একা একা কি আর এগুলো ভাল লাগে। দূর থেকে দেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকল সে। একটু পরে ডিজের মিউজিক মাথার ভিতর প্রবেশ করতে শুরু করল। বিরক্ত লাগছে এবার খানিকটা। একা একা সময় কাটাতে এলে এরকম শব্দব্রহ্ম যেখানে সৃষ্টি হয় সেখানে না থাকাই ভাল। তার উচিত ছিল কোন নির্জন বিচে থাকা।

হঠাৎ একটা জোর চিৎকার শুনল সে, এবং তার সঙ্গে একটা চড়ের শব্দ। চোখ খুলে গেল তার। দেখল একটা মহিলাকে এক লোক চড় মারল। মহিলাটা কাঁদছে। লোকটা মহিলাটার দিকে না তাকিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। মহিলাটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লোকটার পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করেছে। লোকটা যে প্রবল মদ্যপ বোঝা যাচ্ছে। ঝামেলাটা কেন হয়েছে বুঝতে পারল না সন্দীপ।

কয়েক সেকেন্ড পরেই তার মাথার মধ্যে যেন আলো জ্বলে উঠল। এতো রাত্রিদি! তাদের পাশের পাড়ায় থাকত। ওরা দুজন খানিকটা যেতেই সন্দীপ উঠে দাঁড়িয়ে ওদের ফলো করতে শুরু করল ধীর পায়ে। লোকটা মদের ঘোরে উল্টো পালটা বকে যাচ্ছে, আর রাত্রিদি কেমন পাথরের মত তার পিছন পিছন হেঁটে যাচ্ছে।

সন্দীপ হাওয়াই চটি পরে ছিল। বালির মধ্যে হাওয়াই চটি পরলে পায়ে অস্বস্তি হয়। বালির কুচি পায়ে এসে লাগে।

তার উপরে সমুদ্রের হাওয়াতে বিয়ারের নেশাটাও চড়ছিল। সে তবু ধীর পায়ে দূর থেকে ওদের দেখে হাঁটতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ওরা বিচ এলাকা থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে ঢুকল। ওরা বলতে শুধু লোকটা। রাত্রিদি হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাত্রিদিকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সন্দীপের কী যে হল, সে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আরে রাত্রিদি? তুমি এখানে?"

রাত্রিদি তার দিকে তাকিয়ে প্রথমে চিনতে পারল না। সন্দীপ বলল, "আরে আমি তোমাদের পাশের পাড়াতেই থাকতাম। তাপস স্যারের কাছে পড়তে যেতাম। তুমি আমাদের পাড়ায় আসতে সরস্বতী পুজোয়"।

রাত্রিদি এবার চিনতে পারল তাকে। খানিকটা বিহ্বল হয়ে ছিল বলেই হয়ত প্রথমে বোঝে নি।

বলল, "হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি। ভাল আছো?"

সন্দীপ বলল, "হ্যাঁ"।
রাত্রিদি হঠাৎ চুপ করে গেল। কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আমার একটা উপকার করবে?"
সন্দীপ বলল, "বল"।
রাত্রিদি বলল, "আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে?"
হঠাৎ এই প্রশ্নটা শুনে সন্দীপ অবাক হয়ে গেল। সে বলল, "মানে?"
রাত্রিদি বলল, "আমি এখানে হানিমুনে আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে এসেছি। এই মাত্র ঠিক করলাম আমি ওর সঙ্গে থাকব না। সমস্যা হল আমার কাছে একটাও টাকা নেই। আমাকে বাড়ি পাঠাতে পারবে? যে টাকা লাগে দাও, আমি দিয়ে দেব তোমায়"।
সন্দীপ বুঝতেই পারে নি সে যে এরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়তে পারে। নিজেই যেচে এগিয়ে গেছিল। না করাও সম্ভব নয়। রাত্রিদি তার দিকে প্রবল জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে।
সে বলল, "সে পারব, কিন্তু ফ্লাইট তো কালকে। আজ কোথায় থাকবে?"
রাত্রিদি বলল, "তুমি কোথায় উঠেছো? আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি? আমি এক বস্ত্রে যাব। ঘরেও যাব না। প্লিজ আমাকে নিয়ে চল"।
সন্দীপ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।
২।
হোটেলে আই কার্ড চেয়েছিল। ভাগ্যবশত রাত্রিদির হ্যান্ডব্যাগে সেটা ছিল। আলাদা ঘর পাওয়া গেল না। তার ঘরেই এসে রাত্রিদি সোফায় বসে দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।
সন্দীপ বলল, "আমি কালকের টিকেট কাটব? পেয়েছি টিকিট?"
রাত্রিদি বলল, "কাটো"।
সন্দীপ ইতস্তত করে বলল, "প্রায় চোদ্দ হাজার টাকা পড়বে"।
রাত্রি বলল, "যা লাগবে দাও। আমি বাড়ি গিয়েই তোমাকে পাঠাব"।
সন্দীপ বলল, "তুমি কিছু খাবে?"
রাত্রি হাসল, "চড় খেয়ে আমার হয়ে গেছে"।
সন্দীপ আর বলল না সে চড় খেতে দেখেছে। রাত্রিদি বলল, "একটা মাতালের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমার। আগে বুঝিনি। জানতামও না। গোয়ায় আসার পর থেকে সব সময় মদ খেয়ে যাচ্ছে। বিচে গিয়ে একবার বললাম, এখানে এত খেও না। আমাকে সবার সামনে চড় মেরে দিল। আমি আর কিছুতেই থাকব না ওর সঙ্গে"।
সন্দীপ বলল, "তুমি বস। আমি খাবার আনাই কিছু। মাথা ঠান্ডা কর। আর টিকিট কেটে দিচ্ছি। চিন্তা কোর না"।
রাত্রি চুপ করল। সন্দীপ কফি আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আনাল। রাত্রি চুপ করে কফি খেল।
খানিকক্ষণ পরে তার ফোন বাজতে শুরু করল। রাত্রি ফোন ধরেই বলল, "তুমি আমাকে আর ফোন করবে না। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই"।
ওপাশ থেকে কিছু উত্তর আসার আগেই রাত্রি ফোন কেটে দিল।
সন্দীপ বলল, "উনি চিন্তা করবেন হয়ত, তুমি কোথায় আছো"।
রাত্রি বলল, "ছাতার মাথা করবে। মাতালরা ওসব চিন্তা করে না। সবে তো বিয়ে হয়েছে, আরো করবে না"।

সন্দীপ বুঝল না কী বলবে। রাত্রি তার খাটে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। সন্দীপের অস্বস্তি হচ্ছিল। মহা জ্বালায় পড়া গেল। পাড়ায় জানাজানি হলেও আরেক কেচ্ছা হবে।

সে বলল, “আমি একটু হেঁটে আসছি। তুমি ফ্রেশ হয়ে নিও”।

রাত্রি কিছু বলল না।

সন্দীপ হোটেলের বাইরের রাস্তায় এল।

গোয়াতে একা একা ঘুরতে এসে যে এই সমস্যা হতে পারে সন্দীপ বুঝতে পারে নি। তার কপালটাই এরকম। মামা বলে তুলা লগ্ন জাত, তুলা রাশির লোকেরা ভাগ্য বড় পেছন মারা হয়। এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। পাশের পাড়ার একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে কেসটা এদ্দুর তার ঘাড়ে চলে আসবে বুঝতে পারে নি সে। একবার ভাবল বাড়িতে ফোন করে মাকে জানায়। পরক্ষণেই মনে হল, মা এমনিতেই তাকে নিয়ে হাজারটা চিন্তায় থাকে। তার ওপর এইটা শুনলে নির্ঘাত হার্ট অ্যাটাক করবে। তার থেকে বাবাকে বলা ভাল।

বাবাকে ফোন করবে বলে ফোনটা পকেট থেকে বের করতে যাবে, এমন সময় দেখল একটা লোক রাস্তা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে আর “রাত্রি, ও রাত্রি” বলে চ্যাচাচ্ছে। লোকটা আর কেউ না, রাত্রিদির বর। গোটা ক্যালাঙ্গুটের লোক লোকটাকে হাঁ করে দেখছে। একদল সাদা বিদেশী মেয়ে লোকটাকে দেখে খিলখিল করে হাসছে। লোকটার অবশ্য ভ্রুক্ষেপ নেই। কাঁদতে কাঁদতে চেঁচাচ্ছে।

সন্দীপ এগিয়ে গিয়ে লোকটার কাছে গিয়ে বলল, “কাকে খুঁজছেন?”

লোকটা তার দিকে দিশেহারা চোখে তাকিয়ে বলল, “আমার বউ চলে গেছে। বিশ্বাস করুন, আমি খুব বাজে কাজ করেছি। আমার ফাঁসি হওয়া উচিত”।

সন্দীপ বলল, “কেন ফাঁসি হওয়া উচিত”?

লোকটা বলল, “আমি হানিমুনে এসে মদ খেয়ে আমার বউকে মেরেছি। ফাঁসি কেন, যাবজ্জীবনও হওয়া উচিত। সে এখন বলছে বাড়ি চলে যাবে। কোথায় আছে কী করছে এই অজানা জায়গায়... ওরে বাবারে...”

লোকটা বাচ্চা ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

এবং হঠাৎ করে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে শুরু করল।

সন্দীপ প্রচন্ড অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি তার রুমে গিয়ে নক করল। রাত্রি দরজা খুলে বলল, “কী হল?”

সন্দীপ বলল “বাইরে এসো”।

রাত্রি তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দেখল লোক জড়ো হয়ে গেছে। তার বর রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে।

রাত্রি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তার বর তাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠল। তার পা ধরে বলল, “মা কালীর দিব্যি বলছি, মহাদেবের দিব্যি বলছি, যীশু খ্রীষ্টর দিব্যি খেয়ে বলছি, আজকের পর আর মদ খাব না। আমায় ক্ষমা করে দাও”।

রাত্রিদি বলল, “পারব না। আমি বাড়ি যাচ্ছি। ও সন্দীপ। আমাদের পাশের পাড়ার এক ভাই। ও আমাকে প্লেনে তুলে দেবে”।

রাত্রিদির বর বিহ্বল চোখে সন্দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি ভাই? শোন ভাই, তোমার দিদিকে বোঝাও, আমি লোকটা এমনই। আমি কোন কালে খুব একটা মদ খাই না, আমায় বন্ধুরা বুঝিয়েছিল গোয়ায় এসে প্রচুর মদ খেতে হবে। আমার কী যে হয়েছিল, এই এই দেখো আমি নিজেকে শাস্তি দিচ্ছি”।

বলে রাত্রিদির বর রাস্তার উপর কান ধরে “আমি আর কোন দিন মদ খাব না, আমি আর কোন দিন মদ খাব না, আমি আর কোন দিন মদ খাব না” বলে উঠ বোস করতে শুরু করল। সমুদ্রতীরের ডিজের শব্দের থেকেও রাত্রিদির বর বেশি জোরে বলতে লাগল।
সন্দীপ কাতর স্বরে রাত্রিদির দিকে তাকাল। রাত্রিদি তার বরের হাত ধরে বলল, “আর মারবে না?”
বর দু পাশে মাথা নেড়ে বলল, “মাইরি বলছি। মা কালীর দিব্যি। আমিও থাপ্পড় সিনেমাটা দেখেছি”।
রাত্রিদি বলল, “ও আমার প্লেনের টিকেট কেটে দিয়েছিল। ওকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবে”।
রাত্রিদির বর ফুঁপিয়ে উঠে বলল, “চক্রবৃদ্ধি সুদ সমেত ফিরিয়ে দেব। প্লিজ এবার ফিরে চল”।
রাত্রিদি সন্দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, “আসি ভাই। তোমার টাকাটা সকালের মধ্যে দিয়ে দেবে ও। থ্যাঙ্ক ইউ, তুমি যা করলে, ছি ছি ছি, আমি কি মানুষ? হানিমুনে এসে বউকে কেউ মারে?”
রাত্রিদির বর কাঁদতে কাঁদতে হাঁটতে লাগল। রাত্রিদি বরকে সামলাতে সামলাতে ওর সঙ্গে গেল।
যে লোকগুলো জড়ো হয়েছিল, তারাও হো হো করে হেসে যে যার পথে চলে গেল।
রইল দাঁড়িয়ে শুধু সন্দীপ।
মনে পড়ে গেল, এককালে রাত্রিদিকে দেখবার জন্য তাপস স্যারের ক্লাসের পরেও সাইকেল নিয়ে ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে কত যাতায়াত করেছে। আজ হঠাৎ করে এখানে এত কিছু হয়ে গেল, এর সঙ্গে সে দিনগুলোর কি সত্যিই কোন সম্পর্ক আছে?
কিছু কিছু কথা এতটাই মনের গভীরে থাকে, কখনও কোনভাবেই তাদের আর বেরিয়ে আসা হয় না...

রিংমাস্টার

১

রাত একটা।

পাঁচতারা হোটেল কলকাতা হাইটসে "মৃত্যুপুরী" সিনেমার সাকসেস পার্টি প্রায় শেষের দিকে।

সিনেমার পরিচালক বিপ্রতীপ বসু তার স্ত্রী এবং সিনেমাটির নায়িকা প্রিয়া বসুর সঙ্গে স্কচ খাচ্ছেন এক কোণায় বসে।

নায়ক পরীক্ষিৎকে ঘিরে সুন্দরীদের ভিড়। পরীক্ষিৎ মদ খাচ্ছে না।

এক সুন্দরীর কোমর জড়িয়ে ফ্লার্ট করতে মগ্ন।

তুমুল জোরে গান হচ্ছে ডিস্কো ফ্লোরে। সেখানে প্রোডিউসার রঞ্জিত গোপাল সহ বেশ কয়েকজন নাচছেন।

প্রিয়া বিপ্রতীককে বললেন "পরীক্ষিৎ একটি জিনিস"।

বিপ্রতীপ স্কচে চুমুক দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "কেন?"

প্রিয়া বললেন, "তার আগে বল রঞ্জিত তোমাকে এখনও পুরো পেমেন্ট দিয়েছে? আমাকে দিয়েছে?"

বিপ্রতীপ মাথা নাড়লেন, "না। দিয়ে দেবে"।

প্রিয়া বললেন "হু, আর দিয়েছে। পরীক্ষিৎ ফুল পেমেন্ট পেয়ে গেছে"।

বিপ্রতীপ বললেন, "সে পাক। পরীক্ষিতের ডিমান্ড তো আছেই। তা নিয়ে আবার কী হল?"

প্রিয়া বললেন "কিছুই হয় নি। জিনিস এই জন্যই বললাম, রঞ্জিতকে পরীক্ষিৎ বলেছে ও নাকি কয়েকটা সিনেমায় টাকা ঢালতে চায়। রঞ্জিত সেটা শুনে ওকে এখন হাতে রাখছে। ক'টা সিনেমা করেছে ও যে সিনেমায় টাকা ঢালার মত টাকা হয়ে গেল ওর। আমরা এত দিন ইন্ডাস্ট্রিতে আছি..."

বিপ্রতীপ ভ্রু কুঁচকে বললেন, "সিরিয়াসলি? পরীক্ষিৎ টাকা ঢালবে?"

প্রিয়া বললেন "তুমি কি চোখ কান কিছুই খোলা রাখো না আজকাল? কী হয়েছে তোমার? এরকম ঝিমিয়ে পড়ছ কেন?"

বিপ্রতীপ বললেন, "লোটাস হাউজ থেকে কল এসেছিল। একটা অ্যাডভেঞ্চার সিনেমা বানাতে চায়। সিংহ টিংহ থাকবে। আমাকে ডিরেক্ট করতে বলছে। অন্য কেউ হলে দিতাম সার্কাসের রিং মাস্টার দিয়ে ডিরেক্ট করান, লোটাসকে বলতে পারলাম না"।

প্রিয়া বললেন, "হু। সে তো বলা যাবে না। ওরা তোমার বউয়ের পর্ণ ডিরেক্ট করতে বললে তাই করবে, তাই না বিপ্রতীপ?"

বিপ্রতীপ মুখ কুঁচকে বললেন, "কেন এসব বল?

প্রিয়া বললেন "বলব না? তোমাকে আমি বার বার বললাম নাসরিনের চারটে সীন কেটে দিতে। তুমি কাটলে না। যদি লোটাস রাগ করে! সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকো। তোমার পারসোনালিটি নেই কেন আমাকে বলতে পারো?"

বিপ্রতীপ বললেন "ডিরেক্টরটা আমি। আর সীনগুলো ইম্পরট্যান্ট ছিল। অকারণ নিজের ইগো স্যাটিসফাই করতে তুমি যদি আমাকে বাধা দাও, তাহলে আমাকে রিঅ্যাক্ট করতেই হয়। আমি সীনগুলো কাটলে বলা যেত আমার পারসোনালিটি নেই"।

প্রিয়া ভ্রু তুললেন, "তাই নাকি? তোমার উত্থানে আমার কোন ভূমিকা নেই বলছ?"

বিপ্রতীপ বললেন “তার জন্য বুঝি সারাজীবন আমাকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতে হবে”?
প্রিয়া বললেন “গুরুদক্ষিণা চাই নি। নায়িকার সম্মান চেয়েছিলাম। পার্শ্বচরিত্র আর আমার গুরুত্ব সমান হয় কোন দিন? গোটা সিনেমায় সমান সমান করে দিলে দুজনকে।”
বিপ্রতীপ গম্ভীর মুখে বললেন, “সেটা আমি যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি”।
প্রিয়া গলা নামিয়ে বিষ ঢাললেন “সেটা কি মন্দারমণি গিয়ে এক খাটে শুয়ে ভাল বুঝেছো?”
বিপ্রতীপ কয়েক সেকেন্ড প্রিয়ার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে উঠে পড়ে বললেন “আমি বাড়ি গেলাম। তোমার থাকতে হলে রঞ্জিতকে বলে দিও। বাড়ির ঝগড়া এখানে টানতে ইচ্ছা করছে না আমার”।
প্রিয়া ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে বললেন, “তা তো হবেই, নাসরিনের নামে কিছু বলাই যায় না তোমায়। ভালই আছো কিন্তু তুমি। ঘরে বাইরে, দিব্যি কেটে যাচ্ছে বল”?
বিপ্রতীপ এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। প্রিয়া থমথমে মুখে দেখলেন বিপ্রতীপের চলে যাওয়াটা। বিপ্রতীপকে চলে যেতে দেখে নাসরিন তার দিকে এগিয়ে এসে বলল “প্রিয়াদি, স্যার কি বেরিয়ে গেলেন নাকি?”
মুখে একটা মিষ্টি হাসি মাখিয়ে প্রিয়া বললেন, “হ্যাঁ গো, ওর আবার কাল একটা ইম্পরট্যান্ট মিটিং আছে। বস বস। এখানে বস। এসব পার্টি তোমায় অস্বস্তিতে ফেলে, না?”
নাসরিন একটু উসখুস করে বলল, “ঠিক তা না। আমার আসলে ঘুম পাচ্ছে”।
প্রিয়া বললেন, “তাহলে বাড়ি যাচ্ছো না কেন?”
নাসরিন বলল “রঞ্জিত স্যার বললেন পৌঁছে দেবেন...”
প্রিয়া এক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড নাসরিনের দিকে তাকিয়ে বললেন “আচ্ছা নাসরিন, এই বুড়ো প্রোডিউসারগুলোর সঙ্গে রাত কাটাতে ভাল লাগে তোমার?”
নাসরিন থতমত খেয়ে বলল “না না, উনি আমাকে বাড়িই পৌঁছে দেবেন শুধু। তুমি যেটা ভাবছো সেটা না”।
প্রিয়া একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, “বহুদিন হল আমার নাসরিন। আমাকে এসব বুঝিয়ে লাভ নেই। বাই দ্য ওয়ে, হাউ ইজ মাই হাজব্যান্ড”?
নাসরিন জিভ কেটে বলল “কী যে বলেন প্রিয়াদি। স্যার দেবতুল্য মানুষ”।
প্রিয়া জোরে হেসে উঠে বললেন “তাই নাকি?”
নাসরিন মাথা নিচু করে বলল “হ্যাঁ। সবার সঙ্গে স্যারের তুলনা হয় না। ওনার মধ্যে যে গুণটা আছে, কারও মধ্যে নেই। কাজ ছাড়া কিচ্ছু বোঝেন না স্যার”।
প্রিয়া মাথা নাড়লেন, “তা বটে। ইউজলেস ইডিয়ট একটা”।
নাসরিন চমকে উঠে বলল “এরকম করে কেন বলছেন প্রিয়াদি? ওর প্রায় সব ছবি হিট হয়। ইউজলেস কেন হবেন?”
প্রিয়া বললেন, “ডিরেক্টরের ঘরে ঢুঢু তাই। বারগেইন করতে পারে না, কত সিনেমা বিনা টাকাতেই করে ফেলে। এসব লোক আজকাল চলে নাকি?”
নাসরিন বলল “শেষ দিন পর্যন্ত এসব লোকই চলবে প্রিয়াদি। মিলিয়ে নিও”।
প্রিয়া চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে নাসরিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি উঠি। তুমি চাইলে তোমায় ড্রপ করে দিতে পারি। কী করবে? যাবে, না রঞ্জিতের সঙ্গে যাবে?”
নাসরিন প্রিয়ার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল, “আমার অনেক স্ট্রাগল করার আছে দি”।
প্রিয়া মাথা নাড়লেন, “রাইট। মাইলস টু গো বিফোর ইউ স্লিপ। কর, স্ট্রাগল কর। গুড নাইট”।
নাসরিন ফিসফিস করে বলল, “গুড নাইট”।

২।

নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন বিপ্রতীপ। সামনে মণিটর। একটা গল্প মাথায় এসেছে। কিন্তু প্রোডিউসার পাওয়া চাপ হবে। এখন ইন্ডাস্ট্রিটা অদ্ভুত হয়ে গেছে।

চিটফান্ডের রমরমার দিনে চারদিকে কালোটাকা উড়ত। এখন এক ঝটকায় টাকা কমে গেছে। যে ক'জন আছে, খুব সন্তর্পণে টাকা ঢালে। টাকা উঠে আসার চান্স কম থাকে। মশালা সিনেমাই চলে। স্বাধীন মনে সিনেমা বানানো সম্ভব নয়।

আর আছে ওয়েব সিরিজ। টু এক্স সিনেমার মত যৌনতা দেখানো যায় বলে কম বয়সী মহলে এর চাহিদা আছে। বেশ কয়েকটা ভাল এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে না, তা নয়, তবে সেরকম পরিষ্কার ভাল কাজের অভাব।

বিপ্রতীপ একটা ভাল কাজ করতে চেয়েছিলেন। স্বচ্ছ সিনেমা। অবান্তর শরীর থাকবে না, যা থাকবে শিল্পের প্রয়োজনে থাকবে। দক্ষিণ ভারত থেকে গল্প উঠে আসবে না। নারকেল গাছ, তেতুলের টক কিংবা ইডলি ধোসা না। সিরিয়ালধর্মী বাংলা ছবিও না। মেইনস্ট্রিম নন কমার্শিয়াল পরিচ্ছন্ন বাংলা ছবি। সমস্যা হল এই স্ক্রিপ্ট প্রোডিউসারদের দেখালেই বলে একটা আইটেম ডান্স থাকবে, পারলে বাদশাকে দিয়ে গাওয়ালে হবে, বাজেটের চিন্তা করতে হবে না। বাদশা গেয়েছে শুনেই লোক হলে চলে যাবে, স্যাটেলাইট রাইটস বিক্রি হয়ে যাবে।

লাস্ট সীনে একটু ঝাড়পিট না হলে কি আর গ্রামের দর্শক যাবে? বিপ্রতীপের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল উত্তম সুচিত্রার সিনেমা যখন গোল্ডেন জুবিলি হত, তখন কি গ্রামের লোক সিনেমা দেখতেন না? এই সেদিনও দাদার কীর্তি, ভালবাসা ভালবাসা, আলো সুপার হিট হয়েছে। গ্রামের লোকেরা দেখবে না, এই এক্সকিউজ কেন ব্যবহৃত হবে? এসব ছুতো দিয়ে কেন ভাল ভাল সিনেমাগুলোকে আটকে রেখে কতগুলো দক্ষিণী রিমেক করতে হবে?

প্রশ্নটা করতে পারেন নি। সব প্রশ্ন করা যায় না। বাংলা সিনেমার প্রোডিউসারেরা ওভাবে ছবি বাছেন না। একটা সময় পথের পাঁচালী প্রোডিউসার পায় নি। এখন যদি সত্যজিৎ রায় নামক কোন পরিচালক সিনেমা বানাতে এসে প্রথম সিনেমা পথের পাঁচালীর স্ক্রিপ্ট জমা দিতেন, সেই সিনেমা কোন কালে অ্যাপ্রুভ হত না। তাকে তামিল, তেলেগু সিনেমার ডিভিডি দিয়ে বলা হত আগে এই সিনেমাগুলো নিজের মত করে রিমেক করে দেখান, তারপরে চিন্তা করা যাবে কী করব। স্টুডিও নেই, একগাদা ইউনিয়নের ঝামেলা, নেতাদের নাক গলানো, সব সামলে ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকা খুব কঠিন।

বিপ্রতীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাইলটা বন্ধ করলেন। এই সিনেমা কেউ করবে না। দরজায় নক হল। বিপ্রতীপ বললেন "এসো"।

প্রিয়া ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে বললেন, "আলো নিভিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে?"

বিপ্রতীপ বললেন, "ঘুমাব। তার আগে একটু স্ক্রিপ্ট ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম"।

প্রিয়া বললেন, "রিং মাস্টারের স্ক্রিপ্ট?"

বিপ্রতীপ অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লেন "হু"।

প্রিয়া বললেন, "তুমি আমাকে কেন সব কথা বলতে চাও না জানতে পারি? আমি কি এতটাই অপাংক্তেয় হয়ে গেছি? এত অ্যাভয়েড করছো কেন আজকাল তুমি?"

বিপ্রতীপ বললেন, "প্রশ্নটা নিজেকেই করতে পারো তো। তোমার কথা মত না চললেই কল্পনায় যার তার সঙ্গে শুইয়ে দিচ্ছো, অ্যাভয়েড করার কি কোন কারণ নেই?"

প্রিয়া বললেন "ভাল। কর অ্যাভয়েড। আমার কোন অসুবিধা নেই। আমার আউটডোর আছে কাল। দশটার ফ্লাইট। উত্তরবঙ্গ। চারদিন পর ফিরব। ঘরদোর পরিষ্কার রেখো"।

বিপ্রতীপ বললেন “বেশ তো। রাখব”।
প্রিয়া বললেন, “তোমার একবারও ইচ্ছে হল না বলতে, তুমিও যেতে চাও?”
বিপ্রতীপ বললেন, “আমার যাওয়াটা কেন ঠিক হবে? অন্য একটা ইউনিটের সঙ্গে আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে?”
প্রিয়া বললেন, “আগে তো যেতে! তখন কী হত?”
বিপ্রতীপ বললেন, “তখন ভ্যাগাবন্ড ছিলাম। এখন কাজ আছে। চারদিন আউট অফ স্টেশন থাকাটা সমস্যা হতে পারে”।
প্রিয়া ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বললেন, “ফাইন। থাকো তুমি নিজের অন্ধকারে। আমি ঘুমালাম”।
বিপ্রতীপ কিছু বললেন না। ফাইলটা আবার ওপেন করলেন।
কিছু কিছু ফাইল নিজের অজান্তেই ওপেন হয়ে যায়। না চাইলেও।
৩।
“আপনি এই জঙ্গল অভিযানটা করে নিন মিস্টার বসু। গল্পটা আমরা একটু ভেবেছি। তবু আপনি চাইলে আপনার ইনপুটস নেওয়া যাবে। আমাদের গ্রুপ প্রোডাকশানই থাকবে। স্টোরি রাইটার হিসেবে আপনার নামই যাবে। কেমন?” অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললেন লোটাসের কর্ণধার ভাস্কর প্যাটেল।
ভদ্রলোকের কথা বার্তা অত্যন্ত বিনীত। কখনো উচু গলায় কথা বলেন না। কারও ওপর রাগ হলে নীরবে ব্ল্যাক লিস্ট করে দেন। সে আর ইন্ডাস্ট্রিতে কোন হাউজেই কাজ পায় না।
ক্ষমতাবান মানুষেরা এমনই হন। তাদের উচু গলায় কথা বলতে হয় না।
বিপ্রতীপ ভাস্কর প্যাটেলের মাথার চারপাশে একটা বলয় দেখতে পারছিলেন। ক্ষমতাবান লোকেদের মাথার পিছনে এরকম বলয় তিনি কল্পনা করে নেন। মনের বুঝতে সুবিধা হয়। কম্পিউটার যেমন সব কিছু বাইনারিতে কনভার্ট করে নেয়, মনও তেমনি সব কথা নিজের মত করে অনুবাদ করে নেয়। নিজেকে বুঝিয়ে নেয়।
বিপ্রতীপ বললেন, “আমাকে গল্পের ব্রিফিংটা দিয়ে দেবেন। আমি স্ক্রিপ্ট রেডি করে জমা করছি”।
ভাস্কর হাসলেন, “সো নাইস অফ ইউ। আমি আজকেই আপনার নামে একটা অ্যাডভান্স চেক ইস্যু করতে বলে দিচ্ছি”।
বিপ্রতীক উঠতে গিয়েও উঠলেন না। বললেন “আমার একটা স্ক্রিপ্ট ছিল মিস্টার প্যাটেল”।
ভাস্কর বললেন “স্টোরি আপনার?”
বিপ্রতীপ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।
ভাস্কর বললেন, “নন কমার্শিয়াল?”
বিপ্রতীপ বললেন “হ্যাঁ”।
ভাস্কর বললেন, “আপনার লবি আছে মিস্টার বোস? একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ারড পাওয়ার আশা আছে? তাহলে আমি ভেবে দেখতে পারি?”
বিপ্রতীপ হেসে ফেললেন।
ভাস্কর বললেন “কী হল? আই অ্যাম নট জোকিং। আমি কথাটা সিরিয়াসলি বললাম”।
বিপ্রতীপ বললেন, “আমি জানি আপনি কথাটা সিরিয়াসলি বলেছেন মিস্টার প্যাটেল। আর আমি এও জানি, এই বাজারে আপনার মত সোজা সাপটা মানুষও বিরল। আমিও ভণিতা করব না। নাহ, আমার ন্যাশনাল অ্যাওয়ারড পাওয়ার জায়গা নেই। ইনফ্যাক্ট এখন যারা ওখানে আছেন, তারা আমায় পছন্দ করেন না”।

ভাস্কর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বিপ্রতীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ব্যবসায়ী হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে আছি তো। হাতে গোণা কয়েকটা লোককে আমি রেসপেক্ট করি মিস্টার বোস। আপনি আমাকে স্ক্রিপ্টটা শোনাতে পারবেন? আমি নর্থ বেঙ্গল যাব। আপনার ওয়াইফের প্রজেক্টটায় সেই আমাদের ইনভেস্টমেন্টই লাগছে। আমার সঙ্গে দার্জিলিং চলুন। ম্যালে বসে বলে ফেলবেন না হয় এই গুজ্জু ব্যবসায়ীকে আপনার গল্পটা। পছন্দ হলে আমি সিনেমাটা করব। এক্সপেন্সের ব্যাপারে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি বুঝে নেব। যাবেন?"
বিপ্রতীপ বললেন "আজ? এখন?"
ভাস্কর বললেন "দেড় ঘন্টার মধ্যে বেরোতে হবে। আপনার কি বাড়িতে কোন কাজ আছে?"
বিপ্রতীপ হাসলেন, "না। কাজ কীসের? স্নান হয় নি শুধু"।
ভাস্করও হেসে উঠলেন, "আপনার স্নানের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি বসু। আপনার সঙ্গে কোথাও যাবার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। ভাল হল আপনি আজকে স্ক্রিপ্টটার কথা বললেন। এই ছুতোয় আপনার সঙ্গে থাকা যাবে। ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাকে সবাই আড়ালে কী বলে জানেন? দ্য সেইন্ট। আমিও দেখতে চাই কেমন সেইন্ট আপনি"!
বিপ্রতীপ বললেন "আপনি আমায় একটা টাওয়েলের ব্যবস্থা করে দিন শুধু। দার্জিলিং গিয়ে আমার স্নান করার ক্ষমতা হবে না। পারদ কুড়ির নিচে নামলে আমি স্নান করি না। আমার আই কিউ নেগেটিভে চলে যায়"।
ভাস্কর হাসতে হাসতেই বললেন "আসুন আসুন। আমি ব্যবস্থা করছি"।

৪।

এয়ারপোর্টে দুজনে দুপুরের দিকে পৌঁছলেন। সিকিউরিটির পর ভাস্কর কফি নিয়ে এসে বিপ্রতীপকে দিয়ে বললেন, "নিন ডিরেক্টরসাব"।
বিপ্রতীপ লজ্জিত হয়ে বললেন, "আরে আপনি আবার এসব কেন করছেন? এখানে প্রচুর দাম জিনিসের। এত দাম দিয়ে কেনে কী করে মানুষ কে জানে!"
ভাস্কর কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন "এরকম কোন ব্যাপার না আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, যে আমার প্রচুর টাকা আছে আর সে আমি খরচ করতে পারি। আপনি আমার মেহমান। আপনি আসায় যে আমি খুশি, সেটা প্রমাণ করতেই আপনার জন্য কফি আনলাম মনে করতে পারেন"।
বিপ্রতীপ বললেন, "সো কাইন্ড অফ ইউ। আই এম রিয়েলি অনারড"।
ভাস্কর বললেন "আপনার স্ক্রিপ্টটায় আউটডোর ক'টা আছে?"
বিপ্রতীপ বললেন "সাতটা আছে। সাতটাই রাত বারোটার পরের কলকাতায়। অসুবিধে হবার কথা না। এই শহরেরই গল্প"।
ভাস্কর বললেন "বাঁচালেন। আজকালকার দিনের ছেলে ছোকরারা স্ক্রিপ্ট শুরু করে আমস্টারডাম দিয়ে। যেন আমতা। শুরুতেই আমার হার্ট বিট বাড়িয়ে দেয়। আই মিন ইমাজিন করা ভাল, কিন্তু প্রোডিইউসারের কথা ভাব রে বাপ! হলিউড বা বলিউড না। বাংলায় সিনেমা বানাবি! বোঝার চেষ্টা কর!"
বিপ্রতীপ কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন "কেন? হচ্ছে তো, আজকাল বিদেশে প্রচুর সিনেমার গানের শ্যুটিং হয়"।
ভাস্কর বললেন "ফুল ফ্লেজড কমার্শিয়াল সিনেমা সেগুলো। লাভ না হোক, স্যাটেলাইট রাইটস আর মিউজিক চ্যানেল থেকে টাকা উঠে আসে। তুমি প্যানপ্যানানি বাংলা সিনেমা বানাবে আর চাইবে ম্যাডাগাস্কারের রাস্তায় সে সিনেমা শ্যুট হোক, কী করে হবে বলুন তো?"

বিপ্রতীপ হেসে ফেললেন, "আপনাকে সাহস করে একটা কথা জিজ্ঞেস করি প্যাটেলবাবু? মুড ভাল আছে মনে হচ্ছে"।
ভাস্কর বললেন, "আছে। অবশ্যই আছে। দার্জিলিং যাবার কথা শুনলেই আমার মুড ভাল হয়ে যায়। কার্শিয়ং এ পড়াশুনো তো। করুন কী জিজ্ঞেস করবেন"।
বিপ্রতীপ বললেন, "আপনি এত পরিচালক থাকতে জঙ্গল অভিযানটা আমাকে দিয়ে ডিরেক্ট করাতে চাইছেন কেন? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। আমি জানতে পারি সেটা কী?"
ভাস্কর মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমি জানতাম এই প্রশ্ন আপনি করবেন। উত্তরটা রেডি করেই রেখেছি তাই। শুনুন বসুবাবু, এই মুহূর্তে আমাদের ফান্ড দরকার। একটা স্ট্রং ফান্ড। সেটার জন্য জঙ্গল অভিযানের মত সিনেমা মাস্ট। আমরা নিয়মিত মার্কেট সার্ভে করি। এসব সিনেমা করলে বাচ্চারা দেখতে আসবে। কোন বাচ্চা তো আর একা সিনেমা দেখতে যাবে না। তার সঙ্গে তার বাবা আসবে, মা আসবে। ডিসেম্বরে রিলিজ মানে বুঝে নিন বাড়িতে আরও যারা আত্মীয়স্বজন ছিল, তারাও আসবে। আপনি আমাদের হাউজে কাজ করবেন। আপনার থেকে এই ব্লক বাস্টার দেওয়ার বেটার লোক আর কে আছে মিস্টার বসু?"
বিপ্রতীপ বললেন "তা ভাল। তবে আশা করব বাঘ সিংহকে ডিরেক্ট করতে গিয়ে তাদের পেটে চলে যাব না"।
ভাস্কর ভাল মুডে ছিলেন। চারদিকে লোককে চমকে জোরে হেসে উঠলেন।
#
প্লেন ঠিক সময়েই ছিল। তারা চারটের মধ্যে বাগডোগড়া পৌছে গেলেন।
গাড়ি তৈরী ছিল। দুজনে গাড়িতে বসতে গাড়ি স্টার্ট নিল।
বিপ্রতীপ বললেন, "সত্যি, আপনার সঙ্গে এসে কত লাভ হল বলুন তো? এই যদি আমরা আসতাম, তিন মাস আগে লাইন দিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটো রে, বাক্স বেডিং নিয়ে লড়াই করে জায়গায় সেধিয়ে যাও রে, এন জেপি নেমে দৌড়াদৌড়ি কর গাড়ির জন্য... ভাবা যায়?"
ভাস্কর বললেন "কাম অন মিস্টার বোস, এবার কিন্তু আপনি আমার লেগ পুল করছেন। আপনি এতগুলো সিনেমা বানিয়েছেন, আপনাকে দার্জিলিং আসতে হলে বুঝি এভাবে আসতে হয়?"
বিপ্রতীপ জানলার বাইরে তাকিয়ে বললেন "হত এককালে। সে এক দিন গেছে। পাহাড়ের রেখাগুলো তো রূপকথার গল্প মিস্টার প্যাটেল। এগুলো যা শিহরণ আনে, আর কোন কিছু আনতে পারে না"।
ভাস্কর বললেন, "অ্যাকচুয়ালি আমিও তো বেশিরভাগটাই বাঙালি। এই আবেগটা আমারও যে আসে না তা নয়। আপনার গল্পটা তো বললেন কলকাতার গল্প। পাহাড় নেই তাতে?"
বিপ্রতীপ মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। শেষটায় আছে একটু। পাহাড়কে না ছুঁলে সব কিছু বড় অপূর্ণ থেকে যায় আসলে"।
বিপ্রতীপের ফোন বাজছিল। তিনি দেখলেন প্রিয়া ফোন করছেন। এক্সকিউজ মি বলে ফোনটা ধরলেন, প্রিয়া অধৈর্য গলায় বললেন, "কোথায় ছিলে? কতক্ষণ ফোন করে যাচ্ছি! লোটাসের সঙ্গে মিটিংটা কেমন হল? ফোন ফ্লাইট মোডে ছিল কেন?"
বিপ্রতীপ বললেন, "এই তো। লোটাসকে নিয়েই তোমার কাছে যাচ্ছি"।
প্রিয়া বিস্মিত গলায় বললেন, "মানে?"
বিপ্রতীপ হাসলেন, "ভাস্কর বাবুর সঙ্গে দার্জিলিং আসার প্ল্যান হল হঠাৎ করে। আসছি তোমাদের ইউনিটেই"।
প্রিয়া বললেন "বাহ। আমি যখন বললাম, তখন তোমার কত কাজ এসে গেছিল বল?"

বিপ্রতীপ ভাস্করের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "স্বয়ং ইন্ডাস্ট্রি অর্ডার করেছেন, আমাকে তো যেতেই হবে। দেখা যাক, ভদ্রলোককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার স্ক্রিপ্টটা নামানো যায় নাকি"!

প্রিয়া গলা নিচু করে বললেন "রিয়েলি? এতটা র‍্যাপো হয়ে গেছে?"

বিপ্রতীপ বললেন "আমি গিয়ে কথা বলছি"।

প্রিয়া বললেন "আচ্ছা। এসো, কথা হবে"।

ফোন রাখতে ভাস্কর বললেন, "কী ভাগ্যিস, প্রিভিলেজড ক্লাসের মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম বলুন তো! দেড় ঘন্টার মধ্যে ওই কংক্রিটের জঞ্জালটা ছেড়ে পাহাড়ে আসতে পারলাম। পরের জন্মেও যেন পকেটে টাকা নিয়ে আসতে পারি মিস্টার বোস। এই পৃথিবীতে গরীব লোকের কোন জায়গা নেই"।

বিপ্রতীপ ফিস ফিস করে বললেন, "তা যা বলেছেন। এখানে গরীব হয়ে জন্মানোটা অভিশাপ ছাড়া কিছু নয়। কিচ্ছু নয়"।

৫।

সাড়ে আটটা বাজল হোটেলে পৌঁছতে। প্রিয়া লবিতে অপেক্ষা করছিলেন। ভাস্করকে দেখে হাসলেন, "বিপ্রতীপকে যে আপনি নিয়ে আসতে পারলেন, এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার প্যাটেল। ও কিছুতেই আসত না। আমার কথায় তো আসতই না। বউ পুরনো হয়ে গেছে কিনা"।

ভাস্কর বললেন "তা নয়। উনি হলেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সেইন্ট। ওকে সব সময় একা ছেড়ে রাখা দরকার"।

বিপ্রতীপ প্রিয়াকে বললেন "রাজেশ কোথায়? ওকে বল নি আমি এসছি?"

প্রিয়া বললেন "এখনও লোকেশনে। তুমি আসবে বলে খুশি হয়েছে"।

ভাস্কর বিপ্রতীপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, "আপনি রেস্ট নিন মিস্টার বোস। আমরা কাল সকালে মিট করছি। গল্পটা শুধু আমি শুনব"।

বিপ্রতীপ বললেন "শিওর। আপনাকে ধন্যবাদ সময়টা দেওয়ার জন্য। আমি কৃতজ্ঞ"।

ভাস্কর বিপ্রতীপের কাঁধে হাত রেখে বললেন "মাই প্লেজার। আসি"।

হোটেলের বয় দাঁড়িয়েই ছিল। ভাস্কর তার সঙ্গে চলে গেলেন।

প্রিয়া চোখ বড় বড় করে বিপ্রতীপের দিকে তাকিয়ে বললেন "তুমি কী করেছো?"

বিপ্রতীপ অবাক হয়ে বললেন, "কী করলাম?"

প্রিয়া বললেন, "মিস্টার ভাস্কর প্যাটেলকে দেখছি তুমি হিপনোটাইজ করে দিয়েছো! এই কিপটে লোক তোমাকে প্লেন ভাড়া দিয়ে দার্জিলিং নিয়ে এসেছে! এই আমায় চিমটি কাটবে?"

বিপ্রতীপ বললেন "কাটব। আমায় রুমে নিয়ে চল দয়া করে। মারাত্মক ঘুম পেয়েছে"।

প্রিয়া বললেন, "রাজেশ আসবে। মদ নিয়ে বসবে না?"

বিপ্রতীপ শিউরে উঠে বললেন, "প্লিজ না। আমায় কনসেনট্রেট করতে দাও। সাত বছর ধরে স্ক্রিপ্টটা লিখেছি প্রিয়া। গল্পটা বলতে হবে। আজ শুধু ঘুমটা দরকার আমার। আর কিচ্ছু না"।

প্রিয়া বিপ্রতীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সরি"।

বিপ্রতীপ বললেন, "কেন?"

প্রিয়া বললেন "তোমায় কাল রাতে অনেকগুলো বাজে কথা বলে ফেলেছিলাম। উচিত হয় নি। খারাপ লাগছিল গোটা রাস্তাটা। ভাগ্যিস এলে তুমি"।

বিপ্রতীপ প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিনেমাটা যদি হয়, তোমায় যদি কাস্ট না করি, তুমি রাগ করবে প্রিয়া?"

প্রিয়া চারদিকে তাকিয়ে বললেন "কথাগুলো রুমে গিয়ে বলি?"

বিপ্রতীপ বলল “ওহ। তাই তো। চল”।
দুজনে রুমে ঢুকলেন। দরজা বন্ধ করে বিপ্রতীপকে অনেকক্ষণ ধরে ঠোঁটে চুমু খেলেন প্রিয়া। বিপ্রতীপ বাধা দিলেন না। প্রিয়া বিপ্রতীপের ঠোঁট থেকে ঠোঁট সরিয়ে বললেন “তোমার যা ইচ্ছা হবে, যেটা ইচ্ছা হবে তুমি তাই করবে। আমাকে নিতে হবে না। শুধু তোমার স্বপ্নের সিনেমাটা হোক। খুশি?”
বিপ্রতীপ বললেন “তুমি একটুও রাগ করবে না?”
প্রিয়া হাসলেন, “আমি তো মানুষ। রাগ করব না বলতে পারব না। তবে এই সিনেমাটা তোমার স্বপ্নের সিনেমা। তুমি যাকে খুশি, যেভাবে খুশি শেষ কর। তোমার থেকে তো বেশি আর কিছু না। কর। তবে হ্যাঁ, মদ খেয়ে গালিগালাজ করতে পারি। সেগুলো হিসেবের মধ্যে রেখে দিও। রাখো তো সেগুলো হিসেবের মধ্যে?”
বিপ্রতীপও হাসলেন, “রাখি”।
প্রিয়া বললেন, “একটা মাফলার আনতে পারলে না? নাও, এই শালটা জড়াও। ঠান্ডার ধাঁচ আছে। ঠিক ঠান্ডা লাগিয়ে বসবে। তারপর হাঁচতে শুরু করবে”।
বিপ্রতীপ পা ধুয়ে খাটে বসে বললেন “শ্যুট হয় নি আজ তোমার?”
প্রিয়া বললেন, “কাল ভোর থেকে যুদ্ধ শুরু হবে মিস্টার সেইন্ট”।
বিপ্রতীপ হাসলেন “তুমি খুশি হয়েছো আমি এসেছি?”
প্রিয়া বললেন “ভীষণ খুশি। আমি তো তোমার মত ভগবান না বাপু। আমি রক্তমাংসের মানুষ। আমার রাগ, দুঃখ, অভিমান সব হয়। হিংসেও হয়। তোমায় যখন কোন উঠতি নায়িকা জড়িয়ে ধরে, আমার স্কুল লাইফে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে তার সঙ্গে তোমাকেও আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিই। জাগতিক সব কিছু থেকে তুমি কীভাবে সরিয়ে রাখো তুমিই জানো। মাঝে মাঝে ভেবেছি, তোমাকে ডিভোর্স করলে বোধ হয় ভাল থাকতাম। পরক্ষণে বুঝেছি, থাকতাম না। আমি ইন্ডাস্ট্রিতে এক মাত্র মানুষ, যে তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুতে পারি। তুমি হয়ত আমাকে জড়িয়েই কোন সীন ভাবছো, অন্য কোন খানে আছো। আমি সেটাও বুঝতে পারি। কিন্তু তাও তো শারীরিকভাবে থাকো। তাই থাকি না হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার বুকে মাথা ঠুকি, তোমার পাথরের মত ব্যক্তিত্বটার ভুল বের করি, কোন একজনকে তোমার সঙ্গে কল্পনা করে তোমাকে ছোট করি। পারি নি। হয় না। এত পারফেক্ট কেউ কী করে হয়? তুমি আমার কী দেখে বিয়ে করেছিলে বিপ্রতীপ?”
বিপ্রতীপ দু হাত তুলে ফ্রেম বানালেন, বললেন “ক্লোজ শট, নায়িকার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। নায়িকা দিশেহারা। হেসো না প্রিয়া... আমি জানি তুমি হাসবে না... ভালবাসবে সব কিছুর পরেও... ক্যামেরা মুভ করছে প্রিয়া, তুমি সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে গিয়েও দ্বিধায় ভুগছো, পারছো না সব দূর করে চলে যেতে... দু চোখ ছাপিয়ে জল আসছে... প্রিয়া... গ্লিসারিন ছাড়া কাঁদো... প্রাণভরে কাঁদো...”
৬।
ভোর ছ’টা। প্রিয়া তৈরী হয়েছেন। বেরোবেন যে কোন সময়। রুমের কলিং বেল বাজল।
প্রিয়া দরজা খুলে দেখলেন ভাস্কর দাঁড়িয়ে আছেন। প্রিয়া বললেন “ঘুমোচ্ছে তো!”
ভাস্কর বললেন “ডাকা যাবে?”
প্রিয়া ডাকার আগেই বিপ্রতীপ উঠে বসে বললেন “ভাস্কর আসুন প্লিজ”।
ভাস্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।
বললেন “চলুন, বেরোই। ম্যালে যাই”।
বিপ্রতীপ বললেন “ভাস্করবাবু, আপনাকে গল্পটা শোনানোর আগে দুটো শর্ত আছে”।

ভাস্কর হাসলেন "বলুন"।
বিপ্রতীপ বললেন "আমি সার্কাসটা বানাবো না। যাকে খুশি দিয়ে বানান। আমি বানাবো না। ওসব সিনেমা বানাবো বলে আমি সিনেমা বানাতে আসি নি। দুই, আপনি যদি আমার গল্পটা শোনেন তবে সিনেমাটায় আপনাকে ইনভেস্ট করতেই হবে। যদি একজন দর্শকও আসে আসবে। যদি সিনেমাটা একটা অ্যাওয়ার্ডও না পায়, না পাবে। এই দুটো শর্ত। এবার বলুন, গল্পটা শুনবেন?"
প্রিয়া ঘাবড়ে গেলেন। বিপ্রতীপকে বললেন , "মাথা খারাপ হয়ে গেল তোমার? এত দিনের স্বপ্নের সিনেমাটার আগে... প্লিজ ভাস্করদা আপনি কিছু..."
ভাস্কর প্যাটেল চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললেন, "রাজি। আর একটাও কথা না। এবার যাবেন? কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা মিস করে যাবেন কিন্তু। যাবেন না?"
বিপ্রতীপ হাসিমুখে বললেন "নিশ্চয়ই যাব। পাহাড়ে এসে কেউ পাহাড়কে উপেক্ষা করে থাকতে পারে? চলুন। আচ্ছা, প্রিয়ার শ্যুট হয়ে গেলে আমি আর প্রিয়া হাত ধরাধরি করে চা বাগান ঘুরতে যাব। সেই কতদিনের শখ জানেন মশাই। ভাবতেই কেমন উত্তেজনা হচ্ছে"।
দুজনেই হেসে উঠলেন।
প্রিয়াও হাসলেন। শুধু হাসতে হাসতেই কখন যে তার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল, নিজেও বুঝতে পারলেন না...

বিশ্বাসঘাতক

আজ অন্তরার বৌভাত। কন্যাযাত্রী এসেছি।

গিফট এনেছি।

অন্তরা খুব সুন্দর করে সেজেছে। আমায় দেখতে পেয়েছে। আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, "চলেই এলাম তোমার ফুলসজ্জায়। প্রথমে ভেবেছিলাম আসব না। পরে ভাবলাম বাড়িতে একা একা কাঁদার থেকে এখানে এসে চান্না মেরেয়া গান গাওয়া ভাল"।

অন্তরা আড় চোখে দেখে নিল ওর বর দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ তুমি না এলেই আমি খুশি হতাম"।

আমি হাসলাম। বললাম, "ভাল থেকো"।

অন্তরা বলল, "তুমি ভাল থেকো না। সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরবে, আমি সে আশাই করব"।

অন্তরার বর দূরে কোন আত্মীয়র সঙ্গে কথা বলছে। ক্যামেরাম্যান আলো ফেলছে আমাদের দিকে। ছবি উঠছে। একজন অত্যন্ত সুসজ্জিতা মহিলা স্টেজে ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। আমি নামলেই তিনি গিফট দিতে উঠবেন। আমি নামছি না দেখে তিনি বিরক্ত হচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে। উশখুশ করছেন।

আমি অন্তরাকে বললাম, "আজ ফুলসজ্জা"।

অন্তরা বলল, "হ্যাঁ। তো? তোমার কী?"

আমি বললাম, "এই অপরিচিত লোকটা তোমায় আদর করবে। তোমার ভাল লাগবে?"

অন্তরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি একটা ক্রিমিনাল। জানো সেটা তুমি?"

আমি বললাম, "জানি। এই ক্রিমিনালটার সঙ্গে তুমি অনেক বছর ধরে প্রেম করেছো। ভাল লাগছে ব্যাপারটা?"

অন্তরা বলল, "তুমি স্টেজ থেকে নামো। সবাই দেখছে"।

আমি স্টেজ থেকে নেমে গেলাম। সুসজ্জিতা মহিলা স্টেজে উঠলেন। অন্তরাকে গিফট দিয়ে হেসে হেসে ছবি তুলছেন। আমি একটা চিলি চিকেনের প্লেট নিয়ে অন্তরার স্টেজের সামনের দিকের চেয়ারের একটায় বসলাম।

অন্তরার বর ভীষণ ফর্সা। ক্যামেরাম্যানের কথা শুনে অন্তরার কাঁধে হাত দিয়ে দিয়ে ছবি তুলছে। অন্তরা হাসতে পারছে না। ছবি তুলেই আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি হাসি হাসি মুখে চিলি চিকেন খেতে খেতে কফি নিলাম।

বিয়ের দিনও আমি বসে বসে ওর বিয়ে দেখেছি।

প্রেমিকার বিয়ে দেখা পুণ্যের কাজ। কে বলেছেন জানি না। যেই বলে থাকুক, ঠিকই বলে থাকবেন।

অন্তরার সঙ্গে যেদিন প্রেমটা শুরু হল, সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। পাড়ার শম্ভুদের বাড়িতে হঠাৎ করে আমাদের চোখে চোখ পড়ে গেল।

পাড়ার লোকের অলক্ষ্যেই আমরা এদিক সেদিক দেখা করতে লাগলাম।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, বিয়েটা হল না।

অন্তরার দোষ নেই। দোষটা আমারই। কিছু করতেই পারলাম না।

বার বার কত কাঁদল।

আমি পাথর হয়ে রইলাম।
ফলশ্রুতি, আজ ওর বিয়ে খেতে এসেছি।
অন্তরা প্রথম দিকে খুব কান্নাকাটি করেছে। আজ হাসি মুখে গিফট নিচ্ছে। বর বাইরে থাকে। ভাল ভবিষ্যৎ। বড় চাকরি।
প্রেম মানে কী? খুব কঠিন ব্যাপার।
এটুকু বুঝি, সে চলে গেলে বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যায়।
অন্তরার ভাই পুপু এসে ডাকল, "শুভদা, ব্যাচ বসে গেছে"।
আমি ওকে বললাম, "খেয়ে নিয়েছি তো"।
পুপু আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "যাহ, এর মধ্যে খেয়েও নিলে? কখন খেলে?"
আমি হাসলাম, "আরে ঢুকেই খেয়েছি। পেটটা চোঁ চোঁ করছিল মাইরি"।
পুপুও হাসল, "উফ, কী যে কর"।
পুপু চলে গেল।
আমি যেদিন প্রথম অন্তরার হাত ধরি ক্লাবের মোড়টায়, পুপু তখন ফাইভে পড়ে। আমায় খুব ভালবাসে। ওকেও বলি নি আমাদের ব্যাপারটা।
সে বয়সটায় বুঝতাম না, মানুষ যেটা চায়, চাইলেই সেটা পায় না।
অন্তরা আমাকে বলেছিল, "তুমি যা খাওয়াবে, আমি তাই খাব"।
আমি ওকে দিনের পর দিন বুঝিয়েছি জীবনটা এত সোজা না। সব কিছুর জন্য টাকা লাগে। টাকা ছাড়া কিচ্ছু হয় না। তোমার বন্ধুরা বড় বড় জায়গায় যাবে, ভাল গয়না পরবে, আর আমার বউ হয়ে তুমি সে সবের কিচ্ছু পাবে না। প্রথম প্রথম বোঝাতে পারি নি। কেঁদেছে, কিছুতেই মানে নি।
পরে আমার পাথুরে হাব ভাব দেখে ধীরে ধীরে সরে গেছে।
কে একজন লম্বা মত ভদ্রলোক এলেন। অন্তরাকে মনে হয় একটা সোনার কিছু দিলেন। এদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় টাইপ কিছু হবে। অন্তরা সেটা হাতে নিয়ে ফটো তুলল।
আমার ক্ষিদে নেই।
আমার ক্ষিদে পাচ্ছে না। বিয়ে বাড়ি ভর্তি লোকজনের কত আনন্দ। বাচ্চারা দৌড়চ্ছে, বড়রা হাতে খাবারের প্লেট নিয়ে গল্প করছে, কেউ গিফট এনে অন্তরাকে দিয়ে ছবি তুলছে, অন্তরার বনেদী শ্বশুর বাড়ির লোকরা হাঁটাচলা করছে।
কারা যে বলেন, মানুষের নাকি খুব কষ্ট! বিয়েবাড়ি এলে তো সেটা মনে হয় না। সবাই কত আনন্দ। একটা গ্রুপ জোরে জোরে হাসি ঠাট্টা করছে। কোত্থেকে একটা বাচ্চা মুখ ভর্তি আইসক্রিম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
আনন্দ। অন্তরা ঠিক করেছিল আমাদের ছেলের নাম হলে নাম দেব আনন্দ। বাচ্চাটাকে দেখে সেরকমই লাগল। এরকমই কত কত স্বপ্ন দেখে একেকটা জুটি।
বাস্তবে দেখা যায় সব কেমন তছনছ হয়ে গেল। কেউ দায়ী না, কেউ দায়ী হয় না।
অন্তরা আমাকে বলেছে আমি ওকে সত্যিকারের ভালবাসি নি কোন দিন, থাকলে কিছু না কিছু ঠিক করতাম। আমি আর ওকে বুঝিয়ে উঠতে পারি নি, টাকা না থাকলে ভালবাসা থাকে না। কোন মুখে বিয়ে করব? অভাবে ভালবাসা থাকবে না। চোখের সামনে ভালবাসাকে পুড়ে যেতে দেখার থেকে বিচ্ছেদ হওয়া অনেক ভাল।
অন্তরার বরের একগাদা ভাই, বোন স্টেজে উঠল। কত কায়দা করে ফটো তুলছে ওরা। আমি সেটাও দেখলাম। সব দেখা উচিত। মানুষ যদি নিজের সাফল্য সেলিব্রেট করতে পারে, তাহলে মানুষের নিজের

ব্যর্থতাকেও সেলিব্রেট করা উচিত। আরেক প্লেট চিলি চিকেন নিলাম। কফিও। ডিনার করার ক্ষমতা হবে না। বাসে বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।

আমরা যেরকম ইয়ার্কি মারতাম সেরকম হবে হয়ত। অন্তরা দুধের গ্লাস নিয়ে ওর বরের ঘরে ঢুকবে। ওর বর ওকে ধীরে ধীরে আদর করবে। আহ...

অন্তরা ঠিকই বলে।

আমি মানুষ না। আমার মধ্যে অদ্ভুত একটা বাজে লোক বাস করে। নইলে আমি এগুলো কল্পনা করছি কী করে?

কন্যাযাত্রীর খাওয়া হয়ে গেছে।

অন্তরার বাবা, মাসীরা অন্তরাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। অন্তরার বরকে এবার দেখতে পাচ্ছি কেমন অধৈর্য হয়ে গেছে। আগত ফুলসজ্জার জন্যই হয়ত। সুন্দরী বউ। সবাই বাসের দিকে রওনা দিয়েছে। বাচ্চারা চায় জানলার পাশের সিট, কেউ বা চায় বাসের পিছনের সিট। কেউ কাঁদবে, কেউ গান চালিয়ে আনন্দ করতে করতে যাবে। বাকিরা ঘুমোবে।

আমি দশ বারের মত ড্রাই চিলি চিকেনের প্লেটটা নিয়ে অন্তরার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম।

অন্তরা আমার দিকে তাকাল। অবাক করে ডাকল।

আমি বুঝলাম না কেন ডাকছে। এগিয়ে গেলাম। অন্তরার বর পাশেই ছিল।

আমি যেতেই অন্তরা ওর বরকে বলল, "ওর নাম শুভ। ওর সাথে আমি সাত বছর প্রেম করেছি। আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিল"।

অন্তরার বর আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমার যেন একটা হার্ট বিট মিস হল। হাঁ করে আমি অন্তরার দিকে তাকালাম।

অন্তরার বর বুঝতে পারছে না কী বলবে। বাড়ির লোকজন ভীষণ ব্যস্ত। এদিকে যে কী হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমি অন্তরার বরের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম, "ও ইয়ার্কি মারছে। আপনি কিছু মনে করবেন না"।

অন্তরা গলা নামিয়ে বলল, "না আমি ইয়ার্কি মারছি না। তুমি ওর কাছে স্বীকার কর, তুমি একটা ফেইলিওর। কিছুই করতে পারলে না জীবনে"।

আমি আর ঠান্ডা থাকতে পারলাম না। প্লেট নিয়েই বাসের দিকে জোরে হাঁটা লাগালাম। পিছন ফিরে দেখলামও না কী হয়েছে।

হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। অন্তরা যে এরকম করতে পারে আমি ভাবতেও পারি নি। কী ভয়ংকর! আমি ওকে টেনশন দিতে এসে নিজেই টেনশন খেয়ে গেলাম।

অন্তরার বাবা বাসের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "আরে ওঠো, ওঠো, বাস ছাড়বে তো। কোথায় যে চলে যাও। তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে বাস"।

আমি কোন মতে বাসে উঠে হাঁফ ছাড়লাম।

এ মেয়ে এরকম করতে পারে আমি ভাবতেই পারি নি।

মিনিট পাঁচেক পরে বাস ছাড়ল। আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম অন্তরা ঠিকই বলে।

আমি একটা কাপুরুষ।

মানুষের পর্যায়েই ফেলা যায় না আমাকে।

বাড়ি পৌঁছতে দেখি ফোনে মেসেজ করেছে অন্তরা, “চিন্তা কোর না। ওকে বলে দিয়েছি তুমি আমাদের পাড়ার পাগল। তোমাকে খ্যাপাতে এরকম করি প্রায়ই”।

মেসেজটা বেশ কয়েকবার পড়লাম।

পাগল?

ভেবেছিলাম ওর বিয়েতে গিয়ে ওকেই জ্বালিয়ে আসব।

অন্তরা ঠিকই বলে, আমাদের মত ক্রিমিনালদের শাস্তি হওয়া উচিত।

আর এই শাস্তি, ফাঁসীর শাস্তির থেকে কম কী?

মাথায় আসতে শুরু করল, ওর বর ওকে আদর করছে, আমি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে যেতে বাড়ি ফিরলাম।

কলিং বেল বাজালাম।

এক মহিলা দরজা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, “কেমন খেলে?”

আমার বউ।

যাকে ঠকিয়ে এত দিন অন্তরার সঙ্গে প্রেম করে এসেছি।

বার বার বুঝিয়ে এসেছি একটা বিয়ে করেও আরেকটা সংসার করাই যায়...

একটি ফোন এবং...

অসীম ল্যাপটপে কাজ করছিল। সুরভী এসে তার সামনে চেয়ার নিয়ে বসে বলল, “তোমার মোবাইলের পিনটা বল তো”।
অসীম ল্যাপটপের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, “বলা যাবে না”।
সুরভী বলল, “কেন বলা যাবে না”?
অসীম বলল, “কারণ এটা আমার প্রাইভেট স্পেস। এখানে কাউকে ঢুকতে দেব না”।
সুরভী বলল, “প্রাইভেট স্পেস? কীসের প্রাইভেট স্পেস? বউয়ের কাছে প্রাইভেট স্পেস বলে কিছু হয় নাকি? আমার ফোনে পাসওয়ার্ড অবধি দিতে লাগে না। কী এমন হাতি ঘোড়া আছে তোমার ফোনে যে লক দিতে হচ্ছে?”
অসীম বলল, “এখন যাও প্লিজ। একগাদা কাজ আছে। এখন তামাশা কোর না”।
সুরভী শব্দ করে উঠল। রান্নাঘরে বাসন কোসনে ঠোকাঠুকি লাগার শব্দ হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে এ সমস্যা সহজে যাবে না। মাথায় ঢুকেছে যখন, তখন এই নিয়ে ইতিহাস তৈরী হবে।
লকডাউনের সময় বাড়ি থাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে তাই নিয়ে থিসিস লেখা যেতে পারে।
অসীম আড়চোখে দেখে নিল সুরভী কাছাকাছি নেই।
সে তাড়াতাড়ি তার ফোনে ফ্যাক্টরি রিসেট মারল। দশ মিনিট মত সময় নিল। ফোনের সব স্মৃতি মুছে গিয়ে ফোন আবার নতুনের মত হয়ে গেল।
ইনিশিয়াল সেট আপ করে অসীম স্নানে ঢুকল।
বেরিয়ে দেখল সুরভী খাটে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। সে বলল, “কী হল আবার?”
সুরভী বলল, “কিছু হয় নি। এ আমার প্রাইভেট স্পেস। একদম আসবে না”।
অসীম সুরভীর কাছে বসে বলল, “আরে তুমি বুঝতে চাও না কেন? অফিসের কত ইম্পরট্যান্ট ফাইল মোবাইলে থাকে। কোন কারণে হাত পড়ে ডিলিট হয়ে গেলে কী হবে?”
সুরভী উঠে বসল, “আমার কপালে কী লেখা আছে? আমি মূর্খ? আমার হাতে পড়ে ডিলিট হয়ে যাবে? আমাকে অশিক্ষিত মনে হয়?”
অসীম বলল, “না, ঠিক তা নয়”।
সুরভী বলল, “তুমি যাও। নিজের কাজ কর। কাছে আসতে হবে না তোমার। যাও”।
অসীম ফোন এনে খাটে ছুঁড়ে দিয়ে বলল “সেভেন নাইন এইট নাইন টু সিক্স। নাও”।
সুরভী বালিশে মুখ গুঁজে বলল “লাগবে না”।
অসীম বলল, “নাও নাও”।
অসীম ভেবেছিল সুরভী নেবে না। তার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে সুরভী ফোনটা হস্তগত করল এবং আনলক করে কিছুক্ষণ ঘাটাঘাটি করে বলল, “কী ব্যাপার? ফোনে কিছু নেই কেন?”
অসীম বলল, “কিছুই তো থাকে না”।
সুরভী বলল, “আমার নাম্বার, আমার বাপের বাড়ির নাম্বার কিছুই তো নেই”।
অসীম বলল “ও তো আমার মুখস্ত থাকে”।
সুরভী বলল, “মুখস্ত থাকে? তাহলে বল তো আমার বাবার নাম্বারটা”।

অসীম বলল, “খুব সোজা, নাইন, ট, ওয়ান...ওহ, আমার পকেট ডায়েরীতে আছে। এখানে নেই”।
সুরভী তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “ফ্যাক্টরি রিসেট করেছো? কেন?”
অসীম হাসার চেষ্টা করল “আরে কিছু না। এমনি। অকারণ সন্দেহ করছ”।
সুরভী বলল, “সন্দেহটা তো তুমিই বাড়িয়ে দিচ্ছো। কেন সব রিসেট করতে হল? কী এমন ছিল?”
অসীম কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল, “আরে দূর, কিছুই ছিল না। খেতে দাও”।
সুরভী বলল, ‘নিজে নিয়ে খেয়ে নাও। আমি খেতে দেব না”।
অসীম বলল “এই শোন না, এরকম করছ কেন? বলছি তো কিছুই ছিল না”।
সুরভী বলল, “কিছুই যদি না থাকে তাহলে ডিলিট করতে না তুমি। ভাল লাগছে না। যাও”।
অসীম বলল, “ভাইরাস ছিল, বুঝলে না?”
সুরভী উত্তর দিল না।
অসীম বুঝল সুরভী রেগে গেছে।
বিয়ের প্রথম প্রথম সুরভী রাগলে যে এফোর্টটা দিত, এখন সেটা কমে গেছে।
আজকাল সুরভী রাগলে সে অন্যঘরে চলে যায়। রাগ কমলে দেখা যায় সুরভী নিজে থেকে এসেই কথা বলছে। এ ক্ষেত্রে কবে বা কখন রাগ কমবে বোঝা যাচ্ছে না।
ল্যাপটপ খুলে আবার কাজ শুরু করল অসীম। লকডাউনের জন্য ওয়ার্ক ফ্রম হোম হবার ফলে সমস্যা বেড়েছে। অফিসের আবহাওয়ায় যেভাবে কাজ হয়, বাড়িতে সেভাবে হয় না। তবু যতটা সম্ভব মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে শুরু করল সে। মিনিট দশেক কাজ করার পর হঠাৎ টনক নড়ল তার। সর্বনাশ। ফোনটা তো সুরভীর কাছেই রেখে এসেছে!
উঠে সুরভীর ঘরে গেল সে। সুরভী তার ফোনটা ঘাঁটছে। গলা খাকরে অসীম বলল, “ফোনটা দাও তো। অফিসে ফোন করতে হবে”।
সুরভী বলল, “আমার ফোন দিয়ে ফোন কর। আমি লুডো খেলছি। পাকা গুটি খাব অপোনেন্টের। ডিস্টার্ব কোর না তো”।
অসীম বলল, “ঠিক আছে। খেতে দাও”।
সুরভী ফোন থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, “বললাম তো, নিজে নিয়ে খাও”।
অসীম সুরভীর কাছে বসে বলল, “লক্ষীটি এরকম করছো কেন, দাও না ফোনটা। খুব জরুরি দরকার”।
সুরভী বলল, “দেব। খেলাটা শেষ হলেই দেব। এক কাজ কর, খেয়ে নাও। আমার সময় লাগবে”।
অসীম ঘর থেকে বেরোল।
ডাইনিং টেবিলে বসে কিছুক্ষণ মাথা চুলকে থালা নিয়ে ভাত বেড়ে নিল।
ডাল দিয়ে খানিকটা ভাত খেয়ে মুখ ধুয়ে উঠে সুরভীর কাছে গিয়ে বলল, “হল?”
সুরভী বলল, “মাংস কেমন হয়েছিল?”
অসীমের মনে পড়ল এই লকডাউনের বাজারেও সকালে বেরিয়ে লাইন দিয়ে মাংস নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল দুপুরে আরাম করে খাবে।
মাংস নিতেই ভুলে গেছে সে। একটু খুক খুক করে কেশে নিয়ে বলল, “মাংস খাই নি”।
সুরভী বলল, “কেন খাও নি?”
অসীম বলল, “ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়েছে মনে হল। বুকে কেমন ব্যথা ব্যথা করছে। ডাল দিয়েই খেয়ে নিলাম”।
সুরভী বলল, “ও। তা ভাল”।

অসীম চুপ করে বসে রইল। সুরভী খুট খুট করে যাচ্ছে তার ফোনটা।
অসীম উঠে আবার ল্যাপটপের সামনে বসল। যথেষ্ট চাপের কাজ আছে। কিছুতেই মন দিতে পারছিল না। কনফারেন্স আছে সন্ধ্যের সময়। এখন এক নতুন ঝামেলা শুরু হয়েছে। সারাদিন পর সন্ধ্যেবেলা অফিসের ঝাড়টা বাড়িতে খেতে হবে ওয়েব কনফারেন্সে। জীবনে শান্তি নেই।
মারাত্মক গ্লোবাল রিসেশন আসছে লকডাউনের পর। কী হবে কেউ বলতে পারে না। একটু এদিক থেকে সেদিক হলে অফিস থেকে জানিয়ে দেবে বাড়ি চলে যাও, তোমাকে আর লাগবে না।
মনোযোগ অন্য দিকে গেলে সমস্যা। কিন্তু কিছু করার নেই।
রূপকথার গল্পে যেমন রাক্ষসের প্রাণ থাকে ভ্রমরের মধ্যে, ফোনটাও হল সেরকমই একটা কিছু।
এসি চলা সত্ত্বেও ঘাম দিচ্ছিল অসীমের।
সুরভী ঘর থেকে বেরিয়েছে দেখল অসীম। সে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল তার ফোন নিয়েই সুরভী খেতে বসেছে। ইউটিউবে কোন ভিডিও দেখছে মন দিয়ে।
অসীম এ ঘর থেকে গলা তুলল, “অফিস থেকে ফোন আসবে। ফোনটা দিয়ে যাও”।
সুরভী বলল, “ফোন এলে দিয়ে যাচ্ছি তোমায়”।
অসীম নিজের পায়েই চাপড় মারল। এ ঘরে ল্যান্ডলাইন আছে। রতনকে ফোন করে তার ফোনে রিং করতে বলতে পারে কিন্তু রতনের নাম্বারটাও মনে পড়ছে না এখন। ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে সে ড্রয়ার ঘাঁটতে শুরু করল। কোন ডায়েরীতে যদি রতনের নাম্বারটা সেভ করা থাকে তাহলে বেঁচে যাবে সে। নাহ। ঈশ্বর সদয় হলেন না। পাওয়া গেল না রতনের নাম্বার। সবই তো ফোনে থাকে। আজকাল ওই যন্ত্রটাই কৃত্রিম মস্তিষ্কের কাজ করে। ফোনের মেমোরি যত বাড়ে, মানুষের মেমোরি তত কমতে থাকে। অথচ একটা সময়, যখন ল্যান্ডলাইনের যুগ ছিল, সবার মোবাইল নাম্বার মুখস্ত থাকত তার।
প্রাণপণে রতনের নাম্বার মনে করার চেষ্টা করে ল্যাপটপের মণিটরে লিখল সে। চান্স নিতেই হবে। যে নাম্বারটা মনে পড়ল, সেটাতেই ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করল অসীম।
এক মহিলার গলা ভেসে এল, “কে বলছেন?”
যাতে সুরভী না শুনতে পারে, সেভাবে গলা নামিয়ে অসীম বলল, “রতন আছে?”
“এখানে রতন বলে কেউ থাকে না”।
গম্ভীর গলায় কথাটা বলে ফোনটা কেটে দিলেন ওপাশের মহিলা।
অসীম জিভ কাটল। রতনের নাম্বার সেভেন টু ওয়ান জিরো জিরো দিয়ে শুরু ছিল, শেষের দিকটা মনে পড়ছে না কিছুতেই। এই মহিলার ফোন ধরার কথায় মনে পড়ে গেল, একটা সময় যখন প্রথম প্রথম ল্যান্ডলাইন এসেছিল, লাজুক অসীম বিভিন্ন নাম্বার ডায়াল করত যদি কোন মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত কোন দিন শুনতে পায় নি।
অথচ এখন, বিয়ে করার পরে রতনের ফোন চেষ্টা করতে গিয়ে শুরুতেই একজন মহিলার কাছে ফোন চলে গেল। এই হল কপাল। এরকম পোড়া কপাল নিয়েই জন্মেছে সে।
সুরভীর খাওয়া হয়ে গেছে। ফোনে ভিডিওটা চালু করে রেখেই সে মুখ ধুচ্ছে। অসীম দৌড়ে ফোনের কাছে গিয়ে ফোনটা তুলে বলল, “দেখি, কোন ফোন এসেছে কিনা”।
গামছায় মুখ মুছে সুরভী ঠান্ডা গলায় বলল, “ফোন এলে আমি তোমাকে ঠিক বলতাম। কাজ কর। ফোন এলে দিয়ে আসব। বললাম তো”।
অসীম বলল, “কী আশ্চর্য, তোমার তো ফোন আছে, আমার ফোন নিয়ে টানাটানি করছ কেন বল তো?”

সুরভী বলল, “আমার ইচ্ছা হয়েছে তোমার ফোনটা ঘাঁটব। তার আগে বল তো, ফোনের সব ডেটা মুছে দিলে কেন? তোমার অফিসের জরুরি ফাইলপত্র যদি তোমার ফোনেই থাকে, তাহলে সেসব ডিলিট করতে হল কেন?”

অসীম হাসার চেষ্টা করল, “আরে সেসবের তো ব্যাপ আপ নেওয়া আছে। ফোনে একটা ভাইরাস ঢুকেছিল আসলে। এখন যেরকম করোনা ভাইরাস দেখছো না, ফোনেরও সেরকম ভাইরাস থাকে। ভাইরাস অ্যাটাক হয়েছিল তো। সেটাকে তাড়াতেই সব ডিলিট করতে হল”।

সুরভী বলল, “তাই নাকি? সব ব্যাক আপ নেওয়া আছে? তাহলে ফোনটাকে আগের অবস্থায় নিয়ে এসো দেখি”।

অসীম বলল, “ও একদিনে হয় নাকি? তাছাড়া আমি অত কিছু পারিও না। অফিসে একটা নতুন ছেলে এসেছে সৌমিত্র বলে, হেবি দেখতে জানো তো, একদম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মত। ও এসব পারে। লকডাউন কাটুক, সব স্বাভাবিক হোক, অফিস গিয়ে সব ঠিক করে নেওয়া যাবে”।

সুরভী বলল, “আচ্ছা। ঠিক আছে। বুঝলাম”।

অসীম বলল, “বুঝলে যখন, ফোনটা দাও”।

সুরভী অসীমের হাতে তার ফোনটা তুলে দিয়ে বলল, “নাও। খুশি?”

অসীমের এতক্ষণ শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ জল গঙ্গোত্রী হিমবাহের গঙ্গার মত বয়ে চলছিল। এবার খানিকটা শান্ত হল।

সে স্বাভাবিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল, “খুশির কিছু নেই তো, কাজের সময় এসব করা ঠিক না”।

সুরভী হাসল, “আচ্ছা আর করব না। তবে মাঝে মাঝে মোবাইলটা রেখে বউয়ের দিকেও দেখো। আমি মনে হয় ওই যন্ত্রটার থেকে বেশি মনোযোগ দাবী করি, তাই না? যাক গে, এখন মাংসটা খাবে?”

অসীম কেজো ভঙ্গীতে বলল, “না না, কত কাজ”।

সুরভী মুখ টিপে হাসল। কিছু বলল না।

অসীম তার ঘরে গিয়ে ফোনটা খুলল। সুরভী একগাদা রান্নার ভিডিও দেখেছে। লুডো ইন্সটল করে লুডো খেলেছে।

অন্য মেয়েদের ছবি পাঠায় রতন। সেগুলো ফোন মেমোরিতে ভর্তি হয়ে গেছিল।

রাতে সুরভী আর সে মেয়েরা কল্পনায় মিলেমিশে এক হয়ে যেত।

কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে ফোনটা খাটে ছুঁড়ে দিল সে।

রতনকে বলে দিতে হবে, তাকে যেন আর ওসব না পাঠায়।

আর আজ সন্ধ্যে থেকেই আবার সবার নাম্বার ফোন থেকে মাথায় নিয়ে আসতে হবে।

যন্ত্র, যন্ত্রের জায়গায় থাক, মাথাটার ফ্যাক্টরি রিসেট দরকার এবার…

শরীর বিস্বাদ

সুপর্ণা আমার বন্ধু অর্পণের বউ। ওকে আমার ভাল লাগে।
অর্পণ আমার ছোটবেলার বন্ধু। ওর বউকে ভালবাসায় পাপ আছে আমি জানি।
কিন্তু কিছু করতে পারি নি।
আমার একবার পাপ বোধ হয়। আরেকবার হয় না। আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকি।
সুপর্ণাকে আমি ওদের বিয়ের দিন থেকেই ভালবাসি। শুভ দৃষ্টি শুধু অর্পণের হয় নি।
আমারও হয়েছিল। শুধু সুপর্ণা আমাকে সেদিন দেখে নি। অর্পণকে দেখেছিল।
আমার অস্বস্তি হয়েছে ওদের ফুলশয্যার দিনে। বাকি বন্ধুরা যখন অর্পণকে জিজ্ঞেস করেছে কেমন রাত কেটেছে, অর্পণ যখন বলেছে ও সে রাতে কিছু করতে পারে নি, আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। যেদিন আমাদের ক্লাবে এসে বলেছে সুপর্ণাকে প্রথম আদর করেছে, সে রাতে আমি খেতে পারি নি।
কেঁদেছি। তারপর নিজেকে বুঝিয়েছি, ভালবাসায় শরীরটা বড় কথা না।
ভালবাসাটাই বড় কথা।
অর্পণের বাড়িতে নানা ছুঁতোয় যাওয়া শুরু করলাম। ওদের বাড়িতে ওই দুজনই থাকত। অর্পণ ভাবেও নি আমার ওর বউয়ের প্রতি কোন টান আছে। ও ভেবেছে বন্ধু হিসেবেই গেছি। সেভাবেই ধীরে ধীরে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়িয়ে গেছি আমি।
অর্পণ অফিসের কাজে মুম্বই গেল। আমি সেদিন প্রথম সুপর্ণাকে প্রপোজ করলাম।
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।
সে সন্ধ্যেয় বৃষ্টি হচ্ছিল।
রণাদার দোকান থেকে সিঙ্গারা কিনে ওদের বাড়ি গেছিলাম। সুপর্ণা আমাকে দেখে খুশি হল। বলল, "আরে আপনি এসেছেন?"
আমি সিঙ্গারার প্যাকেটটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, "বন্ধু নেই, খোঁজ নিতে এলাম। ভাল আছো?"
বসার ঘরে বসিয়ে চা নিয়ে এল সুপর্ণা।
আমি চায়ের কাপের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললাম, "তোমাকে একটা কথা বলতে পারি?"
সুপর্ণা বলল, "বলুন, কিছু হয়েছে?"
আমি বললাম, "আমি তোমাকে ভালবাসি"।
সুপর্ণা খানিকটা চমকে উঠল। তারপরেই ওর সেই বিখ্যাত হাসিটা হাসল।
হেসে সোফায় বসে পড়ে বলল, "বেশ তো"।
আমি বললাম, "তুমি ভাবছো আমি ইয়ার্কি মারছি তাই না? তা কিন্তু না। আমি তোমাকে সত্যিকারের ভালবাসি। তোমাদের বিয়ের দিন থেকে। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখলাম"।
সুপর্ণা টিভি চালিয়ে দিল স্বাভাবিক মুখে। আমি চুপ করে চা খেয়ে উঠে বেরিয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম ও হয়ত অর্পণকে বলবে। দেখা গেল বলে নি।
অর্পণ দু দিন ছিল না। পরের দু দিন আমি যাই নি।
যদিও ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। বার বার মনে হচ্ছিল সুপর্ণাকে দেখতে পাবো না? তা হয় নাকি? অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালাম। অফিসেও বেশ কয়েকটা ভুল করলাম। বস বকলেন।

দুদিন পর যেই দেখলাম অর্পণ ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে ফিরছে, আমি সে সন্ধ্যেতেই ওদের বাড়ি গেলাম। দরজা খুলল সুপর্ণা। আমাকে দেখে হেসে বলল, "আরে আপনি আসেন নি কেন? বন্ধু ছিল না বলে বুঝি আসতে নেই?"

আমি অবাক হলাম, ও কি ভুলে গেছে আমি প্রথম দিন এসেছিলাম। তারপর বুঝলাম সুপর্ণা চায় না অর্পণ জানুক আমি এসেছিলাম। বা ভিতরে ভিতরে গুটিয়ে গেছে হয়ত।

আমি আর কিছু বললাম না। অর্পণের কাছে মুম্বইতে কী কী করল জেনে চলে আসলাম।

এর মাসখানেক পরের কথা। অর্পণ ভুবনেশ্বর গেল।

সেদিনও বৃষ্টি হচ্ছিল।

আমি আবার সিঙ্গারা নিয়ে ওদের বাড়ি গেলাম।

সুপর্ণা দরজা খুলে আমাকে দেখে বলল, "আসুন"। ও যেন জানত আমি যাব।

আমি বসলাম। সিঙ্গারা দিলাম। সুপর্ণা চা নিয়ে এসে আমাকে দিল। আমি বললাম, "একটা কথা বলি?"

সুপর্ণা বলল, "ভালবাসেন, তাই তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ"।

সুপর্ণা হেসে টিভি চালাল। তবে আগের দিনের মত আড়ষ্ট হয়ে থাকল না। আমি চা খেয়ে আরেকটু বসে বললাম "তুমি কিছু বলবে না?"

সুপর্ণা টিভির দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না।

আমি বললাম, "আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না এটা কেমন ভালবাসা। শারীরিক না, বিশ্বাস কর। তুমি আমাকে মারাত্মকভাবে টানো। আমি ফিরে ফিরে তোমার কথা ভাবি। অর্পণের প্রোফাইলে তোমার ছবি দেখি। আমার মধ্যে যে কী হয়..."

সুপর্ণা বলল, "চায়ে চিনি ঠিক হয়েছে?"

আমি চুপ করে উঠে বেরিয়ে গেলাম।

পরের দিন অফিস না গিয়ে সকাল দশটায় ওদের বাড়ি গেলাম। সুপর্ণা দরজা খুলে দিয়ে বলল, "কিছু বলবেন?"

আমি এলোমেলো চুলে দিশেহারা হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "তোমাকে সরি বলতে এসেছিলাম। আসি কেমন?"

বলে আর দাঁড়ালাম না। হড়বড় করে বেরিয়ে গেলাম।

বাড়িতে এসে বসে বসে ঘামতে লাগলাম। বুঝতে পারছিলাম আমি পাপ করছি, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না।

সন্ধ্যে হলে ওদের বাড়ি গেলাম। সুপর্ণা দরজা খুলে দিল। আমি ড্রয়িং রুমে বসলাম। বললাম, "তুমি কি আমাকে পাগল ভাবছো?"

সুপর্ণা বলল, "না। চা করে দিই?"

আমি বললাম, "তুমি কিছু বলছ না কেন?"

সুপর্ণা বলল "আপনি বসুন, আমি চা করে আনি"।

সুপর্ণা চা করতে গেল।

আমি একা একা বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর পর অপরাধবোধ ফিরে আসছে। নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু সুপর্ণার কথা মনে পড়লে সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট আমাকে বসিয়ে রেখে সুপর্ণা চা নিয়ে এসে আমার পাশে বসে আমার হাতটা ধরে বলল, "আপনি আমার সঙ্গে শুতে চান? চলুন। দেখবেন, তাহলে আর এরকম মনে হবে না"।
আমি ওর এই কথাটাকেই সম্মতি বলে ধরে নিলাম। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওর গালে চুমু খেলাম, ঘাড়ে, ঠোটে, বুকে, নাভিতে... শুইয়ে দিলাম সোফায় চুমু খেতে খেতে।
সমস্যাটা বুঝলাম চুমু খেতে খেতেই।
সুপর্ণা যেন পাথর প্রতিমা। কোন সাড় নেই। চুপ করে শুয়ে আছে। আমি থেমে গিয়ে বললাম, "কী হল?"
সুপর্ণা উঠে বসে শাড়ি ঠিক করে নিয়ে বলল, "চায়ে চিনি ঠিক হয়েছে?"
আমি বললাম, "তুমি... তুমি কিছু বলবে না? তুমি আমাকে ভালবাসো না?"
সুপর্ণা বলল, "ও ঘরে যাবেন? সোফাতে অসুবিধা হচ্ছে?"
আমার গরম নিঃশ্বাস পড়ছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে সুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরলাম। আবার ওর সারা শরীরে চুমু খেতে শুরু করলাম।
মিনিট খানেক পরে সুপর্ণা আমাকে আলতো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার জীবনে কোন মেয়ে নেই। আমিই প্রথম, এই জন্য আপনি একেবারেই আদর করতে পারেন না। আমাকে প্রথম রেপ করেছিল আমার ছোট কাকু। আমার তখন সবে প্রথম পিরিয়ডস হয়ে উঠেছে। বাড়িতে কেউ ছিল না। অসহ্য ব্যথা। তারপর মাঝে মাঝেই করে গেছে। কাউকে বলতে পারি নি। মাকে বলেছিলাম। মা শিখিয়ে দিয়েছিল কাউকে বলিস না। আপনার বন্ধুকেও বলি নি। অভিনয় করি। আপনার সঙ্গে অভিনয় করার প্রয়োজন নেই। তবে আপনি পারেন না আদর করতে। শরীরটাই চাই তো? মুখে যতই বলুন চাই না, আসলে ওটাই চাই। বুঝি। আসুন আপনাকে আদর করা শিখিয়ে দি। ও ঘরে আসুন"।
সুপর্ণা আমাকে ঠাটিয়ে একটা চড় মারল যেন। আমি বিস্ফারিত চোখে সুপর্ণার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ছিটকে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম।
আর কোন দিন আমি অর্পণের বাড়ি যাই নি।
সাহস হয় নি আর...

শরীর বিষাদ

শরীরে এত জায়গা থাকতে তার ঠোঁটটাই যে অর্ণবের এত পছন্দ, তিথি বুঝতে পারে না। হোটেলের ঘরে ঢুকে প্রথমেই তার ঠোঁটে চুমু খেতে শুরু করবে। সব কিছুর শুরুতেই আক্রমণ হবে ঠোঁটে।
তিথি অর্ণবকে জিজ্ঞেস করেছে, "আমার ঠোঁট তোমার এত পছন্দ কেন?"
অর্ণব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছে, "কে জানে"।
সত্যিই তো, কার শরীরের কোন অংশ কেন পছন্দ সেটা কী করে কেউ জানবে?
বিলাসের টিফিন করতে করতেও তিথির অর্ণবের কথা মনে পড়ে যায়।
বিলাস অফিসে বেরোলে তিথি কিছুক্ষণ বসে। তারপর ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।
হোটেলের রিসেপশন অবধি কেউ কাউকে চেনে না।
ঘরে ঢোকার পরেই অর্ণব ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ঠোঁটে। দুজনে দুজনের শরীরটাকে ছাড়া তখন আর কিছু চেনে না। প্রবল উত্তেজনায় একে অপরের শরীর ছিঁড়ে খায় যেন। অর্ণবের শরীরের গন্ধ তিথিকে মাতাল করে দেয়। অর্ণব আদর করে তার সারা শরীরে।
উত্তেজনা প্রশমন হলে দুজনে খাওয়া দাওয়া করে কেজো মুখ করে। খেয়ে দেয়ে আদর শুরু হয় আরেক প্রস্থ। তিথির স্তন, নাভি, পিঠ, হাঁটু, গলা সর্বত্র ছুঁয়ে যায় অর্ণবের ঠোঁট। অস্থির হয়ে পড়ে তিথি। অবশেষে অর্ণব প্রবেশ করে তিথির শরীরে। আদরে আদরে তছনছ করে দেয় তাকে।
বিকেল তিনটে নাগাদ চেক আউট করে তারা। তার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ি পরে নেয় তিথি। অর্ণব পিছন থেকে এসে পেট জড়িয়ে ধরে তার। ঘাড়ে চুমু খেতে শুরু করে। তিথি ভেসে যেতে যেতে বাধা দেয়, "আজ না, আবার পরের দিন"।
অর্ণব তখন তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে তিথির ঠোঁটে বিদায় চুম্বন আঁকে। দীর্ঘ সময় ধরে তিথির ঠোঁট দখল করে থাকে অর্ণবের ঠোঁট।
হোটেল থেকে বেরিয়ে তিথি ফ্ল্যাটে ফিরে আসে। এসে একটু ঘুমিয়ে নেয়। বিলাস ফেরে রাত আটটা নাগাদ। ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে। তিথি চা করে দেয়। তিথির কথা শোনার সময়ও থাকে না বিলাসের। চা খেয়েই চেঞ্জ করে অফিসের কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে বিলাস।
বিয়ের তিন বছর এরকমই চলছিল। জৈবিক মিলনটাও হত যান্ত্রিকভাবে। বিলাসের কোন দিন ইচ্ছা হলে তাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে হাঁফিয়ে গিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়বে।
এখনও সেভাবেই হয়।
অর্ণব আসার আগে অবধি তিথি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল।
অ্যাপটা সব গোলমাল করে দিল।
গুগল প্লে স্টোরে একটা অ্যাপ নামাতে গিয়ে এই ডেটিং অ্যাপটা নেমে গেল।
সেখানে কী মনে হতে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ছিল সে।
অর্ণবের সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা একটা কাফেতে হয়েছিল।
দুজনে বসতেই অর্ণব প্রথম জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি ম্যারেড?"
তিথি বলেছিল, "হ্যাঁ"।
অর্ণব বলেছিল, "বর বকবে না?"

তিথি হেসেছিল মুখ টিপে, “সময় পেলে তো”।
কফিটা শেষ হবার আগেই অর্ণব বলেছিল, “আই কার্ড এনেছেন? হোটেল যাবেন আমার সঙ্গে?”
তিথি কেঁপে উঠেছিল প্রথমে। তারপর তার অদ্ভুত একটা ইচ্ছা হল। নিজেকেই সে বলল, “ইচ্ছা হওয়া খারাপ? আমার একে ভাল লাগছে”।
একটু সামলে সে বলেছিল, “আপনি কী চান?”
অর্ণব বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে বলেছিল, “প্রেমহীন শরীরী অভ্যাস। আপনার অসুবিধা আছে?
তিথি অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “না। প্রোটেকশন আছে?”
অর্ণব হেসে বলেছিল, “আমার দায়িত্ব”।
তারপর থেকে চলে আসছে ছ মাস হয়ে গেল। সপ্তাহে দু দিন।
তিথি মাঝে মাঝেই নিজেকে জিজ্ঞেস করে, সে কি আদৌ অর্ণবকে ভালবাসে? নিজেই বোঝে, নাহ... এটা ভালবাসা না। নিতান্ত জৈবিক টান। অর্ণব বিছানায় ভাল। ভাল আদর করতে পারে। তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।
তিথির বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ হয় না। সে ভাবলেশহীন হয়ে বিলাসকে খেতে দেয়। বিলাসের খাওয়া হয়ে গেলে বাসন কোসন মেজে কেজো বিলাশের পাশে শুয়ে পড়ে। বিলাসের যেদিন ইচ্ছা হয় তার হাত ধরে টেনে নেয়।
তিথি পার্থক্যটা বুঝতে পারে।
বিলাস আর অর্ণবের।
আকাশ আর পাতাল।
বিলাস যেটা করে, সেটাকে আদর করা বলে না। সেটাকে হয়ত আন লোড করা বলে। একগাদা পৌরুষ জমা হয়ে ছিল, তিথির যোনীতে ঢেলে দিয়ে ঘামতে ঘামতে পাশ ফেরে। তিথি মুছে নেয়।
পিল খায় সে। বিলাসকে বলার প্রয়োজন বোধ করে নি। বিলাসের বাড়ির লোক যদিও অনেকবার বলেছে। তিথির ইচ্ছে নেই এখনই কিছু নেওয়ার।
বাচ্চা হলে অর্ণবের সঙ্গে কী করে এভাবে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা চলবে!
যেদিন অর্ণবের সঙ্গে দেখা হবার থাকে না সেদিন তিথি শুয়ে থাকে একা একা। অর্ণবকে ফোন করতে ইচ্ছা করলেও করে না।
শরীর আগুন চায় কখনও কখনও।
এভাবেই চলছিল, দিন কেটে যাচ্ছিল অর্ণব আর তিথির বোঝাপড়ায়।
এক বুধবার তাদের দেখা করার কথা।
তিথি অর্ণবের বলে দেওয়া হোটেলে পৌঁছে দেখল অর্ণব সেখানে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে। দুজনে আই কার্ড দিল। অর্ণব হোটেলের কাগজে সই করে তাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।
ঠিক এই সময়গুলোই তিথির অসহ্য উত্তেজনা শুরু হয়। মনে হতে থাকে আর কয়েক সেকেন্ড পরেই দুজনে লিপ্ত হবে তুমুল শারীরিক ভালবাসায়। যথাসম্ভব মুখ চোখ স্বাভাবিক রেখে সে হাঁটতে শুরু করে।
রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে এবারে প্রতিবারের মত তার শরীরে ঝাঁপাল না অর্ণব।
কেমন একটা ক্লান্ত মুখে খাটে বসে পড়ল।
তিথি কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে রেখে অর্ণবের পাশে বসে পড়ে বলল, “কী হয়েছে?”
অর্ণব তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “আজকেই আমাদের শেষ দেখা। কাল আমি শহর ছাড়ছি। আমার ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে”।

অর্ণবের মুখে অদ্ভুত বিষাদ। তিথি বলল, "আগে বল নি তো"।
অর্ণব বলল, "জাস্ট সকালে জানতে পারলাম"।
তিথি বলল, "কোথায়?"
অর্ণব বলল, "পন্ডিচেরী"।
তিথি বলল, "ওহ"।
শব্দটা উচ্চারণ করেই তিথির হঠাৎ ভীষণ কষ্ট হতে শুরু করল। অর্ণব চলে যাবে?
সে অর্ণবকে জড়িয়ে ধরল।
অর্ণব ক্লান্ত শরীরে অনেকক্ষণ ধরে তিথির ঠোঁটে চুমু খেল।
আদর খেতে খেতে তিথি কেঁদে ফেলল। কেন কাঁদল নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে লাগল বার বার। সে তো অর্ণবকে ভালবাসে না? তাহলে চোখে জল আসছে কেন?
তিনটের সময় বেরনোর কথা ছিল তিথির। রোজ সেই তাড়াহুড়ো করে বেরোয়।
এদিন অর্ণবকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকল। সাতটা নাগাদ বেরোল দুজনে। এদিন আর শাড়ি পরার সময় অর্ণব আর আদর করল না। রোজের মত দুজন অপরিচিতের মত হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। হোটেল থেকে বেরিয়ে তিথি তাড়া দেখাল না। চুপচাপ বেরিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরল।
বিলাস দরজা খুলে বিরক্ত গলায় বলল, "কোথায় গেছিলে? ফোনও ধরছিলে না"!
তিথি সোফায় বসে পড়ে বলল, "ঘুরতে। চা কর তো একটু। খাই"।
বিলাস তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "কী হয়েছে তোমার?"
তিথি বিলাসের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "কিছু না। আচ্ছা, তুমি তো জানতে আমি গান গাইতাম, বিয়ের পরে কোন দিন ইচ্ছা হয় নি আমার গান শুনবার? আমার গান শুনে সবাই কত মাথা নাড়লে যেদিন আমাকে দেখতে এসেছিলে! কই তারপরে তো আর কোন দিন শুনতে চাও নি?"
বিলাস বলল, "কী হয়েছে তোমার? জ্বর এসেছে? জ্বর হলে ওষুধ খাও, আমি প্যারাসিটামল দিচ্ছি। এসব কোর না এখন। ভিডিও কনফারেন্সিঙে অফিসের ইম্পরট্যান্ট মিটিং আছে আজ অনেকক্ষণ ধরে"।
তিথি হাসল বিলাসের দিকে তাকিয়ে। বলল, "তুমি বস, আমি চা নিয়ে আসি"।
বিলাস বিরক্ত হয়ে বলল, "কী যে হয় তোমার মাঝে মাঝে"।
তিথি উঠে বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল।
নিজেকে দেখে হাসল। হাসতে হাসতে দু চোখ বেয়ে জল বয়ে গেল অবিরাম।
আয়নায় নিজের ঠোঁটে নিজেই চুমু খেল।
অনেকক্ষণ ধরে...
বিলাসের কথাটার বিলাস উত্তর কোন কালে পাবে না।
"কী যে হয় তিথির মাঝে মাঝে"...

মাঠের পাশের বাড়ি

"ভূত বলে কিছু হয় আমি বিশ্বাস করতাম না কোন কালে।

আমি যুক্তিবাদী মানুষের দলে ছিলাম বরাবরই। শক্ত নার্ভ। ওসব পিশাচ, ভূত টুতের গল্প আমাকে বলে লাভ হত না। তবু সে ঘটনার পরে আমায় সব কিছু নতুন করে ভাবতে শুরু করতে হল। সে ঘটনার ব্যাখ্যা আমি আজও পাই নি"।

কথাটা বলে থমকালেন মিঠুদা।

লকডাউনের সময়। কেউ কোথাও যাচ্ছি না। মিঠুদা আমাদের ভাড়াটে। নিচের তলায় থাকেন। চাকরি করেন ইলেক্ট্রিসিটি অফিসে। করোনার লক ডাউন শুরু হবার আগে থেকে নিজেই ছুটি নিয়ে বসে আছেন। বলেছেন একটা মাত্র জীবন, নষ্ট করার কোন ইচ্ছে নেই।

আমার ভাল হয়েছে। বাবা, মা আর বোনের সঙ্গে ঝগড়া করার থেকে নিচে মিঠুদার কাছে গিয়ে গল্প করা অনেক বেশি ভাল।

সন্ধ্যে হতে চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। নিস্তব্ধ চারপাশ। আমাদের এলাকায় লোক এমনিতেই কম। এই সময়টা যেন আরও নিস্তব্ধ হয়ে যায় বেশি করে।

ভূত নিয়েই কথা হচ্ছিল। মিঠুদা পড়াশুনা করতে ভালবাসেন। কয়েকদিন হল শরদিন্দু শুরু করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ঐতিহাসিক কিছু পড়ছেন নাকি, নাকি ব্যোমকেশ পড়ছেন। উত্তরে মিঠুদা বললেন ওসব কিছু না, আজকাল তাকে বরদায় পেয়েছে। মিঠুদার কথায় "শরদিন্দু এত প্রাঞ্জল ভাষায় প্রেতের গল্প বলেন, যেন চুম্বক। বড় টানেন আমায়। আমি লেখাগুলো নতুন করে পড়ছি, তা নয়। আগেও পড়েছি। কিন্তু এবার যেন আরও বেশি ভাল লাগছে। একা থেকে থেকে যদি নিজের চারপাশে কোন শক্তির অস্তিত্ব বোধ করি, তা ভালই লাগে, কী বলিস?"

আমি কিছু বলি নি। আমার ভূতে ভালই ভয় লাগে। মাঝরাতে হিসি করতে গেলে এক দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ফিরে আসি।

আমি বললাম "আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন?"

এর উত্তরে মিঠুদা উপরের কথাগুলো বললেন।

আমি কৌতূহলী হলাম, "সেটা কোথায়? কবের ঘটনা?"

মিঠুদা গুছিয়ে বসলেন "পঁচানব্বই কী ছিয়ানব্বই হবে। গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতীকরণ চলছে। আমাকে সুপারভাইসারি করতে একেকটা প্রত্যন্ত গ্রামে যেতে হচ্ছে। তুমুল গরমে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার দিকে যে কী অবস্থা হয়, সে না গেলে ভাবতে পারবি না।

তো সেবারে আমার ডিউটি পড়ল বাঁকুড়ার সোনামুখী পেরিয়ে আরও ভিতরের দিকে এক গ্রামে। আমার সঙ্গে ঠিকাদার সংস্থার কিছু কর্মী ছিল। ওরা আগেই চলে গেছিল।

আমি বর্ধমানে ছিলাম। বাসে করে প্রথমে দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ড গিয়ে সেখান থেকে আবার একটা বাসে করে সোনামুখী নামলাম। ঠিকাদার একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সে গাড়িতে করে যখন আমার জন্য বরাদ্দ করা বাড়িটায় পৌছলাম তখন সন্ধ্যে সাতটা আটটা বাজে। জন মনিষ্যি নেই চারদিকে। একটা মাটির বাড়ি, টালির চাল তাতে। ঘরদোর ওরাই পরিষ্কার করে রেখেছিল। ঘরে একটা তক্তপোষ আর কলসী রাখা।

ঠিকাদারের লোক জানিয়ে গেল রাতের খাবার দিয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরে, আমি যেন ঘুমিয়ে না পড়ি। সত্যি কথা বলতে কী ভাই, আমার তখন হাতে হ্যারিকেন অবস্থাই বটে। ব্যাগের মধ্যে কিছু টাকা ছিল, ভয় পাচ্ছি লুঠ না হয়ে যায়। এভাবে রাত করে আসার জন্য নিজের ওপর রাগও হচ্ছিল। সকালের দিকে এলে অন্তত জায়গাটা চেনা হয়ে গেলে অত ভয় পেতে হত না।

তক্তপোষে সুন্দর বিছানা করে রাখা। একটা বালিশ দেওয়া। সে বালিশ সর্ষের। তুলোর না। বাচ্চাদের দেয় না? সেরকম সর্ষের বালিশ।

আমার খিদে পেয়েছিল, ঠিকাদারের লোকগুলো কোথায় উঠেছে কে জানে। আমার আশে পাশে কোন জায়গা থেকেই সাড়াশব্দ আসছিল না। ব্যাগ থেকে টর্চ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই। ভীষণ রাগ হল। ঠিকাদার ব্যাটা তো ভারি শয়তান! আমার জন্য কোথায় ব্যবস্থা করেছে কে জানে! তখন তো আর মোবাইল ছিল না যে ফোন করে বকাঝকা করা যাবে!

ঠিক করলাম ঠিকাদারের লোক যখন খাবার দিতে আসবে, তখন ভাল করে ঝাড়ব। চারদিকে লোক নেই, জন নেই, কোথায় একটা বাড়িতে ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এসব ভেবে সে বাড়ির বাইরের বসার জায়গায় বসে মনের ভিতরে ভিতরে রাগে গজগজ করছি, এমন সময় কোত্থেকে ভারি সুন্দর একটা ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। সে বাতাস এত প্রাণজুড়ানো, যে তোকে কী বলব!”

আমি ফস করে বলে বসলাম “এসির হাওয়ার মত?”

মিঠুদা ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলল “ধুস, না! এসি না। এসির হাওয়া সে হাওয়ার কাছে কিছুই না। আমার পথশ্রম ছিল। জার্নির ক্লান্তি ছিল। সে হাওয়া যেন সব নিয়ে চলে গেল। আমার ভারি ভাল লাগল। আমি চোখ বন্ধ করলাম। খুব ভাল হাওয়া বইতে লাগল। বুঝলাম ঠিকাদার ব্যাটা এইজন্য আমাকে এই বাড়িতে রেখেছে। মাঠের ধারে ভাল হাওয়া দেয় বলেই আমার জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা। গ্রামের মধ্যে মাঠের ধারে যাদের বাড়ি, তাদের গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কোন চিন্তা করতে হয় না বুঝলি। সে যে কী প্রাণজুড়ানো ব্যাপার, আমি তোকে কী আর বলব। আমার রাগ কমে গেল। মনে ভারি ফুর্তি হল। খিদেটাও জাঁকিয়ে আসব আসব করছে, এমন সময়ে ঠিকাদারের লোকে এই বড় জামবাটিভর্তি খাসীর মাংস, আর পাঁচটা রুটি দিয়ে গেল।

যাদের ভেবেছিলাম ঝেড়ে ফাটিয়ে দেব, তাদের দিকে খুশি খুশি মুখে তাকিয়ে বললাম’ভাল তো সব?’

তারা জানিয়ে গেল পরদিন ভোর থেকেই কাজ শুরু হবে, আমাকে নিয়ে যাবে। আমি যেন ছ’টায় উঠে যাই। আমি তো মনে মনে বলছি খাসীর যা গন্ধ বেরিয়েছে, তোরা এখন যা, আমি আগে মাংস সাঁটিয়ে টেনে ঘুম লাগাই, পরে দেখা যাবে।

চলেও গেল। আমি ঘরের ভিতর হ্যারিকেনটি জ্বালিয়ে মেঝেতে পাত পেড়ে খাসীর লাল ঝোল দিয়ে একটা একটা করে পাঁচটা রুটি মেরে শালপাতাখানা বাইরে ফেলে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বাইরে হাওয়া খেতে বসলাম।

আহা, ভরা পেটে সে অক্সিজেনভর্তি হাওয়া যে কী ভাল লাগছিল সে বর্ণনাতীত। সে দিন অমাবস্যা ছিল, আকাশে চাঁদ নেই, তবু হাওয়া সব কিছু ভুলিয়ে দিচ্ছিল। প্রাণভরে সে হাওয়া খেয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা আটকে, জানলা খুলে হ্যারিকেনের কুপি নিভু নিভু করে দিয়ে আমি জামা খুলে খাটে শুতে গেলাম।

আর তারপরেই আমি হাউমাউ করে লাফ দিয়ে উঠলাম”।

মিঠুদা এমন করে কথাটা বলল আমি মিঠুদার হাত ধরে ফেললাম “ওরে বাবা, কেন? কী হল?”

মিঠুদা বললেন “আমার মনে হল খাটে কেউ শুয়েই ছিল আমি যেন তার উপর গিয়ে শুলাম। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ শুয়ে থাকলে তার জায়গায় তুই শুলে যেমন লাগে, ঠিক তেমন অনুভূতি। আমি লাফ ঝাঁপ

দিয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলাম। আমার বুক ধড়ফড় করছে, প্রাণটা মনে হচ্ছে মুখ দিয়েই যে কোন সময় বেরিয়ে যাবে। হাঁ হাঁ করে খানিকক্ষণ শ্বাস নিয়ে টর্চ নিয়ে খাটের ওপর মারলাম, না!

খাটে পরিষ্কার বিছানা। কেউ শুয়ে নেই!

আমি টর্চ জ্বালিয়ে হাত দিয়ে খাটের ওপর হাত বাড়ালাম। আমার মনে হল বরফের মত তীব্র শীতল কিছুতে আমি হাত দিলাম। আবার একটা লাফ দিয়ে টর্চ ফেলে "ওরে বাবারে মারে" বলে আমি সে বাড়ি ছেড়ে মেঠো রাস্তা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দৌড়তে শুরু করলাম।

এবং..."

মিঠুদা থামলেন। আমি ঢোক গিলে বললাম "এবং কী?"

মিঠুদা বললেন "আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম কারও পায়ের শব্দ। আমাকে তাড়া করছে। আমার অবস্থা বোঝ। আমি প্রাণপণে দৌড়তে দৌড়তে দেখলাম দূরে কোন একটা বাড়িতে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। আমি সেই আলো লক্ষ্য করে হাচারি পিচারি করে দৌড়তে দৌড়তে পৌঁছে বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে 'কেউ আছেন? কেউ আছেন?' বলে হাক ডাক শুরু করলাম।

এক সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন "আপনি? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না?"

আমি ভদ্রলোককে ওই বাড়ির ব্যাপারে সব বললাম। ভদ্রলোক আমাকে জল টল খেতে দিয়ে বললেন "আপনার ভ্রম হতে পারে। আমাদের গ্রামে তো এসবের কথা কোন কালে শুনিনি সেভাবে! আপনি নেশা টেশা করেন না তো?"

আমি বললাম "দেখুন, আমি রীতিমত কসরত জানা লোক। নিয়মিত শরীরচর্চা করি। এসব ভূত প্রেত কোন কালে মানিও নি। আমি মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন? বাড়িটা মাঠের মধ্যে। মাঠটা শুরু হয়েছে যেখান থেকে, সেখানে। আর সে হাতের স্পর্শ আপনাকে কী বলব মশাই! যেন বরফশীতল"।

ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন "আশ্চর্য। আপনাকে ভুইপাগলীর বাড়িতে রেখেছে। এদের কি কোন কান্ডজ্ঞান নেই?"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম "মানে? ভুইপাগলী কে?"

ভদ্রলোক বললেন "সে কয়েক বছর আগের ব্যাপার। এ গ্রামে ঐ বাড়িতে এক বাপ মেয়ে থাকত। ভুঁই পাগলী বললাম বটে, মেয়েটা কিন্তু পাগলী ছিল না। বাবার সঙ্গে থাকত। বাইরের কিছু দুষ্কৃতি একদিন সে পাগলীকে ধর্ষণ করে। তার বাবা আটকাতে গেছিল, সে দুষ্কৃতিরা ভদ্রলোককে খুন করেন। গ্রামের কেউ সাহায্যও করল না। কেউ এগিয়েও গেল না। তার পর থেকে সে মেয়ে একা একাই থাকত সে বাড়িতে। গ্রামের লোকেরা এটা সেটা খেতে দিত। একদিন সে মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল। সে ঘর তো পরিত্যক্ত থাকার কথা। আপনাকে কেন দিয়েছিল জানি না"।

আমি বললাম "ওরে বাবা, আমি তাহলে এখন কোথায় যাই?"

ভদ্রলোক বললেন "এখানেই শুয়ে পড়ুন। সকালে আমি আপনার ঠিকাদারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে গ্রামের কোন বাড়িতে আপনার ব্যবস্থা করছি। আপনি শুয়ে পড়ুন"।

ভদ্রলোক আমাকে একটা ঘর ছেড়ে দিলেন। আমি ঘুমালাম বটে, কিন্তু আতঙ্কে আমার মত কঠিন নার্ভের লোকেরও মাঝে মাঝে কাঁপুনি আসছিল।

ঠিকাদারের লোকগুলো বলেছিল ভোরবেলা আসবে। আমারও তেমন ভাল ঘুম হচ্ছিল না। হালকা ভোর হতেই বাইরে বেরিয়ে দেখি ভদ্রলোক পায়চারি করছেন।

আমি হেসে বললাম "মর্নিং ওয়াক করতে বেরোবেন?"

ভদ্রলোক বললেন "হ্যাঁ। আমি বেরোই রোজই। আজ ভাবলাম আপনি একা আছেন। এখানেই থাকি। বেশি দূরে যাব না"।

আমি বললাম "বাঁচিয়েছেন। কাল রাতের কথা ভাবতে আমার এখনও পিলে চমকাচ্ছে। সে যা হাতের স্পর্শ ছিল। যা ঠান্ডা! বাপরে!"

ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন "দেখুন তো এরকম ঠান্ডা"?

বলে আমরা হাত ধরলেন। সে কী হিমশীতল হাত রে! আমি আর লাফ ঝাঁপ দেব কী! ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক বললেন 'সে পোড়ারমুখীর বাবা আমিই মশাই। কিছুই করতে পারলাম না, মেয়েটাকে নিতে এসে ওরা আমাকে মেরেই ফেলল জানেন," বলতে বলতে দেখি চোখটা কালো থেকে রক্ত জবার মত লাল হয়ে যাচ্ছে, মুখের রেখাগুলো বটগাছের শাখার মত শক্ত হতে শুরু করেছে, আমি কাঁপতে কাঁপতে কাটা কলাগাছের মত গড়িয়ে পড়লাম। অজ্ঞান হবার আগে যে হাসির শব্দ শুনেছিলাম, সে হাসি এখনও আমার মাথার মধ্যে দিয়ে বেরোয় নি। এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বসে থাকি। মনে হয় সে শব্দ আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিকাদারের লোকজন আমায় যখন উদ্ধার করে তখন আমার মুখ দিয়ে গ্যাজলা বেরোচ্ছিল, আর যে জ্বর এসেছিল, সে জ্বর সারতে দিন পনেরো লেগেছিল। সে দিনের পর থেকে আমি আর কোথাও একা রাত কাটাই না। কেউ কাটাতে বললে দু হাত জোর করে প্রণাম করে বলি দাদা মাফ করে দেবেন"।

মিঠুদা থামল।

আমার বুক ধড়ফড় করছিল। বললাম "উপরে যাই। একটু সিড়ির কাছটা দাঁড়াবে?"

মিঠুদা বলল "ভয় পাস না। এই দেখ না। আমার হাতটা ধর। বাস্তবে ফিরে আয়"।

আমি মিঠুদার হাত ধরেই ছিটকে গিয়ে মিঠুদার ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড় লাগালাম।

বরফশীতল হাত। এত ঠান্ডা হাত মিঠুদার হল কী করে?

ভিত

১।

কমলকাকু এসেছে।

অন্তরা পড়ছিল। কমলকাকু তার ঘরে এসে বলল, "কেমন আছিস মা?"

অন্তরা হাসল, "ভাল কাকু"।

কমলকাকু বলল, "পড় তুই"।

অন্তরার সামনে পরীক্ষা। দম ফেলার সময় নেই। কমলকাকু ঘর থেকে যেতে পড়তে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর জল খেতে গিয়ে দেখল জল শেষ হয়ে গেছে।

উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে অ্যাকোয়াগার্ড থেকে জল নিতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল মা রান্না করছে আর কমলকাকু মার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্তরার বমি পেল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি বোতলটা না ভরেই ঘরে চলে এল।

২।

কমলকাকু যেতে মা তার ঘরে এসে বলল, "রাতে রুটি খাবি তো? তোর বাবার ফিরতে রাত হবে আজ। "

অন্তরা উত্তর দিল না।

মা বলল, "কী হল? কী হয়েছে তোর?"

অন্তরা মার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "রুটি খাব"।

মা বলল, "ঠিক আছে। যাই। উফ কত কাজ পড়ে আছে এখনও"।

৩।

বাবা অফিস থেকে ফিরেছে। অন্তরা ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিল।

বাবা বলল, "কী রে, কী হয়েছে?"

অন্তরা বলল, "মাথা ধরেছে"।

বাবা এসে আলো জ্বালিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। বাবার হাতে অন্তরার চোখের জল। বাবা বলল, "কী রে কাঁদছিস কেন?"

অন্তরা বলল, "এমনি"।

বাবা বলল, "কী হয়েছে, বলবি তো?"

অন্তরা বলল, "কিছু না। এমনিই। চল খেয়ে নি"।

অন্তরা উঠল। বাবা কিছু বলল না।

৪।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা কমলকাকু এসেছে। অন্তরা পড়ছিল।

অন্তরা ফোন নিয়ে পা টিপে টিপে রান্না ঘরে গিয়ে রেকর্ড করল সব। লজ্জা লাগছিল, কান্না পাচ্ছিল, তব করল সব। কমলকাকুকে বাবা ছোটভাই বলে।

সে লোক মাকে পিছন থেকে জাপ্টে ধরে আছে। অন্তরার মনে পড়ে গেল গতবছর গ্যাংটকে গিয়ে সে, বাবা আর কমলকাকার বউ পিউকাকী এম জি রোডে গেছিল। দু ঘন্টা ঘুরেছিল প্রায়। মা বলেছিল মাথা ঘুরাচ্ছে,

আর কমলকাকু তার ঘরে থেকে বলেছিল খুব ঘুম পাচ্ছে, যাবে না। এখন বুঝল সবটা। রেকর্ড করে নিজের ঘরে চলে গেল অন্তরা।
৫।
রাতে একসাথে খেতে বসে তারা।
অন্তরা বাবা মার ফোনে ভিডিওটা পাঠিয়ে দিল।
বাবা খেতে খেতে বিরক্ত গলায় বলল, "কী এল আবার?"
অন্তরা বলল, "দেখো, মজার একটা ভিডিও পাঠিয়েছি"।
মা বাবা দুজনেই ফোন বের করল। ভিডিওটা দেখতে দেখতে দুজনের এক্সপ্রেশন দেখল অন্তরা। বাবা খাবার ফেলে উঠে চলে গেল।
মা তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, "আমাকে আগে বলতে পারতিস"।
অন্তরা উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।
৬।
সকালবেলা।
কমলকাকু এসেছে।
মা ঘর বন্ধ করে আছে। অন্তরা বা তার বাবা কেউ ডাকতে যায় নি।
কমলকাকু বাবার সঙ্গে স্বাভাবিক কথা বার্তা বলতে বলতে বলল, "বউদি কোথায়?"
বাবা বলল, "ঘরে আছে। ডাক তো চা করুক"।
তাদের বাড়িতে কমলকাকুর গতিবিধি অবাধ। বাবা মায়ের বেডরুমে চলে গেল।
কিছুক্ষণ পরে মা চা নিয়ে এল।
অন্তরা বাবাকে দেখল, বাবা কত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে।
মা কমলকাকুর দিকে তাকাল না। চা দিয়ে চলে গেল।
কমলকাকু বলল, "বৌদির কী হল?"
বাবা বলল, "মাইগ্রেন। জানিস তো"।
কমলকাকু আর কিছু বলল না।
সেদিন থেকে অন্তরার বাবা আর মা আলাদা ঘরে শুতে শুরু করল।
সেদিন থেকে বাবা মার সঙ্গে একটা কথাও বলে না আর।
৭।
পাঁচ বছর পর।
অন্তরার বিয়ের পরের দিন। খানিকক্ষণ পরে অন্তরাকে নিয়ে চলে যাবে বর। বাবা নিজের ঘরে চুপ করে বসে ছিল।
অন্তরা বাবার ঘরে গিয়ে বাবার কাছে বসল। বলল, "এখনও কথা বলবে না মায়ের সঙ্গে?"
বাবা অন্তরার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, "হয় আমি মরে গেছি, নয় তোর মা। মৃত লোকের সঙ্গে কি কেউ কোন দিন কথা বলে?"
অন্তরা বাবার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না।
শুধু দেখল নীরবে বাবার দু চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে।
সে জানে কিছুক্ষণ পরে জল আবার শুকিয়ে যাবে। কমলকাকুরা এলে বাবা আবার তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করবে।

বাইরের লোক কিচ্ছু বুঝতে পারবে না, ভিতরবাড়ির ভিত সেই কবেই নড়ে গেছিল...

আত্মীয়

১
গরমকাল।
র‍্যাগিং চলছে কলেজে।
ফার্স্ট ইয়ারের সুপ্রতীক চুপ করে কোণায় বসে ছিল।
থার্ড ইয়ারের মালিনী তাকে বলল, "শোন, বাইরে আয়"।
সুপ্রতীক ক্লাসরুমের বাইরে গেল।
মালিনী সুপ্রতীককে বলল, "কোথায় বাড়ি?"
সুপ্রতীক বলল, "আসানসোল"।
মালিনী বলল, "ফোন নাম্বার দে"।
সুপ্রতীক বলল।
মালিনী তার ফোন বের করে সুপ্রতীকের নাম্বারটা সেভ করে সেটায় একটা ঠিকানা পাঠিয়ে বলল, "আজ সন্ধ্যেয় আসবি। একা। কাউকে বলবি না। ওকে"?
সুপ্রতীক ঘাড় নাড়ল।
২
ফ্ল্যাটের সামনে এসে সুপ্রতীক বেল বাজাল।
মালিনী দরজা খুলে বলল, "আয়"।
সুপ্রতীক ঢুকল। একটা ছোট ফ্ল্যাট।
ছোট বসার ঘর।
মালিনী দরজা বন্ধ করে এসে তার পাশে বসল।
সুপ্রতীককে বলল, "গার্ল ফ্রেন্ড আছে?"
সুপ্রতীক মাথা নাড়ল, "না"।
মালিনী বলল, "তুই ভার্জিন?"
সুপ্রতীক বলল, "হ্যাঁ"।
মালিনী বলল, "চুমু খা"।
ঠোঁট এগিয়ে দিল মালিনী।
সুপ্রতীক উশখুশ করল।
মালিনী সুপ্রতীকের কোলে বসে ওর ঠোঁটে চুমু খেতে খেতে জামা খুলে দিল। সুপ্রতীকের পুরুষাঙ্গ জেগে উঠল।
মালিনী সেটা হাতে নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, "চ"।
সুপ্রতীক নেশাতুরের মত মালিনীর পিছন পিছন চলে গেল।
৩
ক্লাসে চুপ করে বসে ছিল সুপ্রতীক। মালিনী আজ আবার তাকে ডেকেছে। তাকে কোন সিনিয়র র‍্যাগিং করছে না।

মালিনী ক্লাস শেষে তাকে আবার নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে বলেছে। আগের দিন হোস্টেলে ফিরতে রাত হয়ে গেল।

মালিনী ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দিয়েছিল। ক্লান্ত হয়ে যখন ফিরল হোস্টেলে সিনিয়ররা তাদের ক্লাসের ছেলেদের র‍্যাগ করছিল। অদ্ভুতভাবে তাকে কেউ কিছু বলল না। খাটে শুয়ে পড়েছিল ফিরে।

বাবা ফোন করল সকালে। "কী রে, র‍্যাগিং হচ্ছে নাকি?"

সুপ্রতীক বলল, "না ঠিক আছে"।

বাবা বলল, "সব সামলে পড়াশুনাটা যেন হয়"।

সুপ্রতীক আর কিছু বলে নি।

৪

বিকেল হতে সুপ্রতীক মালিনীর ফ্ল্যাটে গেল না। হোস্টেলে ঢুকে গেল। মালিনী ফোন করতে শুরু করল, ধরল না সে। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়ল। সুপ্রতীক দরজা খুলে দেখল এক সিনিয়র। তাকে বলল, "কীরে, তোকে মালিনী যেতে বলেছিল না?"

সুপ্রতীক বলল, "কেমন জ্বর এসেছে দাদা। আজ যাব না"।

সিনিয়র তাকে আপাদমস্তক দেখে বলল, "তুই জানিস ও কে? বেরো"।

সুপ্রতীক মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল। ফোন অফ করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরল।

রাতের ট্রেনে আসানসোল ফিরে গেল।

বাড়িতে যখন বেল বাজাল, তখন রাত বারোটা।

বাবা মা তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

বাবা বলল, "কী হল?"

সুপ্রতীক বলল, "কিছু না"। পরক্ষণেই মিথ্যে করে বলল, "কাল ছুটি, তাই চলে এলাম"।

ফোন অন করল নিজের ঘরে এসে। মালিনীর একের পর এক মেসেজ।

সিনিয়র ছেলেদেরও।

সুপ্রতীক সব দেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

৫

পরের দিন ঘুম ভাঙল মালিনীর ফোনে। সে ধরল, "হ্যালো"।

"কী হল? কাল এলি না কেন?"

থমথমে গলা মালিনীর।

সুপ্রতীক বলল, "বাড়ি এসছি"।

মালিনী হাসতে হাসতে বলল, "ফ্রিতে চুত পাচ্ছিলি, ভাল লাগল না মাদারচোদ? কবে আসবি?"

সুপ্রতীক কয়েক সেকেন্ড থমকে বলল "আমি যাব না"।

মালিনী বলল, "শুয়োরের বাচ্চা, আমার সঙ্গে শোয়ার জন্য সবাই পাগল হয়ে যায়, আর তুই সুযোগ পেয়েও... কেন বে? কী হয়েছে?"

সুপ্রতীক বলল, "আমি যাব না। এটা ঠিক হচ্ছে না"।

মালিনী বলল, "এই জানোয়ার, তুই জানিস আমি কে?"

সুপ্রতীক বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কোন ক্ষতি করি নি তোমার"।

মালিনী বলল, "আজব চিড়িয়া তো। ঠিক আছে। কলেজ আয়। তোকে কিছু করব না আর"।

ফোন কেটে দিল মালিনী।

৬

পরের দিন কলেজ গেল সুপ্রতীক।

সত্যিই তাকে কোন সিনিয়র আর কিছু বলল না।

কলেজ থেকে বেরনোর সময় দেখল মালিনী দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বলল "শোন।

সুপ্রতীক গেল।

মালিনীর চোখে সব সময় যে উগ্রতাটা থাকে, অদ্ভুত ভাবে সেটা অদৃশ্য ছিল।

তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আই অ্যাম সরি। তুই ভাল ছেলে। আই অ্যাম রিয়েলি সরি, অ্যান্ড আই মিন ইট"।

সুপ্রতীক হাসল।

মালিনী বলল, "যা"।

সুপ্রতীক কলেজ থেকে বেরোল।

মালিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

৭

পরের দিন। টিফিন টাইমে ক্যান্টিনে গেছে সুপ্রতীক। মালিনী তার পাশে বসে বলল, "চিকেন চাউ খাবি? আমি খাওয়াব। ভয় নেই, কোথাও যেতে বলব না"।

সুপ্রতীক হাসল, "ঠিক আছে"।

মালিনী চাউ নিয়ে এল।

সুপ্রতীককে প্লেটটা দিয়ে বলল, "একটা রাতে তুই আমাকে চেঞ্জ করেছিস। ভাবতাম সবাই আমার চাকর। আর ছেলেরা কুকুরের বাচ্চা। তুই তা না। তুই পারলি কী করে?"

সুপ্রতীক বলল, "আমাকে আদর করতে করতে সেদিন রুদ্র নামে ডাকছিলে। আমি বুঝলাম এই নামে তোমার কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল। খারাপ লাগল তোমার জন্য। তাই পরের দিন যাই নি। এরকম কোন ব্যাপার না যে সেক্সটা আমি এনজয় করি নি। লাইফের ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স। এনজয় না করার তো কিছু নেই"।

মালিনী তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই খুব ভাল ছেলে সুপ্রতীক। এরকমই থাকিস। বাই"।

মালিনী একা একা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

তাদের ক্লাসের বাকি ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরে বলল, "কী রে ভাই, সিনিয়র তোকে চাউ খাওয়াচ্ছে কী ব্যাপার?"

সুপ্রতীক ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "কিছু না। দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়'…

ভলিউম

মফঃস্বলের চৌরাস্তা থেকে খানিকটা গিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ি আছে। সেখানেই একটা বাড়িতে ভাড়া নিল অমিত।

মাইনে কম বলে বেশি ভাড়ার বাড়ি জোগাড় হয় নি। একটা ছোট বাড়ি পেয়েছিল।

টিভির ভলিউম জোরে দিয়ে খবর শুনছিল এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

অমিত দরজা খুলে দেখল এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন।

তাকে বললেন, "ভলিউমটা কমানো যায়? আমার খাতা দেখা আছে"।

অমিত জিভ কাটল, "খুব দুঃখিত। এখনই কমাচ্ছি"।

পরে জানতে পারল অমিত, ভদ্রমহিলা এলাকার স্কুলে পড়ান।

খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তারপরে আর বিয়ে করেন নি।

তার থেকে দশ বারো বছরের বড় হবেন।

অফিস থেকে ফিরে অমিত নিজের ভাত নিজেই বসায়। জানলা দিয়ে দেখতে পেল ভদ্রমহিলা ফিরছেন বাজার করে।

রাতে রান্না করে খেতে খেতে কী মনে হল, আবার টিভির ভলিউমটা বাড়িয়ে দিল।

ভদ্রমহিলা আবার এলেন।

অমিত এবারও জিভ কাটল। তবে বলল, "চা খাবেন?"

ভদ্রমহিলা রাজি হলেন। ঘরের ভিতরে এসে বসলেন।

অমিত চা করল।

ভদ্রমহিলা বললেন, "আপনি বেশ ভাল চা করেন"।

অমিত বলল, "রান্না করতে ভাল লাগে আমার। একদিন খাবেন?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "কী রাঁধবেন?"

অমিত বলল, "মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল। মাংস। খাবেন?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি আমিষ খাই না"।

অমিত বলল, "কেন? আপনি এসব মানেন?"

ভদ্রমহিলা তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে চায়ের কাপটা রেখে চলে গেলেন।

অমিত সে কাপটা নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল।

পরের দিন আবার ভলিউম বাড়াল সে।

ভদ্রমহিলা এলেন না।

অমিত হতাশ হয়ে টিভির ভলিউম কমিয়ে দিল।

তার পরের দিনও আবার ভলিউম বাড়াল রাত দশটা নাগাদ।

মিনিট দশেক অপেক্ষার পর যখন হতাশ হয়ে অমিত আবার ভলিউম কমাতে গেল, কলিং বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলল সে।

ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন।

অমিত হাসল, "আসুন প্লিজ। আগের দিন চা কমপ্লিট করে গেলেন না। আমি আর কোন প্রশ্ন করব না"।

ভদ্রমহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকতেই অমিতের উপর কী যেন ভর করল।
জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খেল। বাধা দিলেন না ভদ্রমহিলা। চাতক পাখির মত অংশগ্রহণ করলেন।
অমিত বিছানায় নিয়ে গেল তাকে। অনেকক্ষণ ধরে আদর করল।
তারপর যখন ক্লান্ত হল, ভদ্রমহিলাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমায় বিয়ে করবে?"
ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন না।
বললেন, "মুগ ডাল আর মাংস খাব। কবে খাওয়াবেন?"
#
এর পরে কয়েক দিন ভদ্রমহিলা এলেন না।
অমিত একদিন কথা বলতে গেল। ভদ্রমহিলা বললেন, "পাপ করেছি। ক্ষমা করে দেবেন"।
এবারে অমিত আর টিভির ভলিউম বাড়াল না।
একদিন অফিসে সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল। অফিস থেকে বেরিয়ে কিছু কেনা কাটা করল।
বাড়ি ফিরে তক্কে তক্কে থাকল কখন ভদ্রমহিলা ফেরেন।
ফিরতেই সে কলিং বেল বাজাল।
ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন।
অমিত বলল, "আমি সিঁদুর কিনে এনেছি। আমি তোমাকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করতে চাই। তুমি আমাকে বিয়ে করবে? হতে পারি আমি ছোট, তাতে কী হয়? ভালবাসা বয়স দেখে হয় না। আমি ভালবাসি। আর ইয়ে, মাংস, মুগডাল আর মাছের মাথা নিয়ে এসেছি। রান্নাঘরটা কোন দিকে?"
ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। অমিত চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ঠোঁটে চুমু খেল।
এবার আর সংকোচ এল না এক ফোঁটাও...

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

অন্তু বলল "ভাগ্যবানের বউ মরে আর দুর্ভাগ্যবানের বউ পালায়"।

কথাটা শেষ হতে না হতেই ক্লাবে অবিনদা ঢুকল।

আমরা গম্ভীর হয়ে গেলাম।

অবিনদার বউ চলে গেছে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে পালিয়েছে। অবিনদা একটু খ্যাপা টাইপের মানুষ। সবার ঝামেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাড়ার কারও কিছু হলে যেখান থেকে পারবে টাকা ধার দিয়ে দেবে। কেউ মারা গেলে সবার আগে যাবে। ভোকাল লোক। কর্মঠ লোক।

এমনিতেই পাড়ায় কেচ্ছা কাহিনী কম। এ ঘটনা যেন স্থির জলে ঢিল মারল। জানা জানি হবার পরে সর্বত্র আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের পাড়ার ক্লাবে অবিনদা আসে। পুজোতেও সস্ত্রীক যোগ দিত। একটা কথা মনে পড়ল, আমরা সত্যিই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব একটা ভাব কোন কালে দেখি নি। দুজনেই কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাবে ঘুরে বেড়াত। এমনকি অষ্টমীর অঞ্জলী পর্যন্ত দুজনে আলাদা আলাদা করে দিত।

তবে আর যাই হোক, এতে সন্দেহের কিছু ঘটে নি। কারও মাথাতেও আসে নি এর ফলে এত বড় কিছু ঘটে যেতে পারে। ঘটনার সূত্রপাত গত পরশু। পাড়ার এক বউদি দেখেছে অবিনদার বউ নাকি খুব গম্ভীর হয়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, আর অবিনদা অনেক কাকুতি মিনতি করছিল, বউদি শোনে নি। তারপর বাস আসতে বউদি বাসে করে উঠে চলে গেল, আর অবিনদা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

এই ঘটনা পাড়ার বিড়ির দোকানদার দিলীপও দেখেছে। ফলে বউদির অসমর্থিত সূত্র সমর্থন পেয়েছে। ঘটনার ক্রোনোলজি জানার পর পাড়ার সুমন দে, অর্ণব গোস্বামীরা সক্রিয় হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ঘন্টাখানেক আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই সূত্রেই তাস খেলার আগে অন্তু এই কথাটা ছুঁড়ে দিল আর এমন কপাল ঠিক সেই সময়েই অবিনদা ক্লাব ঘরে ঢুকল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে চোখ বন্ধ করে সিগারেট ধরিয়ে অবিনদা বলল, "যার বউ মরে সে ভাগ্যবান কেন হবে? বউকে মানুষ ভালবাসে না? কোন মানুষের মৃত্যুকে এরকম পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখার মানে নেই। অবশ্য আমাদের জীবনে সব কিছুই পুরুষতান্ত্রিক। নারী স্বাধীনতা জিনিসটা সোনার পাথরবাটি। অন্তু, তুই যে রোজ দেরী করে বাড়ি ফিরিস, একদিন তোর বউ দেরী করলে কী করতি?"

অন্তু মাথা নিচু করল।

অবিনদা বলল, "আমার বউয়ের একটা প্রেম ছিল। বিয়ের পরেই সেটা জানতে পারি। ও আমার কাছে কিছুই লুকোয় নি। সে ছেলে বাইরে চলে গেছিল। ফিরেছে। আমি তাদের বিয়ে দেব বলেছি। বউ রেগে মেগে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এভ্রিথিং শুড বি ট্রান্সপারেন্ট। আমাকে নিয়ে পিছনে কথা হোক আমি চাই না। এই ঘটেছে। তোদের জানিয়ে দিলাম। নে, এবার যা খুশি আলোচনা কর, আমি আর কিছু বলব না"।

আমি সাহস করে প্রশ্ন করলাম, "কেন বাপের বাড়ি চলে গেল কেন"?

অবিনদা বলল, "বিয়ের পর থেকে ওর সঙ্গে আমার কোন ফিজিকাল রিলেশন নেই। আমরা নিঃসন্তান। তবু ওর মনে হয়েছে একবার বিয়ে হলে আর অন্য পুরুষের দিকে আকাতে নেই। আমি বোঝাতে যাব। দেখি, কী করা যায়"।

আমরা আর কিছু বললাম না। অবিনদা সিনিয়র লোক। ওর ব্যক্তিগত জীবন ওর উপস্থিতিতে কাঁটাছেঁড়া করার সাহস আমাদের নেই।

#

দিন দুই পরের কথা। অফিস থেকে ফিরতে দেখি অবিনদা বউদিকে নিয়ে বেরিয়েছে।

আমাকে দেখে বউদিকে বলল, “তুমি এগোও আমি আসছি”।

বউদি হাঁটতে শুরু করল।

আমাকে কানে কানে বলল, “অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে গিয়ে দেখি আমায় ঝাঁপিয়ে জড়িয়ে টড়িয়ে ধরে বলে তোমায় ভালবাসি। এত বছর পরে তোদের ভাইপো আসতে পারে। মানে রেকারিং এ ভালবাসাটা বাড়ছিল। সেটা যে সুদ টুদ জুড়ে এত ভয়ানক আকার ধারণ করে ফেলবে বুঝতে পারি নি। আমার ইচ্ছা ছিল ওই ছোকরার সঙ্গেই তোদের বউদির বিয়েটা দেব, কিন্তু সমস্যা হল, আমি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখলাম ইনি আমাকেই ভালবাসেন। সেক্ষেত্রে আমি জোর করে বিয়ে দিতে পারি না। নারী স্বাধীনতার ব্যাপারটা এসে পড়ে। ঈশ, ভাইপো কেন বললাম, ভাইঝিও তো হতে পারে। দেখেছিস, কেমন পুরুষতান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি? আবার নতুন করে পড়াশুনা শুরু করতে হবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরী যেতে হবে। নারীবাদ, পুরুষবাদ না, আমাদের এমন একটা জায়গায় আসতে হবে যাতে সব কিছু ট্রান্সপারেন্টলি জাস্টিস পায়। পড়াশুনা, গভীর পড়াশুনা দরকার এর জন্য।”

গম্ভীর মুখে অবিনদা চলে গেল।

আমি মাথা চুলকে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম…

বস্তুমূলক দ্বন্দ্ববাদ

অর্পণ অফিস থেকে ফিরে দেখল অর্পিতা কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে। সে জুতো খুলে ঘরে ঢুকে বলল, "কী হয়েছে?"
অর্পিতা ফোঁস করে উঠল, "তোমার ছেলে পর্ণ দেখছিল দরজা বন্ধ করে। আমি জানলা দিয়ে দেখেছি। কী করবে তুমি কর"।
অর্পণ বলল, "তুমি কী বলেছো?"
অর্পিতা বলল, "ফোন কেড়ে নিয়েছি। খেতে দেব না"।
অর্পণ শ্বাস ছেড়ে বলল, "মার ধোর?"
অর্পিতা বলল, "করব না? একটা মাত্র ছেলে আমার? সেও বখে গেল"।
অর্পণ বলল, "হু। দেখি ফোনটা দাও"।
অর্পিতা অর্পণকে ছেলে অর্কর ফোনটা দিল।
অর্পণ সেটা নিয়ে অর্কর ঘরের দিকে রওনা দিল।
দরজা খোলা ছিল। অর্পণ দরজা বন্ধ করে অর্কর খাটের উপর বসল। বলল, "ক্লাস টেন কেমন হবে?"
অর্ক বলল, "ভাল হবে"।
অর্পণ ফোনটা অর্কর দিকে দিয়ে বলল, "নে"।
অর্ক বলল, "থাক। ওটা তোমার কাছেই থাক। পরীক্ষার পরে নেবো"।
অর্পণ বলল, "ঠিক আছে। রাখ। এই নে"।
অর্ক ফোনটা নিল।
অর্পণ বলল, "কোন ক্লাস থেকে এসব দেখিস তুই?"
অর্ক বলল, "নাইন থেকে"।
অর্পণ বলল, "ছোটবেলায় জিজ্ঞেস করতিস মনে আছে, বাবা আমি কোত্থেকে এসেছি? এবার আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছিস। জানিস তো, আমি যখন প্রথম জানতে পেরেছিলাম, আমার খুব রাগ হয়েছিল আমার বাবা মায়ের উপরে। আমি ভাবতাম এটা খুব বাজে একটা কাজ। তারপর দেখলাম আমরা যেরকম বাথরুম যাই, এটাও সেরকমই। আমাদের জীবনে সব কিছুরই দরকার আছে। সেক্সেরও। তবে ঠিক সময়ে"।
অর্ক মাথা নিচু করে বলল, "আমি আর দেখব না বাবা। ভুল হয়ে গেছে"।
অর্পণ বলল, "আয় এ ঘরে আয়"।
অর্ক বসে বসে কাঁদতে লাগল। অর্পণ অর্কর মাথায় হাত বুলিয়ে দরজা খুলে বেরোল।
বাইরে অর্পিতা উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "কী হল? মারলে?"
অর্পণ বলল, "খিদে পেয়েছে। চল আজ বাইরে থেকে খেয়ে আসি"।
অর্পিতা রেগে গেল, "মানে? বাইরে খাবে? এটা সেলিব্রেশনের ব্যাপার? তোমার ছেলে পর্ণ দেখছে, আর বাপ হয়ে তুমি সেটা সেলিব্রেট করবে বুঝি? বাহ, ভাল তো!"
অর্পণ হেসে ফেলল। বলল, "রেডি হও"।
অর্পিতা গজগজ করতে করতে তৈরী হতে চলল।
#

রেস্তরাঁয় অর্ক কুণ্ঠিত হয়ে বসে আছে।
অর্পণ অর্পিতাকে বলল, “বিরিয়ানি খাবে নাকি জিজ্ঞেস কর”।
অর্পিতা বলল, “আমি পারব না। তুমি জিজ্ঞেস কর”।
অর্পণ অর্ককে বলল, “বিরিয়ানি খাবি?”
অর্ক ঘাড় নাড়ল।
অর্পণ খাবার অর্ডার করে বলল, “কতদিন ঘুরতে যাই না। অর্কর পরীক্ষার পর সিকিম যাব”।
অর্ক এবারেও কিছু বলল না।
অর্পণ বলল, “কীরে, সিকিম তো?”
অর্ক বলল, “নৈনিতাল নিয়ে যাবে বলেছিলে”।
অর্পণ জিভ কাটল, “ঠিক, নৈনিতাল। দেখেছিস, ভুলেই গেছিলাম”।
অর্ক একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে গেল।
অর্পিতা অর্ককে ঝাড়তে যাচ্ছিল অর্পণ অর্পিতার হাতটা চেপে ধরে মাথা নাড়ল।
খাবার এল। সবাই মিলে চুপচাপ খেয়ে নিল।
অর্পণ খাবার শেষে আইসক্রিম নিল।
খাওয়া হলে অর্পণ অর্পিতাকে বলল, “গাড়িতে গিয়ে বস, আমি অর্কর সাথে দুটো কথা বলে যাচ্ছি”।
অর্পিতা রেগে গেল, “এখন আবার কী কথা আছে”?
অর্পণ বলল, “যাও না, বলছি”।
অর্পিতা গাড়িতে গিয়ে বসল।
অর্পণ অর্কর দিকে তাকিয়ে বলল, “সেকেন্ড ইয়ারে প্রথম দেখেছিলাম। তাও সে কী ঝামেলা, ভিসিডি ভাড়া করে। বাড়িতে কেউ ছিল না, সেই পুরনো আমলের টিভিতে। কখন বাবা মা চলে আসবে, ভেবে যাচ্ছি। এসব জিনিস আরেকটু পরে দেখতে হত। সব কিছুরই সময় আছে বুঝলি?”
অর্ক চুপ করে রইল।
অর্পণ বলল, “দেখিস কী করে? এখন তো প্রায় সব সাইট বন্ধ করে দিয়েছে?”
অর্ক বাবার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বলল, “ভিপিএন দিয়ে। তাছাড়া রাত একটা দেখে ভোর পাঁচটা অবধি কিছু কিছু সাইট খোলা থাকে, তখন ডাউনলোড করে নি”।
অর্পণ বলল, “ভিপিএন? শিখিয়ে দিস তো, যাক গে, মার সামনে এসব আলোচনা করার দরকার নেই। যা, তিনটে হাজমোলার প্যাকেট নিয়ে আয় তো”। অর্পণ টাকা দিল।
অর্ক টাকা নিয়ে হাজমোলা কিনতে গেল।
অর্পণ গাড়িতে উঠলে অর্পিতা বলল, “কী বললে?”
অর্পণ গম্ভীর গলায় বলল, “খুব কড়া করে বকে দিলাম। বললাম জীবনে এরকম দেখলে ইলেভেন থেকেই হোস্টেলে দিয়ে দেব”।
অর্পিতা খুশি হয়ে বলল, “ঠিক বলেছো”।
অর্ক হাজমোলা কিনে ফিরছিল।
অর্পণ ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে গাড়ি স্টার্ট দিল।
তার মনে পড়ে গেল বাড়িতে যেদিন ভিসিডি নিয়ে কেস খেয়েছিল বাবার জুতোর বাড়ি খেয়ে তিন দিন পিসির বাড়ি গিয়ে থাকতে হয়েছিল...

নহি দেবী

১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারির এক বিকেল।

খুলনা। পূর্ব পাকিস্তান।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুটো সেনা ভর্তি ট্রাক নেমেছে এক গ্রামের পাশে।

ট্রাক দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সেনা ছাউনি তৈরী হয়ে গেল।

পাক সেনারা নেমেছে পূর্ব পাকিস্তান দমনে। গ্রামে গ্রামে অত্যাচার বাঁধনছাড়া হয়ে উঠেছে তাদের। এই বাহিনীই একদিন আগে খুলনার আর এক অঞ্চলে দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে মেরেছে। গ্রামের এক মুসলমান বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। যে বাড়িতে লুকিয়ে ছিল, সে বাড়ির লোকজনকে খুন করে তাদের দেহ গ্রামে ঢোকার গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছে। মেজর রশিদ জামাল অত্যন্ত হিংস্র একজন অফিসার। এই বাহিনী যেখানেই যাচ্ছে, সে জায়গা শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। মন্দিরের পর মন্দির ভাঙা হচ্ছে, ভাঙা হয়েছে কত দেবদেবীর মূর্তি। গোটা দেশ জুড়ে পাশবিক লীলা চলে যাচ্ছে পাক বাহিনীর।

পাক শব্দটির অর্থ পবিত্র, কিন্তু পাকিস্তানী সেনারা পাক নয়, যেন পাঁকে ফেলে দিয়েছে গোটা পূর্ব পাকিস্তানকে।

গ্রামটি হিন্দুপ্রধান।

সেনা বাহিনীর রশিদ জামালের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজাকার হারুণ আলি।

হারুণ আলির গায়ের রঙ কালো। সঙ্গে মনও। গ্রামে গ্রামে হিন্দু এবং দেশদ্রোহী চিনিয়ে দেওয়ার কাজ নিষ্ঠাভরে করে চলেছে সে। যারা পাকিস্তানপন্থী নয়, তারাই দেশদ্রোহী। যারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারাই দেশদ্রোহী। যারা শুধু নিজের ধর্মের সঙ্গে ভাষাকেও ভালবাসবে তারাই দেশদ্রোহী। গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে চলছে দেশদ্রোহী দমনের কাজ।

তাবু খাটানো হয়েছে গ্রামের পাশের মাঠে।

রাত হয়েছে। তাবুতে হ্যারিকেন জ্বালানো হয়েছে। সেনারা জল খেয়ে অপেক্ষা করছে। রশিদ নির্দেশ দিলেই গ্রামাভিমুখে রওনা দেবে।

রশিদ হারুণকে বলল, “রাস্তায় শুনলাম এ গ্রামে হিন্দু বেশি?”

হারুণ বলল, “জি জনাব”।

রশিদ বলল, “কচি মেয়ে কীরম আছে?”

হারুণ হাত কচলে বলল, “তেরো চোদ্দ জন”।

রশিদ বলল, “হিন্দু? আর মুসলিম?”

হারুণ বলল, “আরও জনা দশেক জনাব”।

রশিদ উঠে দাঁড়িয়ে সেনাদের নির্দেশ দিলেন গ্রামের সব মেয়ে বউদের ধরে নিয়ে আসতে। হারুণ বসে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

সে বাঙালি হলেও পাকিস্তানের দলে। পাকিস্তানপন্থী যারা, তারা শুধুমাত্র ধর্মের জন্যই পাকিস্তানকে সমর্থন করে। তাদের রাজাকার বলা হয়। দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে, বাঙালিরা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন পাকিস্তানী শাসকের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে, এদিকে দেশেরই কিছু মীরজাফর পাকিস্তানী

সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তথ্য দিচ্ছে কোথায় মুক্তিবাহিনী আছে, কোথায় হিন্দু পরিবার আছে।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হিন্দু পুরুষদের গুলি করে মেরে লাশ ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে। মহিলাদের ধর্ষণ করে শরীরের বিভিন্ন অঞ্চলে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। লাশ যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন আর তাদ্রে চিনতে পারা যাচ্ছে না। যে সব এলাকায় খবর পাওয়া যাচ্ছে মুক্তিবাহিনী সে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে, পাকিস্তানী সেনারা সেসব জায়গায় চোরাগুপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছে। আক্রমণেই অবশ্য থেমে থাকছে না। হিন্দু পরিবারগুলোকে গুলি করে মারা হচ্ছে, মহিলাদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, রেহাই পাচ্ছে না মুসলমান পরিবারও। গ্রামের পর গ্রাম পাকিস্তানী সেনাদের ধর্ষণের শিকার হচ্ছে বাঙালি মেয়েরা। কোন দেশের মানুষ যে এত বিভীষিকাময় হতে পারে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রতিমুহূর্তে দেখিয়ে দিচ্ছে।

সেনারা বেরনোর আধ ঘন্টার মধ্যে সেনা ছাউনি থেকেই দেখতে পাওয়া গেল গ্রাম থেকে হাহাকারের শব্দ ভেসে আসছে, আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করতে শুরু করেছে, গ্রামের বিচালি, খড়ের চালে আগুন দেওয়া হয়েছে। গুলির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। গ্রামবাসী নিধন শুরু হয়ে গেছে। রশিদ মদের গ্লাস নিয়ে হারুণের সামনে চেয়ারে বসে বলল, "হিন্দু মেয়ের মত মেয়ে খুবসুরৎ খুব কম আছে পৃথিবীতে। এদের ধর্ষণ করে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার মজাই আলাদা। হিন্দু তো আগুনে পুড়তে চায়। পুড়ুক"।

হো হো করে হেসে উঠল রশিদ। হারুণ বলল, "জি জনাব, হিন্দু মেয়ে খুব ভাল"।

রশিদ বলল, "তোমার চাই নাকি?"

হারুণ ঘোঁত ঘোঁত করে শব্দ করে হাসল।

রশিদ বলল, "ঠিক আছে। মঞ্জুর করলাম"।

হারুণ খুব খুশি হয়ে গেল।

রশিদ পরক্ষণেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

হারুণ বলল, "হুজুর সকালে পূর্বপুর গ্রামে কালীমূর্তি ভেঙেছেন বলে ভয় পাচ্ছেন?"

রশিদ লাল চোখে হারুণের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি মেজর রশিদ। আমার ভয়ে গোটা ইস্ট পাকিস্তান কাঁপে, আমি ভয় পাব কালীমূর্তিকে? আরেকবার এই ধরণের কথা বললে তোমার কোর্ট মার্শাল করে দেব হারুণ আলি"।

হারুণ ভয় পেয়ে বলল, "গুস্তাখি মাফ করবেন মেজর। আর এরকম কথা বলব না"।

রশিদ গম্ভীর হয়ে চুরুট টানতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে গ্রাম থেকে মেয়েদের টেনে হিচড়ে নিয়ে এসে অস্থায়ী সেনাছাউনির কাছে নিয়ে আসা হল। একজন সেনা এসে বলল, "জনাব, আপনি যাবেন, না পাঠিয়ে দেব?"

রশিদ বলল, "না, না, পাঠাবে কেন? যাব"।

রশিদ উঠল। এগারো বারো বছরের মেয়ে থেকে তিরিশ – পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছে। নাবালিকা বলে কোন মেয়ে রেহাই পায় নি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে। নাবালিকাদের চাহিদাই তাদের মধ্যে বেশি। অক্ষত যোনি বলে কথা। এত নৃশংসতা খুব কম দেশ প্রত্যক্ষ করেছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে দমন করতে যা করে বেরিয়েছে, তা পৃথিবীর ইতিহাসে কালো কালিতে লেখা থাকবে। এমন একটি বর্বর, অমানবিক এবং অসভ্য সেনাবাহিনী পৃথিবী খুব কম দেখেছে। কেউ কাঁদছে, কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে, কারো মাথায় ঘাড়ে আঘাতের দাগ। রশিদ বিরক্ত গলায় বলল, "বার বার বলেছি এদের কাউকে মারতে না, সেই মেরেছে"।

সেনারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েদের দেখতে দেখতে রশিদ একটা মেয়ের সামনে এসে নিচু হল। মেয়েটার গায়ের রঙ কালো কিন্তু মুখশ্রী অপূর্ব। শরীর যেন পাথর কুঁদে তৈরী হয়েছে। রশিদ সিটি দিল। বলল, "ও আল্লা। এ জিনিস এই গন্ডগ্রামে কী করছে। আয় আয়"।
মেয়েটার হাত ধরে টানল রশিদ। মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। বাধাও দিল না। রশিদ সেনাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোথায় ছিল?"
সেনারা বলল, "মন্দিরে"।
রশিদ খুশি হল, "বাহ। ব্রাহ্মণ? নিশ্চয়ই পুরোহিতের মেয়ে। এই জন্যই এত সুন্দর। চল"।
হারুণ খুক খুক করে কাশতে লাগল।
রশিদ বলল, "কী হল?"
হারুণ বলল, "হুজুর আপনার হয়ে গেলে..."
রশিদ রেগে গেল, "একেই দরকার? সাহস কম না তো! যা, ওদের মধ্যে থেকে যাকে খুশি নে। আমার সারা রাত লাগবে"।
হারুণ মাথা চুলকাল।
রশিদ মেয়েটাকে নিয়ে তাবুতে ঢুকল।
বেডিং পাতা। ছোট তাবু। মেয়েটা শাড়ি পরে আছে।
লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। এক ফোঁটাও মালিন্য নেই শরীরে।
রশিদ হেরিকেন উস্কে দিল।
বাইরে মেয়েদের কান্নাকাটি শুরু হয়েছে।
পাক সেনাদের উল্লাস। তারা ঠিক করেছে ধর্ষণ করে মেয়েগুলোর শরীর কুচি কুচি করে কেটে কুকুরদের খাওয়াবে। এ গ্রাম কিছুদিন আগে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিল।
এদের ছেড়ে দেওয়া যাবে না।
রশিদ মেয়েটার চুলের মুঠি ধরল।
মেয়েটা কোন শব্দ করল না। রশিদ উর্দুতে বলল, "পুজো করছিলি?"
মেয়েটা স্পষ্ট উর্দুতে জবাব দিল, "না। আমি তোদের অপেক্ষা করছিলাম"।
রশিদ চমকে উঠল, "কে তুই"?
মেয়েটা ফিকফিক করে হাসতে লাগল।
রশিদ মেয়েটাকে জোরে একটা চড় কষাল।
মেয়েটা চড় খেয়ে রা কাড়ল না। কিছুই হল না তার। সে মুখ টিপে হেসে যেতে লাগল।
রশিদ রেগে গেল। "দেখবি? কেমন লাগে দেখবি?"
রশিদ বেল্ট খুলল। উর্দি খুলল। মেয়েটাকে টেনে বেডিঙে শোয়াল। মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, ঠিক সেই সময় মেয়েটা জোরে হেসে উঠল। তার চোখ জ্বলে উঠল যেন। রশিদ থমকে গেল। বাইরে হল্লার শব্দ আসছে। সে বেল্ট পরে খালি গায়েই তাবুর বাইরে গিয়ে দেখল মুক্তিবাহিনী সেনাছাউনি আক্রমণ করেছে। প্রতিটা ঘর থেকে সেনা দের টেনে টেনে বের করে গুলি করে মারা হচ্ছে। রশিদের পরণে উর্দি নেই। শুধু প্যান্ট। সে ভয় পেল।
ছাউনির পাশে জঙ্গল। অন্ধকারে ঢাকা। রশিদ সে দিকেই দৌড়তে শুরু করল।
হাঁফ ধরে যাচ্ছিল। তবু দৌড় থামাল না সে। খানিকক্ষণ পর একটা ভাঙা বাড়িতে এসে পৌঁছল। দম নিল রশিদ। বসল। গুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর উল্লাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

রশিদ দম নিয়ে পালাতে যাবে, দেখল মেয়েটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরে বিন্দুমাত্র মালিন্য নেই। চমকে উঠল রশিদ। তার মনে হল স্বয়ং কালী দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।
মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে অট্টহাস্য করে উঠল। সেনাবাহিনীর সব থেকে নিষ্ঠুর মেজর আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।
#
রশিদের জ্ঞান ফিরল ভোরবেলায়। সেই বাড়িটার বারান্দাতেই।
রশিদ দেখল তাকে ঘিরে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেবীর মত সেই মেয়েটি। তাকে দেখে হেসে উর্দুতে বলল, "জ্ঞান না ফিরলে পাকিস্তানী কুকুরদের মারা নিষেধ ছিল... এবার অনায়াসে মারতে পারব। সালাম মেজর, আমি শায়লা হক, মুক্তিবাহিনীর কম্যান্ডার, আজকের ঘটনার পর বাংলার মা বোনেদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর আগে পাকিস্তানী বাহিনী দুবার ভাববে। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু"।
মেয়েটি বন্দুক তুলল।
রশিদ অসহায়ের মত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল।
ফাঁদ পাতা ছিল। শায়লা জানত পাকিস্তানী বাহিনী মন্দিরের মধ্যে কোন মেয়ে থাকলে সবার আগে তাকে তুলে নিয়ে যাবে। তাই সে মন্দিরেই লুকিয়ে ছিল।
পাক বাহিনী মেয়েদের উপর অত্যাচার করার আগেই চারদিকে লুকিয়ে থাকা মুক্তিবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে হামলা করেছিল সেনা ছাউনিতে। ফলস্বরূপ একজন পাকিস্তানীও আর বেঁচে ফিরতে পারে নি।
কুকুরের মত গুলি খেয়ে মৃত্যুর আগে অবধি রশিদ বুঝতে পারে নি, নিজেদের এবং তাদের ভাষার সম্মান রক্ষার্থে একটা দেশের মেয়েরা দেবীর থেকে কম ভূমিকা পালন করে না। সে রাতে হারুণ আলি পালিয়ে গেছিল। কিছুদিন আগে সাতাশি বছর বয়সে ঢাকায় ফাঁসি হল তার।
বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা একজন রাজাকারও যাতে সুস্থ ভাবে না থাকে, তার সুবন্দোবস্ত করে চলেছেন...

খেলা

হোটেলের দরজা বন্ধ করেই মুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আবীর। মুনের ঠোঁটে চুমু খেতে শুরু করল। মুন আবীরকে সরিয়ে বলল, "শোন, আমার কথা শোন"।
আবীর জামা খুলে মুনের সালওয়ারের পিঠের চেন খুলতে খুলতে বলল, "পরে শুনব, আগে খোল"।
মুন বলল, "শোন না"।
আবীর মুনের সালওয়ার খুলে দিয়ে বলল, "বাহ, আই লাভ রেড ব্রা। এখনই খুলিস না"।
মুনকে কোলে নিয়ে নরম বিছানায় ফেলল আবীর। বাইরে থেকে মুনের যোনীতে আঙুল বোলাতে শুরু করল।
মুন জোরে শীৎকার করে উঠল, "আহ"।
আবীর এবার মুনের পাজামা টেনে খুলে দিল। প্যান্টি নামিয়ে বলল, "বাহ, শেভ করেছিস"।
যোনিতে ঠোঁট দিল আবীর। মুন শিউরে উঠে বলল, "শোন না"।
আবীর জিভ দিয়ে মুনের যৌনাঙ্গ চাটতে চাটতে বলল, "হু"।
মুন বলল, "আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব। রিসেপশনিস্টটাকে সুবিধের লাগল না। কেমন কেমন করে দেখছে"।
আবীর যোনি থেকে মুনের নাভিতে উঠল। যোনি ভিজে গেছে। নাভি জিভ দিয়ে খানিকটা চেটে দিয়ে বলল, "ওরা ওভাবেই তাকায়। ওতে কিছু হয় না"।
মুন বলল, "প্লিজ আজকে তাড়াতাড়ি বেরোই চ'। আমার কেমন ভয় লাগছে"।
আবীর মুনের গায়ের ওপর উঠে মুনের একটা স্তন মুখে ঢুকিয়ে দিল। ডান হাতের তর্জনীটা মুনের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে বলল, "চোষ"।
মুন সেটা বের করে দিয়ে বলল, 'শোন, কী বলছি"।
আবীর বলল, "আচ্ছা তাই হবে। এবার তো ঠিক করে পার্টিসিপেট কর"।
মুন আবীরের মাথার চুল খামচে ধরল। আবীর মুনের যোনিতে আঙুল বুলিয়ে সেটাকে নরম করে দিয়ে নিজের পুরুষাঙ্গ মুনের যোনিতে প্রবেশ করাল। মুন বলল, "প্লিজ আজ স্টে করিস। আগের দিন পারলি না"।
আবীর মুনের এক হাত দিয়ে মুনের বুক খামচে ধরল। মুন শীৎকার করতে করতে আবীরের কোমর খামচে ধরল।
সেকেন্ড তিরিশেক পরেই আবীর ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
মুন হতাশ গলায় বলল, "কী হল? এত বড় বড় কথা বললি? পড়ে গেল?"
আবীর মুনের পাশে শুয়ে পড়ে বলল, "ফার্স্ট বার তো, বেশি এক্সাইটমেন্টে পড়ে যায়। একটু টাইম দে। তাছাড়া বার বার বলতে শুরু করলি, বেরিয়ে যাবি। কনসেন্ট্রেশন চলে যায়। তোর আর কি, তোর তো কোন চাপ নেই। শুয়ে থাকলেই হল। আসল পরিশ্রম তো আমাকে করতে হয়"।
মুন বলল, "থাম। অনেক হয়েছে। বাদ দে। চল বেরোই"।
আবীর বলল, "এখনই?"
মুন বলল, "হ্যাঁ। আমার রিসেপশনিস্টটাকে ভাল ঠেকল না। যদি কিছু হয়? যদি ক্যামেরা থাকে রুমে? ওদের রিসেপশনের টিভিগুলো দেখছিলি? হোটেল জুড়ে ক্যামেরা"।

আবীর বলল, “ওরে মা, এটা বিখ্যাত হোটেল। এখানে ওসব হয় না। আর কী হবে?”
মুন বলল, “যদি পুলিশ আসে”।
আবীর বলল, “বাল ছিঁড়বে। হোটেলে প্রেমিক প্রেমিকা থাকবে সেটা ইল্লিগাল নাকি?”
মুন বলল, “ঠিক আছে”।
আবীর বলল, “জল পিপাসা পাচ্ছে। জলটা দে তো”।
মুনের দিকে জলের বোতল ছিল। সে বোতলটা আবীরকে দিল। আবীর জল খানিকটা খেয়ে মুনের নগ্ন শরীরে ঢেলে দিল। মুন আঁতকে উঠল, “একী?”
আবীর মুনকে জড়িয়ে ধরে গাইল, “ভিগি ভিগি রাতো মে... হু হু”।
মুন আবীরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, “ভাগ। জল দিলি কেন? জানিস না আমার অল্পেই ঠান্ডা লেগে যায়?”
আবীর মুনকে জাপ্টে চুমু খেতে খেতে বলল, “এইবার তাড়াতাড়ি পড়বে না। প্রমিস করছি”।
মুন বলল, “একটু শো। এত তাড়াহুড়োর কী আছে?”
আবীর মুনকে জড়িয়ে ধরে শুল। মুন বলল, “আমার উপরে শুয়ে থাক”।
আবীর বলল, “আমার ওয়েট নিতে পারবি?”
মুন বলল, “হু। চ, একসাথে স্নান করি”।
আবীর বলল, “না। শো। চুমু খাব তোকে”।
আবীর মুনকে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। মুন হিহি করে হাসতে শুরু করল।
রুমের কলিং বেল বাজল।
মুন ভীত গলায় বলল, “ওই দ্যাখ। কে এলো?”
আবীর বলল, “তুই শো। আমি দেখছি”।
মুন বলল, “আমি বাথরুমে ঢুকছি। তুই যা”।
আবীর বিরক্ত গলায় বলল, “উফ, ঠিক আছে। তাই যা”।
মুন দৌড়ে বাথরুমে ঢুকল। আবীর কী হোল দিয়ে দেখল হোটেলের একজন ওয়েটার দাঁড়িয়ে আছে। সে টাওয়েল জড়িয়ে দরজা খুলল, “কী চাই?”
ওয়েটার বলল, “হোটেলের তরফ থেকে আপনাদের জন্য ওয়েলকাম ড্রিংক্স স্যার”।
আবীর ট্রেটা নিয়ে বলল, “আচ্ছা। বাই”।
ওয়েটার চলে গেল। আবীর বাথরুমের দরজা নক করে বলল, “এই যে বীরাঙ্গনা”।
মুন দরজা খুলে মুখ বের করে বলল, “গেছে?”
আবীর বলল, “হ্যাঁ। ওয়েলকাম ড্রিংক্স দিয়ে গেছে। গান্ডু। আয় এবার”।
মুন বেরোল। বলল, “উফ। আমার যে কী ভয় লাগে! বাড়িতে জানলে...”
বলতে না বলতেই মুনের ফোন বাজতে শুরু করল।
মুন আবীরকে বলল, “চুপ করবি। শিওর বাবা ফোন করছে”।
আবীর বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ। ফোনটা ধর যা’।
মুন ফোন ধরল। সত্যিই বাবা ফোন করেছে। এরকম শোনা গেল,
“হ্যাঁ... কোথায় আবার কলেজেই... হ্যাঁ, আজ টিউশন আছে, দেরী হবে... হ্যাঁ, সাবধানে আসব... রাখি... ক্লাস হবে”।
ফোনটা কেটে মুন বুক হাত দিয়ে বলল, “উফ”।

আবীর একটা গ্লাস মুনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “এক্সট্রা ক্লাসটা ভালই চলছে বল?”
মুন সরবতে চুমুক দিয়ে বলল, “ঈশ, কী এটা। বিচ্ছিরি”।
আবীর নিজের গ্লাসের ড্রিংক্সটা খেয়ে বলল “ঠিকই তো আছে”।
মুন বলল, “ধুস। বিচ্ছিরি। তোর কোন টেস্ট নেই। জঘন্য”।
আবীর গ্লাসটা রেখে মুনের পাশে শুয়ে পড়ে মুনের পিঠে চুমু খেতে শুরু করল।
মুন বলল, “হবে এবার?”
আবীর বলল, “ইয়েস। চুপ করে বসে থাক। আমি আদর করছি”।
মুন বলল, “হু”।
আবীর মুনের ঘাড়ে চুমু খেতে শুরু করল। পিঠের দিক থেকে হাত দিয়ে মুনের দুটো স্তন ধরল। ঘাড়ে, চুলে আদর করতে লাগল। মুন আবেশে চোখ বন্ধ করল। বলল, “কোলে নে”।
আবীর বলল, “আয়”।
মুন আবীরের কোলে বসল। আবীরের হাত মুনের শরীরের বিভিন্ন অংশে ঘুরতে ঘুরতে যোনীতে পৌঁছল। মুন শব্দ করতে শুরু করল।
আবীর চুমু খেতে খেতে মুনকে বলল, “আমার উপর ওঠ”।
মুন আবীরের পুরুষাঙ্গের উপরে বসে উঠবোস করতে শুরু করল।
আবীর চোখ বন্ধ করল।
মুন আবীরকে চড় মেরে বলল, “ঘুমিয়ে পড়িস না”।
আবীর হাসল, “ঘুমাই নি। কর”।
মুন উঠ বোস করতে শুরু করল।
আবীর ওই অবস্থাতেই উঠে বসে মুনকে ঠোঁটে চুমু খেল।
মুন বলল “আমায় ফেলে কর”।
আবীর মুনকে শুইয়ে দিয়ে মুনের ভিতর প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার কলিং বেল বেজে উঠল।
আবীর বিরক্ত গলায় বলল, “চুদির ভাইদের কোন কাজ নেই নাকি? উফ! তুই শো”।
মুন চাদর টেনে নিল।
আবীর কী হোল দিয়ে দেখল বাইরে। একজন ওয়েটার দাঁড়িয়ে আছে। টাওয়েল পরে দরজা খুলল। বলল, “কী হল?”
ওয়েটার বলল, “স্যার, লাঞ্চে কী খাবেন?”
আবীর বলল, “আমার মাথা। যাও তো”।
ওয়েটারের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল আবীর। বলল “যত্ত সব বিরক্তিকর”।
মুন শুয়ে আছে।
আবীর গিয়ে মুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।
দেখল তার ধাক্কায় শুধু বিছানাটা নড়ে উঠল। মুন সাড়া দিল না।
আবীর হাসল, “এই যে, ঢ্যামনামি শুরু হয়ে গেছে। ইয়ার্কি করিস না। এই, আমার নেমে যাবে”।
মুন সাড়া দিল না।
আবীর জলের বোতল থেকে জল নিয়ে মুনের গায়ে দিল। নাড়ি ধরল নাড়ি নেই। মুনের মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে।
তার হার্টবিট মিস করল।

মুন মারা গেছে?
কী করবে এবার সে?
মুনকে নাড়াল সে। কোন সাড়া নেই।
মাথায় হাত দিল আবীর।
বলল, "সর্বনাশ। এবার আমি কী করব?"
ফোনটা টেবিলে ছিল।
তাড়াতাড়ি বন্ধু রঞ্জনকে ফোন করল সে, রিং হয়ে গেল। রঞ্জন ধরল না। আবীর মাথায় হাত দিল।
বাবাকে ফোন করল। বাবা ফোন ধরল, "কীরে, কলেজে?"
আবীর বলতে গিয়েও বলতে পারল না। বলল, "হ্যাঁ"।
বাবা বলল, "কী হয়েছে, অসময়ে ফোন?"
আবীর বলল, "ভুল করে চলে গেল। রাখছি"।
বাবা বলল, "তাই ভাবি। এখন আবার কেন ফোন করবি। ধান্দা ছাড়া তো ফোন করিস না"।
আবীর ফোনটা কেটে দিল।
কী করবে এখন? কাকে কী বলবে?
এরকম হবে ভাবতেই পারে নি।
মুন শান্ত, স্থির ভাবে শুয়ে আছে। কী হল হঠাৎ করে?
একটু স্থির হওয়ার চেষ্টা করল আবীর। হাত পা কাঁপছিল তার।
জামা কাপড় পরে নিল। মুনকে চাদরে ঢেকে দিল।
রিসেপশনে ফোন করল। ফোন ধরল একজন, "হ্যালো"।
আবীর বলল, "হ্যালো"।
ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল, "ওয়েলকাম ড্রিংক্স খেলেন?"
আবীর বলল, "শুনুন, এখানে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে"।
"কী হয়েছে?"
আবীর তোতলাতে লাগল, "মানে আমার সঙ্গে যে ছিল, শি ইজ নো মোর"।
ওপ্রান্তে খানিকটা নীরবতা।
আবীর বলল, "হ্যালো। কী করব?"
"আপনি ঘরে থাকুন। আমরা আসছি"।
"আমি বাড়ি যাব"।
"প্লিজ স্যার, শান্ত হোন। আমরা আসছি"।
আবীর ফোন রেখে চুপ করে বসে রইল। তার মাথা কাজ করছিল না।
কলিং বেল বেজে উঠল।
আবীর দরজা খুলল।
রিসেপশনের ছেলেটা এসে বলল, "নমস্কার স্যার, আমি পলাশ। পুলিশকে খবর দিয়েছি। আপনি রিসেপশনে বসুন। ভয় পাবেন না, আমি তো আছি। শান্ত, যা স্যারকে নিয়ে যা"।
শান্ত নামে হোটেলের ছেলেটা আবীরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।
পলাশ দাঁড়িয়ে একটা শ্বাস ছাড়ল।

ঘরের ভিতর ঢুকে চাদরটা সরিয়ে দিল মুনের শরীর থেকে। নিজে জামা কাপড় খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মৃত মুনের ঠোঁটে কয়েক সেকেন্ড ধরে চুমু খেয়ে মৃতদেহটার কানে কানে বলল

“এই ছেলেটার জন্যই আমাকে ছেড়েছিলে? আর আমাকে চিনতেও পারলে না আজ? একটা গ্লাসেই বিষ ছিল। হয় তুমি মরতে নয় ও। তোমার পাপের শাস্তি ছেলেটা পাক। গুড বাই”।

মুনের মাথায় হাত বুলিয়ে মুনের অর্ধেক খাওয়া গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াল পলাশ।

মুনের খেলা শেষ হয়েছে।

এবার তার পালা...

অ্যাক্সিডেন্ট

ক্যান্টিনে বসে অ্যাসাইনমেন্ট টুকছিলাম। সোহিনী আমার পাশে বসে শ্বাস ছেড়ে বলল, "প্রেমে পড়লাম ভাই আবার"।

আমি হাসলাম। সোহিনীর প্রেমে পড়া আর চন্দ্র সূর্য ওঠা নামা একই ব্যাপার। কোন ব্যাপার না, মেয়ে বাসে উঠে কন্ডাকটারের প্রেমে পড়ে যাবে। কোন চাপ নেই, মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশের প্রেমে পড়ে যাবে। অভিনেতা, ক্রিকেটার, ফুটবলার, কবাডি প্লেয়ার, মাসলওয়ালা ভ্যানওয়ালা সোহিনীর ক্রাশের তালিকা দুর্যোধনের পাপের তালিকার থেকেও বেশি।

সোহিনী আমার পেটে খোঁচা মেরে বলল, "কী রে, কিছু বল"।

আমি বললাম, "প্রতিটা ব্রেক আপের পর তোর তিন মাস কোয়ারান্টাইনে থাকা উচিত বুঝলি। কিছু না কিছু বাওয়াল তোর হবেই। কার প্রেমে পড়লি"।

সোহিনী হাসি হাসি মুখ করে বলল "এস আর সির"। আমি বিষম খেলাম। সত্যজিৎ রায় চৌধুরী। স্যার? বললাম, "তুই আর লোক পেলি না?"

সোহিনী আমার হাত চেপে ধরল, "মাইরি বলছি ঋভু, বিশ্বাস কর, আজকে স্যার যখন আমায় বললেন নোটসগুলো নিয়ে যাস, আমি প্রেমে পড়ে গেলাম"।

আমি অ্যাসাইনমেন্ট টুকতে শুরু করলাম আবার। বললাম, "ভাল। গিয়ে নোটসগুলো নিয়ে আয়"।

সোহিনী বলল, "তুইও চল না। প্লিজ। ক্যাডবেরী খাওয়াব। প্রমিস"।

আমি বললাম, "তুই প্রেম করবি, তোকে সাহসী হতে হবে। আমি কী করব? দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখী টাইপ ব্যাপার হবে। যা যা। নিয়ে আয়"।

সোহিনী রাগী গলায় বলল, "দেখ, তুই যদি আমার সঙ্গে না যাস, তাহলে কিন্তু আমি এই এ ফোর শিটগুলো সব ছিঁড়ে রেখে দেব। যাবি কী না বল"।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "ঠিক আছে। চল। উফ। জ্বালিয়ে খাস মাইরি"।

সোহিনী সঙ্গে সঙ্গে খুশী। ব্যাগ থেকে আয়না বের করে লিপস্টিক দিয়ে বলল, "চল চল"।

ক্যান্টিনের ছেলেটাকে আমার টেবিলের ওপর নজর রাখতে বলে বেরোলাম।

ঋতম, সৌনকরা ক্রিকেট খেলছে। আমায় দেখে ডাকল, "কী বে, কোথায় যাচ্ছিস? এই বললি অ্যাসাইনমেন্ট বাকি, খেলতে চলে আয় তাহলে।"

আমি সোহিনীর দিকে দেখালাম। সোহিনী আমার হাতে চিমটি কেটে ফিসফিস করে বলল, "কেসটা বিবিসি করবি না একদম। চুপ চাপ চ"।

আমি ওদের বললাম, "আসছি দাঁড়া। পরে বলছি"।

সোহিনীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বি বিল্ডিংএ গেলাম। বি বিল্ডিং এ এস আর সি বসেন। আমি সোহিনীকে বললাম, "তুই কথা বলবি। আমি জাস্ট যাব"।

সোহিনী বলল, "একদম। চ"।

এস আর সি কম্পিউটারে কাজ করছিলেন। সোহিনী নক করলে আসতে বললেন। আমরা ওর সামনে দাঁড়ালে স্যার একটা নোটের বান্ডিল দিয়ে বললেন "জেরক্স করে ফেরত দিয়ে যেও"।

সোহিনী দাঁত কেলিয়ে "শিওর স্যার" বলে কাগজগুলো নিল।

আমরা বেরিয়ে আসতেই সোহিনী বলল, “হি ইজ সো হ্যান্ডসাম না?”
আমি বললাম “হু”।
সোহিনী বলল, “কিছু তো বল। উনি কি আমাকে পছন্দ করছেন? তোর কী মনে হয়?”
আমি বললাম, “উনি ওসব কিছু ভাবেন বলেই আমার মনে হল না। তুই কী করে জানলি উনি সিঙ্গল?”
সোহিনী বলল, “ফেসবুকে দেখেছি তো”।
আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এ মেয়ে এরকমই। যখন যেটা মাথায় উঠবে স্টক করে করে পাগল করে দেবে। কিছুদিন পরে আবার নতুন কেউ মনে ধরবে। হেড অফিসের সব স্ক্রু ঢিলা।
ক্যান্টিনে গিয়ে বসলাম আবার। সোহিনী মোবাইল ঘাঁটতে শুরু করল। বলল, “কী বলিস? ওকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেব?”
আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম “ও মানে?”
সোহিনী বলল “আরে এস আর সি”।
আমি বললাম “ও হয়ে গেল কবে থেকে?”
সোহিনী লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, “আজ থেকে। জাস্ট ভাব, আমার বর এত কোয়ালিফায়েড একজন লোক। আমি ওর ব্যাগ গুছিয়ে দেব। ও আবার আমাকে বলবে তুমি ঘরের কাজ কোর না। করতে হবে না, পড়াশুনায় মন দাও... উফ, হাউ রোম্যান্টিক”।
আমি মাথা নাড়লাম। এ মেয়ের কিছু হবে না।
২।
দু দিন পরের কথা।
মাঝরাত। ঘুমাচ্ছিলাম।
ফোন বেজে উঠল। চমকে উঠে ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে সোহিনীর উত্তেজিত গলা ভেসে এল, “আরে, শোন শোন। হি অ্যাক্সেপটেড মাই রিকোয়েস্ট। জাস্ট নাও। ইইইইই”।
আমি হতভম্ব গলায় বললাম, “কখন রিকোয়েস্ট পাঠালি তুই? আমাকে বলিস নি তো?”
সোহিনী বলল, “তোকে বললে যদি রেগে যেতিস। বা ও যদি অ্যাক্সেপ্ট না করত তাহলে কেসটা বাজে হত তাই না?”
আমি বললাম, “হ্যাঁ। সেই। ঘুমাই এবার মা?”
সোহিনী বলল, “হ্যাঁ। ঘুমা। আমি আজ পাগল হয়ে যাব। উফ... কী আনন্দ”।
আমি বললাম, “রাখবি?”
সোহিনী বলল, “সরি সরি। ঘুমা”।
ফোন রেখে জোরে হেসে ফেললাম। এ মেয়ের মত পাগল খুব কম আছে।
৩।
পরের দিন। ফার্স্ট হাফে সোহিনী আসে নি।
ব্রেক আওয়ারসে ক্রিকেট খেলছি, ফিল্ডিং করছিলাম মাঠের এক কোণে। সোহিনী দেখলাম আমাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসেছে। আদিত্য ব্যাট করছিল। থার্ড ম্যানে বল ঠেলেছে, আমি বল কুড়িয়ে কিপার সৌনককে বলটা ছুঁড়ে সোহিনীকে বললাম, “কীরে, কী হল”?
সোহিনী ঘাসের উপর বিমর্ষভাবে বসে বলল, “দূর এস আর সির গার্ল ফ্রেন্ড আছে”।
আদিত্যকে বোল্ড করে দিয়েছে কৌশিক। গোলু নামছে। এর পরে আমার ব্যাটিং। আমি বললাম,”কী করে জানলি? জিজ্ঞেস করেছিলি?”

সোহিনী গম্ভীর মুখে ঘাস খেতে খেতে বলল, “আরে প্রোফাইলে সব ফ্রেন্ডস ওনলি পিকচার ছিল। উনি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেপ্ট করার পর দেখলাম ওর আর ওর জি এফের গুচ্ছ ছবি। প্রি ওয়েডিংও করা হয়ে গেছে। ধুস”।

আমি বললাম, “বেঁচে গেল লোকটা। তোর পাল্লায় পড়লে আর দেখতে হত না”।

সোহিনী বলল, “শোন না, আমি একটা কথা ভেবেছি”।

গোলু লং অফের উপর দিয়ে একটা ছয় মারল। আমরা হাততালি দিয়ে “জিও ভাই” টাই বললাম। তারপর আমি সোহিনীকে বললাম, “কী ভেবেছিস?”

সোহিনী বলল, “দেখ তুই আমার খুব ভাল বন্ধু। যথেষ্ট সেনসিটিভ ছেলেও। আমরা কেন কাপল হতে পারি না”?

গোলু চার মারল একটা স্কোয়ার লেগে। আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, “আমি?”

সোহিনী বলল “হ্যাঁ তুই। কেন? কী প্রবলেম তোর?”

আমি বললাম, “আমি কোত্থেকে এলাম? এস আর সি, বিক্রম, ঋষভ পান্থ, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, আয়ুস্মান খুরানা এরাই তো ঠিক ছিল। আমি কেন?”

সোহিনী রেগে গেল, “এত মহাভারত বলার আমার সময় নেই। তুই রাজি কী না বল”।

আমি বললাম, “আমি তো ওরকম তোকে ভাবিই নি কোন দিন। মানে তুই আমার বোনের মত”।

সোহিনী একটা ইট তুলে আমার দিকে ছুড়ল, পায়ে লাগল, আমি বললাম “কী করছিস?”

সোহিনী বলল, “আমি অনেক ভেবে দেখেছি আমি তোকে ভালবাসি। তুই এখন এসব বোন টোন বললে কী করে হবে?”

আমি বললাম, “ঠিক আছে। ঠিক আছে। কলেজটা হতে দে। বেরিয়ে ডিসকাস করি? এই জন্য ফার্স্ট হাফে আসিস নি?”

সোহিনী বলল “হু। আমি অনেক ভেবেছি। তারপর এই ডিসিশন নিয়েছি। আই লাভ ইউ”।

জীবনে প্রথম কোন মেয়ে আই লাভ ইউ বলল। আমার কী করা উচিত? আমি কিছুই বুঝলাম না। গোলু আউট হয়ে গেল। ব্যাট করতে ছুটলাম।

ব্যাট মিস করা যাবে না। অনেকক্ষণ ধরে ফিল্ডিং দিয়েছি।

৪।

কলেজ শেষে কেউ বাসে যায়। কেউ ভ্যানে। সোহিনী বলল, “শোন, আমরা হেঁটে যাই”।

আমি রাজি হয়ে গেলাম।

শীতের বিকেল। তাড়াতাড়ি রোদ পড়ে যায়। সন্ধ্যে নামে ঝুপ করে।

সোহিনীর সঙ্গে কলেজের প্রথম দিন থেকেই বন্ধুত্ব।

তবু হাঁটতে শুরু করার পর কী বলব বুঝতে পারলাম না।

সোহিনী বলল, “তুই যদি ভাবিস এস আর সি এনগেজড বলে তোকে আই লাভ ইউ বললাম, তাহলে ভুল ভাবছিস”।

আমি বললাম, “আর আমি ভাবছি তুই আবার অন্য কারও প্রেমে পড়ে আমায় বলবি সব ইয়ার্কি ছিল”।

সোহিনী বলল, “না রে। আমি দেখেছি তোর কাছে থাকলে আমার চিন্তা কম থাকে। তোর মধ্যে একটা পার্টিসিপেটিভ লিডার টাইপ ব্যাপারও আছে। তুই আমার কেয়ারও করিস। সিরিয়াসলি বল সেগুলো ভালবাসা থেকে আসে না?”

আমি বললাম, "আমি তোকে নিয়ে সেভাবে কিছু ভাবিই নি। কী করে বলি বল তো? এই দিন যে আসতে পারে, আমি ভাবি নি কোন দিন"।
সোহিনী বলল, "কিস মি"।
আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "মানে?"
সোহিনী বলল, "চুমু খা"।
আমি বললাম, "ক্ষেপেছিস? রাস্তার মধ্যে?"
সোহিনী বলল, "তাহলে কোথায় খাবি? যেখানে বলবি সেখানে খাব। তাহলে বিশ্বাস হবে তোর?"
আমি বললাম, "এভাবে হঠাৎ করে বিশ্বাস হয় নাকি? তাছাড়া আমি বুঝতেই পারছি না কিছু। তোর সঙ্গে রিলেশনের ব্যাপারটাই কেমন কেমন লাগছে"।
সোহিনী বলল, "কেমন লাগার কী আছে? শোন না, আমি তোকে ভালবাসি আমি জানি। আমার মনে হয়েছিল আগেও। আমি নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করছিলাম না। ভালবাসি বিশ্বাস কর"।
সোহিনী আমার হাত চেপে ধরল।
আমার মনে হল সবাই আমাদের দেখছে। আমি তাড়াতাড়ি ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "চল, পাগলামি করিস না। সাতদিন পর যদি আমাকে একইভাবে ভালবাসিস তাহলে বিশ্বাস করব। এমনি তোকে বিশ্বাস করা খুব চাপ মাইরি"।
সোহিনী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আই লাভ ইউ ঋভু। বিলিভ মি"।
আমি বললাম, "ঠিক আছে। বাড়ি যা। বাড়ি গিয়ে ভাব। আমিও ভাবি। তারপর দুজনে মিলে ডিসিশন নি। এটা সত্যিই ভালবাসা নাকি বুঝতে হবে তো"।
সোহিনী বলল, "ফোন করব, ধরিস"।
ওর গলাটা হঠাৎ কেমন লজ্জায় ভরে উঠল।
বাসে উঠে চলে গেলে আমার কোন কিছুই বিশ্বাস হল না। মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি।
আমার বাস এল দশ মিনিট পরে। ভীড়ে প্রতিদিন কষ্ট হয়। আজকে হল না। সোহিনীর সঙ্গে কাটানো সময়গুলো মনে পড়তে লাগল।
সত্যি পাগলী একটা। আবার এটাই ঠিক, সত্যিই মেয়েটা কিছু হলেই আমাকে এসে বলে। কী ভেবেছে কে জানে, যদি সত্যি ভালবাসে তাহলে ওকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না।
অজান্তেই ঠোঁটের কোণে কখন হাসি এল বুঝতেও পারলাম না।
এমন ক্ষেপী মেয়ে, দু দিন পর পর প্রেমে পড়বে। তারপর ঝাড় খেয়ে এসে আমার কাছে কাঁদবে। পরক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রেমে পড়বে। এমন পাগলীকে বিশ্বাস করা খুব কঠিন।
আবার ভাল না বেসেও থাকা যায় না।
আমি আর সোহিনী? অদ্ভুত একটা ভাল লাগা ঘিরে ধরছিল।
বাস দাঁড়াতে দেখলাম সৌনক মেসেজ করেছে, "একটা বাজে ব্যাপার হয়েছে। সোহিনীর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে"।
আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।
আমি সৌনককে ফোন করলাম, একবার রিং হতেই সৌনক ধরল, গলা বসা, বলল "জাস্ট খবর পেলাম রে। বাসে বাসে রেস চলছিল। সোহিনীর বাসটার সঙ্গে আরেকটা বাসের মারাত্মক কলিশন হয়েছে। স্পট"।
আমি রাস্তাতেই বসে পড়লাম। লোকজন আমার দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে।

স্পট? সৌনক সোহিনীর একই পাড়ায় থাকে। খবর পেয়ে আমাকে জানাল কারণ ও জানে সোহিনী আমার খুব ভাল বন্ধু।

আমার দু চোখে জল চলে আসছিল বুঝতে পারছিলাম।

ওর ওই কথাটাই মাথায় ঘুরতে লাগল, "কিস মি"... পাগলীটার এমন পরিণতি মানা যায় না... জাস্ট...

এত সুন্দর একটা দিনের এমন একটা পরিসমাপ্তি? মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে থেকে কী মনে হতে সোহিনীর নাম্বারে ফোন করলাম। রিং হয়ে গেল।

কী কষ্ট হচ্ছে বলে বোঝানো যাবে না। রাস্তা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরতে লাগলাম।

একটা আননোন নাম্বার থেকে ফোন এল, ধরলাম না প্রথমে। আবার ফোনটা বাজতে শুরু করল।

বিরক্ত হয়ে ধরলাম, ভাঙা গলায় বললাম, "কে?"

ওপাশ থেকে খুব চেনা একটা গলা ভেসে এল, "তোর যদি আমার অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে এক ফোঁটাও কষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তুই আমাকে ভালবাসিস। কী বুঝলি, ভালবাসিস?"

আমি বললাম, "তুই মরিস নি?"

সোহিনী বলল, "সৌনককে ফিট করতে হল। তুই বললি না, ভালবাসিস নাকি শিওর নোস, তাই পরীক্ষা করলাম আর কী। কষ্ট হল? ভালবাসিস?"

আমি গালাগাল দিতে শুরু করলাম জোরে জোরে।

ওপারে সোহিনী হি হি করে হাসতে লাগল...

লাভবার্ডস

১

হোটেল লাভবার্ডস।
সকাল ছ'টার শিফট। সন্ধ্যে ছ'টা অবধি। পৌঁছনোর কথা ভোর সাড়ে পাঁচটায়।
অরুণিমার ছ'টা দশ হয়ে গেল।
সাগ্নিক দাঁড়িয়ে ছিল হোটেলের বাইরে। তাকে দেখে রাগী গলায় বলল, “দেরী করে ফেললি?”
অরুণিমা কাঁচুমাচু মুখে বলল, “এক্সট্রিমলি সরি গো। কোন এক্সকিউজ দেব না। দেরীই হয়েছে"।
সাগ্নিক বলল, “ওকে। তাড়াতাড়ি যা। ত্রিপর্ণা একা আছে"।
অরুণিমা "শিওর" বলে দৌড় দিল।
ত্রিপর্ণা তাকে দেখে যান্ত্রিক হাসি হাসল। অরুণিমা চেঞ্জ রুমে ঢুকে মনে মনে বলল, “যতই হাস। তুই যে 'বিচ'টা বললি, সেটা আমার কানে চলে এসেছে ঠিক"।
চেঞ্জ করতে বেশিক্ষণ লাগল না।
লিপস্টিকটা দেখে নিল একবার। কাজলটাও। ডেস্কে বসতে ত্রিপর্ণা বলল, “কাল আমার আসতে দেরী হবে"।
অরুণিমা বুঝল এটা আজকের বদলা। ত্রিপর্ণা এটা ফেলে রাখে না। একদিন অরুণিমা দেরী করলে পরের দিন ত্রিপর্ণা দেরী করবেই।
সে বলল, “শিওর"।
ত্রিপর্ণা বলল, “তিনশো তিনের চেক আউট আছে। বিল বানা"।
অরুণিমা সার্ভিসে ফোন করল। ওপাশ থেকে জয়ন্ত ধরল, “ইয়েস"।
অরুণিমা বলল, “তিনশো তিনের বিল এন্ট্রি কমপ্লিট জয়ন্তদা?”
জয়ন্ত বলল, “হ্যাঁ। এন্ট্রি করে দিয়েছি"।
অরুণিমা বলল, “ওকে"।
ফোন রেখে বিল এন্ট্রি করল অরুণিমা। সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে তিনশো তিনের বোর্ডার বেরোচ্ছে।
এক মধ্যবয়স্ক লোক। সঙ্গে একজন মেয়ে। অরুণিমা তিনশো তিনের ডকুমেন্ট চেক করল।
ঋতমা লাহিড়ী। বয়স তেইশ। লোকটার নাম অলক রাহা। ত্রিপর্ণা গলা নামিয়ে বলল, “বুড়ো কেমন পারফরমেন্স দিল কে জানে"।
অরুণিমা হেসেই গম্ভীর হল। হাসতে দেখলে সাগ্নিকদা রেগে যাবে।
মেয়েটাকে নিয়ে লোকটা লিফটে উঠল।
অরুণিমা ব্যাগ থেকে ছোট বিস্কুটের প্যাকেটটা বের করে একটা কামড় দিল। সকালে বেশিক্ষণ খালিপেটে থাকলে বিভিন্ন রকম সমস্যা হয়। ডাক্তার দাসকে দেখিয়েছে আগের শনিবার। উনি বলেছেন খালিপেটে না থেকে একটা বিস্কুট হলেও যেন সে খেয়ে নেয়।
মেয়েটা ফোন ঘাঁটতে ঘাঁটতে এসে দাঁড়াল। অলক রাহা রিসেপশনে এসে বললেন, “বিল রেডি?”
অরুণিমা হেসে "হ্যাঁ স্যার, এইট থাউজ্যান্ড ফাইফ হান্ড্রেড আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট আছে"।
অলক রাহা মানিব্যাগ বের করে একটা ক্রেডিট কার্ড বের করে তার দিকে এগিয়ে দিল।
অরুণিমা কার্ডটা সোয়াইপ করল। রিসিপ্ট বেরিয়ে এল। বিল এবং মেয়েটাকে নিয়ে অলক রাহা বেরিয়ে গেল।

ত্রিপর্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “টাকা থাকলে কত মজা না?”
অরুণিমাও প্রত্যুত্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “তা আর বলতে"।

২।
সকাল দশটা। অরুণিমা আর ত্রিপর্ণা গল্প করছিল।
স্লাইডিং ঠেলে একবারেই কম বয়সী একজোড়া কপোত কপোতী ঢুকল। ত্রিপর্ণা অরুণিমাকে কথার মাঝখানেই চিমটি কাটল। অরুণিমা ব্যথায় চিৎকার করতে গিয়ে সামলে নিল।
ছেলেটার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব। সেই এগিয়ে এসে রিসেপশনে তাদের কারো দিকে না তাকিয়ে বলল “অ্যাপে বুক করা আছে। রুবান তালুকদার নামে”।
অরুণিমা বলল, “আপনার বুকিং রেফারেন্সটা দিন স্যার”।
ছেলেটা মোবাইল ঘেঁটে একটা এস এম এস বের করে অরুণিমার দিকে এগিয়ে দিল।
অরুণিমা দেখল মেয়েটা একটু দূরে সোফায় ওড়নায় মুখ ঢেকে বসেছে।
সে কম্পিউটার ঘেঁটে বলল, “হ্যাঁ স্যার, বুকিং আছে। দুজনের আই কার্ড দিন”।
ছেলেটা মাথা চুলকে বলল, “ওর আই কার্ড তো হবে না”।
অরুণিমা হেসে মাথা নাড়ল, “না স্যার, দুজনেরই লাগবে”।
ছেলেটা তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে মেয়েটার কাছে গেল। মেয়েটা আর ছেলেটা ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা বলল। কয়েক মিনিট পর ছেলেটা দুজনের আই কার্ড দিল অরুণিমাকে। অরুণিমা জেরক্স করে একটা হোটেলের বুকিং ডিটেইলসের একটা বিল বের করে বলল “দুজনকে সই করতে হবে”।
ছেলেটা মেয়েটাকে ডাকল।
মেয়েটা যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে। ছেলেটা মেয়েটাকে ঠেলল। মেয়েটা সই করল। কিঙ্কিণী দাস।
অরুণিমা সেসব দেখেও দেখল না। এরকমই নির্দেশ দেওয়া আছে তাদের।
তাপস কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে ডেকে রুমের চাবি দিয়ে বলল, “রুম নাম্বার চারশো পাঁচ। নিয়ে যা”।
তাপস হেসে ওদের দিকে তাকাল, “চলুন স্যার”।
ছেলেটা আর মেয়েটা যেন পালিয়ে বাঁচল।
ত্রিপর্ণা এতক্ষণ সব চুপ করে দেখছিল। ওরা চলে গেলেই বলল, “ফার্স্ট টাইম। আমি শুধু দেখতে চাই বেরনোর সময় মেয়েটা কী করে। ছেলেটা দরজা ভাঙতে পারল নাকি দেখতে হবে”।
অরুণিমা হেসে ফেলল।
ত্রিপর্ণা বলল, “দাঁড়া আমি খেয়ে আসি”।
অরুণিমা বলল “ওকে”।
ত্রিপর্ণা খেতে গেল।
সাগ্নিক এসে বলল, “কী খবর? কচিগুলো ঢুকল দেখলাম”।
অরুণিমা হাসল, “হু। আজ অ্যাপ বুকিং ভর্তি। সব ডে চেক আউট আছে। কোনটা চারঘন্টা, কোনটা আটঘন্টা। কী ব্যাপার বল তো? আজ কি কোন স্পেশাল ডে?”
সাগ্নিক ডেট দেখে বলল, “কোন ডেই না। অ্যাপের কল্যাণ সব। আমাদের কী? মনে রাখিস জাজমেন্টাল লুকস যেন না থাকে। তাহলেই হবে। কাস্টমার অ্যাপে আমাদের হোটেলের রেটিং কমিয়ে দেবে তখন”।
অরুণিমা বলল, “হু। ওকে”।

সাগ্নিক ঘড়ি দেখে বলল, "আমায় বেরোতে হবে একটু। আনোয়ার শা রোডে কাজ আছে। দুপুরের মধ্যে ফিরব। আজ সেনদাও আসবে না। তোদের দুজনকে সামলাতে হবে। কোন প্রবলেম হলে ফোন করবি"।
অরুণিমা বলল, "ঠিক আছে। রাঘব আর বাসু আছে তো। ওরা সামলে নেবে সেরকম হলে"।
সাগ্নিক বলল, "হ্যাঁ। এলাম"।
অরুণিমা বলল, "এসো।
সাগ্নিক বেরোল। আরো দুটো কাপল এল। একইভাবে আই কার্ড জেরক্স করে নিয়ে তাদের রুম কী দিল অরুণিমা। ত্রিপর্ণা খেয়ে এসেই বলল, "আমায় ওয়াশ রুম যেতে হবে। আরেকটু সামলা"।
অরুণিমা রাগল একটু। কিন্তু কিছু বলল না। ঠিক করল ত্রিপর্ণা যত দেরী করবে, সেও ততটাই দেরী করবে। দুইশো দশ থেকে ফোন এল। এসি কাজ করছে না। রাঘবকে ফোন করল অরুণিমা। তিনশো সাতের বাথরুমের লাইট জ্বলছে না। সেটাও রাঘবকেই বলল। এসব রেগুলার সমস্যা। লেগেই থাকে। পাঁচ তলা হোটেল। তবে ছিমছাম। আজকালকার লাভ বার্ডদের জন্য আদর্শ। কোন ঝামেলা নেই। অ্যাপ বুক করে চলে এসো। যতক্ষণ খুশি কাটিয়ে চলে যাও। হ্যাপি আঙ্কেল অ্যাপের এক্সক্লুসিভ হোটেল। ঘন্টা হিসেবেও বুক করা যায়।
হঠাৎ মণিটরে দেখল ফোর্থ ফ্লোরের ফুটেজে দেখাচ্ছে দরজা খুলে মেয়েটা জোরে জোরে হাঁটছে। ছেলেটা মেয়েটার হাত ধরার চেষ্টা করল একবার। মেয়েটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামছে।
অরুণিমা কৌতূহলী হল। কয়েক মিনিট পরেই মেয়েটা তার কাছে এসে বলল, "আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমায় কিছু করতে হবে?"
অরুণিমা বলল, "না ম্যাম। ঠিক আছে"।
মেয়েটা বেরিয়ে গেল।
ছেলেটা হতাশ মুখে পিছন পিছন আসছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলল, "চেক আউট করতে কী করতে হবে বলুন। কোন সই টই?"

৩

দুদিন পরের কথা। অরুণিমা একাই রিসেপশন সামলাচ্ছিল। ওরা দুজন এল।
কিঙ্কিণী এবারেও মুখে ওড়না দিয়ে এসেছে। তবে দেখে অনেক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।
দুজনের আই কার্ড এগিয়ে দিল রুবান। চেক ইন করতে বেশিক্ষণ লাগল না।
তবে এবারে চারঘন্টা কাটাল ওরা। বেরনোর সময় কিঙ্কিণী খোঁড়াচ্ছে। অরুণিমা সেটা দেখল। রুবান কিঙ্কিণীকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। চেক আউটের সই করল রুবান।
অরুণিমা ভাবল একবার জিজ্ঞেস করে কোন সমস্যা আছে নাকি। অনেক কষ্টে সামলে নিল। নির্দেশিকায় পরিষ্কার বলা আছে নিজে থেকে না চাইলে কোন রকম সাহায্য করতে হবে না।
ওরা চলে গেলে সাগ্নিক এসে তাপস এসে বলল, "দিদি, ঘরটা যা করে রেখেছে না, আর কী বলব। বেডশিটের ওপর রক্ত টক্ত ফেলে একেবারে বিচ্ছিরি অবস্থা"।
অরুণিমা বলল, "সে হতেই পারে, ক্লিন কর"।
তাপস বলল, "আমার ছেলেমেয়ে হলে জুতোর বাড়ি মারতাম। কী অবস্থা বল দেখি, এইটুক এইটুক ছেলে মেয়ে। কলেজে পড়াশুনা হয় না আজকাল, এইসব হয়?"
অরুণিমা চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। সাগ্নিকদা থাকলেই বকা খেত এসব ব্যাপার আলোচনা করার জন্য। বলল, "এগুলো ভাল না খারাপ জানি না। আমাদের তো এসব দেখার দায়িত্ব না, তাই না?

এগুলোকে বলা হয় মরাল পুলিসিং। আমরা যে এই চাকরিটা করছি, সেখানে যদি মরাল পুলিশিং চলে, তাহলে হোটেলে লোক আসবে না। আর যদি লোক না আসে, তখন কী হবে? আমাদের চাকরিটা থাকবে?" তাপস গজগজ করতে করতে চলে গেল।
একটা কমবয়সী কাপল এল। অরুণিমা তাদের চেক ইন করাল। তাপস আরেকটা ঘরে নিয়ে গেল।
উইক ডেজ, আগের দিনের মত ভিড় নেই। অরুণিমা সোফায় বসল খবরের কাগজ পড়তে। সাগ্নিক এসে তাকে দেখে বলল, "কী হল? ডেস্ক ফাঁকা কেন? পেপার পড়তে হলে ডেস্কে পড়! সিসিটিভিতে বসেরা সব দেখছে কিন্তু অরু, কেস খাওয়াস না মা"।
অরুণিমা জিভ কেটে ডেস্কে গিয়ে বসল। সাগ্নিক বলল "আজকের কী আপডেট এখন অবধি?"
অরুণিমা বলল, "ওই সেদিনের আধ ঘন্টায় চেক আউট করা কাপলটা আজ এসেছিল। তাপসদা গজগজ করছে, বেডশীটে রক্তের দাগ"।
সাগ্নিক বলল, "ভাল সিনেমা হয়, বেডশিটে রক্তের দাগ। চমৎকার থ্রিলার হবে।
অরুণিমা হেসে ফেলল, "ধ্যাত। শুধু ফালতু কথা"।
ফোন বাজছিল। অরুণিমা ধরল। অ্যাপ অফিস থেকে ফোন এসেছে। একগাদা ডেটা দিতে হবে।
সব শুনে ফোন রাখতে সাগ্নিক জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"
অরুণিমা বলল, "কী আর হবে? আবার সেই ডেটা পাঠাতে হবে। শান্তি দেবে না এরা"।
সাগ্নিক বলল, "দে দে। আমি ফুড সেকশন দেখে আসি"।
কিছুক্ষণ পর দুশো দুই থেকে ফোন করে জানাল চেক আউট করবে। অরুণিমা ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিল তৈরী করতে।

৪

।। আরো দুদিন পরের কথা।।
ত্রিপর্ণার একটা সম্বন্ধ এসেছে। ছেলে এন আর আই। সেটা নিয়ে দুজনে গল্প করছিল। অরুণিমাকে দেখাল ত্রিপর্ণা ছেলেটার ফটো। অরুণিমা দেখে বলল, "কী করবি তুই? চাকরি ছেড়ে দিবি?"
ত্রিপর্ণা বলল, "বাড়ি থেকে প্রেশার আসছে। মনে হয় না আর চাকরিটা করা যাবে"।
অরুণিমা বলল, "ঠিক আছে। তোর বিয়েতে জামদানী পরব"।
দুজনে মিলে গয়নার গল্প শুরু হল।
হঠাৎ অরুণিমার ফোন বেজে উঠল, আননোন নাম্বার।
অরুণিমা ধরল, "হ্যালো"।
"হ্যালো ম্যাম। আমি দ্য উইন্ডোজ থেকে বলছি। লাস্ট মান্থে আপনি ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। আপনাকে জানাতে চাই, আপনাকে শর্ট লিস্ট করা হয়েছে। জয়েনিং লেটার পাঠানো হয়েছে। হ্যাভ এ নাইস ডে ম্যাম"।
ফোনটা কেটে গেল। অরুণিমা থ হয়ে বসে রইল। এ তো স্বপ্ন। সে ভাবেও নি উইন্ডোজে পেয়ে যাবে। প্রায় তিনগুণ স্যালারি। ত্রিপর্ণা বলল, "কী হল রে?"
অরুণিমা সামলে নিয়ে বলল, "কিছু না। পরে বলছি"।
ত্রিপর্ণা ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করল।
অরুণিমা বলল না। ত্রিপর্ণার পেট পাতলা। সব কথা ওকে বললে পরে ঝামেলা হবেই।
স্লাইডিং ঠেলে রুবান আর কিঙ্কিণী ঢুকল। এবারও রুবান আগে, কিঙ্কিণী পরে।

অরুণিমা স্বাভাবিক মুখ করল। যান্ত্রিক হওয়াটাই নিয়ম এখানে।
ওরা চেক ইন করে রুমে চলে গেলে ত্রিপর্ণা বলল, "বাপ রে, এরা তার মানে এখন প্রায়ই আসবে"।
অরুণিমা বলল, "হু"।
ত্রিপর্ণা বলল, "এভাবেই সব শুরু হয়, বল?"
অরুণিমা বলল, "হ্যাঁ। তোরও হবে"।
ত্রিপর্ণা বলল, "জানি না কী হবে। এসব দেখে কেমন টেনশন লাগে আজকাল। কী ধরণের লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে জানি না"।
অরুণিমা হাসল, "তা ঠিক"।
বাড়ি থেকে মা ফোন করে জানাল চিঠি পৌঁছেছে একটা।
অরুণিমা বুঝল উইন্ডোজের চিঠিটা এসেছে। আনন্দ হচ্ছিল অদ্ভুত একটা।

৫

দু মাসের নোটিস পিরিয়ড চলছে অরুণিমার। ত্রিপর্ণার বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে। সাগ্নিক ব্যাজার মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে বলছে, "কে জানে, নতুন লোক আবার কেমন হবে"।
অরুণিমা আর ত্রিপর্ণা দুজনেই সাগ্নিককে সান্ত্বনা দেয়। ত্রিপর্ণা মাঝে মাঝেই অরুণিমাকে বলে, "কবে ইন্টারভিউ দিলি? বললি না কিছুই?"
অরুণিমা হেসে কাটিয়ে দেয়।
বুধবারের দুপুর। লাঞ্চ করে দুজনে বসে ছিল, এমন সময় রুবান ঢুকল। সঙ্গে অন্য একটি মেয়ে। সামান্য অস্বস্তি মুখে রুবান রিসেপশনে এসে ফোন এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমাদের একটু আর্লি চেক ইন লাগবে"।
রোবটের মত মুখ করে চেক ইনটা করিয়ে দিল অরুণিমা। মেয়েটাকে নিয়ে রুবান চলে গেলে ত্রিপর্ণা বলল, "বাপরে, এই টুক ছেলে, জিনিস তো রে"।
সাগ্নিক ডেস্কের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "কী হয়েছে?"
ত্রিপর্ণা বলল, "তোমার সেই কচি ছেলে আরেকটা মেয়ে নিয়ে এসেছে। শিওর ব্রেক আপ হয়েছে দেখো"।
সাগ্নিক ত্রিপর্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বলে, নইলে গালাগাল দিতাম শিওর। ইনস্ট্রাকশন ভুলে গেছিস?"
ত্রিপর্ণা বলল, "কিছুই ভুলি নি। জাস্ট দেখে কেমন লাগল তাই বললাম"।
সাগ্নিক কাঁধ ঝাঁকাল, "দিস ইজ লাইফ। কেউ আসে, কেউ যায়। এসব নিয়ে ভাবিস না"।
ত্রিপর্ণা বলল, "হু। শরীরের স্বাদ পেয়ে গেছে। এখন হোটেল ছাড়া কিছু বুঝবে না"।
সাগ্নিক বলল, "আমাদের সময় অনেক ঝামেলা ছিল। পার্কে যাও রে, সিনেমা হলে যাও রে, একদিকে ভালই হয়েছে। আমার তো মনে হয় এরাই ভাল আছে। অ্যাটলিস্ট পুলিশের ঝামেলাটা নেই। কেউ কারো সঙ্গে ইন্টিমেট হবে, সেখানে আইনরক্ষক আসবে কেন? দ্য সোসাইটি ইজ গ্রোইং ফাস্ট। আমার মনে হয় এটা গুড সাইন"।
অরুণিমা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, চারশো দশ থেকে চেক আউটের ফোন এসে গেল। সে বিল তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।
রুবানরা চেক আউট করল চার ঘন্টা পরে। অরুণিমা সিসিটিভি মণিটরে দেখল দুজন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে রুম থেকে বেরোচ্ছে। তার হঠাৎ করে কিঙ্কিনীর মুখটা মনে পড়ে গেল।

৬।

শেষ দিন অরুণিমার। পরের দিন উইন্ডোজে জয়েনিং।

ডেস্কে বসে অভ্যস্ত হাতে কাজ সামলাচ্ছিল। মনটা খারাপও লাগছিল।

কাজ করতে করতে একটা কমফোর্ট জোন চলে আসে। বড় বড় হোটেলে যে সুবিধাগুলো থাকে, সে সুবিধাগুলো না থাকলেও ছোট পরিবারে কাজ করার আনন্দটা অন্যরকম হয়।

দুপুর দেড়টা বাজে। ত্রিপর্ণা লাঞ্চ সেরে এসে বসে তার সঙ্গে গল্প শুরু করল।

অরুণিমা কাগজ পড়ছিল।

হঠাৎ ত্রিপর্ণা তাকে খোঁচাল। অরুণিমা শব্দ করতে গিয়েও চুপ করে গেল। রুবান এসেছে। সঙ্গে আবার কিঙ্কিণী।

সে একইরকম অভ্যস্ত মুখে সব কাজ করল। ওরা চলে গেল।

ত্রিপর্ণা বলল, "আমি ভেবেছিলাম আগেরটা ব্রেক আপ হয়েছে। তা না। বাবু ডুয়াল সিম লাগিয়েছেন"।

অরুণিমা বলল, "হ্যাঁ। তাই দেখছি"।

ত্রিপর্ণা বলল, "আমার খুব ভয় লাগে আজকাল। মানুষের উপর থেকে বিশ্বাসটাই চলে যায়, হোটেলে থাকলে। ধুস"।

অরুণিমা বলল, "ভাবিস না এত কিছু, সব ঠিক হয়ে যাবে"।

ত্রিপর্ণা আর কিছু বলল না। এক মনে তাকে একগাদা সেন্টু খাইয়ে যেতে লাগল। "তুই চলে যাবি ভাল জায়গায়, তোর আর কী" ইত্যাদি।

অরুণিমা হেসে হেসে সব শুনে গেল।

চারটের সময় হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট রুমে একটা ছোট ফেয়ারওয়েল হল তার। ত্রিপর্ণা জড়িয়ে ধরে কাঁদল। একটা শাড়ি আর মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে অরুণিমা যখন হোটেল থেকে বেরোল তার চোখও ছল ছল করছিল। বাস ধরে রোজের মতই বাড়ি ফেরা।

শুধু পরের দিন থেকে কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা পাল্টাবে।

চৌরাস্তার মোড় থেকে অটো নিতে হয়।

অটোয় তড়িঘড়ি বসে অরুণিমার খেয়াল হল তার পাশে কিঙ্কিণী বসে আছে।

সে একটু চমকাল, তারপর অচেনা মুখ করে বসল।

কিঙ্কিণী তাকে দেখা মাত্র উশখুশ করছিল।

অরুণিমা যেন সেটা দেখেই নি, এমন মুখ করে বসে রইল।

অটো চলতে শুরু করল।

খানিকক্ষণ পরে তার স্টপেজ এল।

অরুণিমা নেমে দেখল তার সঙ্গে কিঙ্কিণীও নামল।

সে সেটাও না দেখার ভাব করে হাঁটতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড পরে পিছন থেকে ডাক পড়ল, "দিদি একটু শুনবেন"।

অরুণিমা থমকে দাঁড়াল।

দেখল কিঙ্কিণী ডাকছে তাকে। দাঁড়াল, "হ্যাঁ বল"।

কিঙ্কিণী বলল, "আপনি এই পাড়াতেই থাকেন? আপনাকে দেখি নি কোন দিন"।

অরুণিমা হাসল, "হ্যাঁ, ওই তো, হলদে বাড়িটা"।

কিঙ্কিণীর মুখ ছাই হয়ে গেল। বলল, "আমি পিছনের পাড়ায় থাকি। প্লিজ দিদি, আপনি কিছু জানেন না, আপনি কিছু দেখেন নি"।

অরুণিমা বলল, "আমার সেটাই কাজ। নিশ্চিন্তে থেকো"।

কিঙ্কিণী যেন পালিয়ে বাঁচল।

অরুণিমা কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। সে জানত পৃথিবীটা বড্ড ছোট। তা বলে এতটা?

কিঙ্কিণী অনেকটা চলে গেছিল।

আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

অরুণিমা বলল, "কিছু বলবে?"

কিঙ্কিণী একটু ইতস্তত করে বলল, "সেদিন আমার ভীষণ ক্র্যাম্প হয়েছিল। ফার্স্ট টাইম তো। একবারে ফার্স্ট দিন তো বেরিয়েই গেছিলাম। এত ভয় করছিল। কিন্তু, ও আমাকে এতো ভালবাসে, না করতে পারি নি। তারপর অবশ্য নিজে এসে নামিয়ে দিয়ে গেছিল অটো স্ট্যান্ড অবধি। আজকেও নামিয়ে দিয়ে গেছে"।

অরুণিমা বলল "খুব ভালবাসে তোমায়?"

কিঙ্কিণীর মুখে আলো জ্বলল, "খুব"।

অরুণিমা হাসল, "আচ্ছা। ভাল থেকো। আমি কাউকে বলব না"।

কিঙ্কিণী লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

অরুণিমা শ্বাস ছেড়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

"যা ঘটে চলে, যা ঘটবে, ঘটতে দেব, আমরা কিছু জানি না, কিছু দেখি নি, কিছু শুনি নি"...

বহু ইচ্ছা থাকলেও কর্মক্ষেত্রের শেষদিনেও হোটেলের একটা নির্দেশিকা তাকে মেনে চলতেই হল... ওয়ার্ক এথিক্স বলে কথা...

মিতুর রাগ

মিতু রাগ করলে ওর নাক ফুলে যেত।
মিতুকে তখন নানা ভাবে আদরের কথা বলে সে রাগ কমাতে হত। আমি আদরের কথা শেখার জন্য একটা বই কিনব ঠিক করেছিলাম। কত আর নতুন নতুন আদরের কথা আমদানী করব।
শেষবার অবশ্য মিতুর রাগের ভ্যালিড কারণ ছিল।
আমি মিতুর জন্মদিনের তারিখ ভুলে গেছিলাম। গোটা দিন কথা বলেছি। রাতে ফোন রাখার সময় শুধু বলল, "ওহ্, তোকে একটা কথা বলি। আজ আমার জন্মদিন ছিল"।
বলে আমাকে আর কিছু না বলতে দিয়ে ফোনটা কেটে দিল। তারপর ইন্সটাগ্রাম বাদে সব জায়গা থেকে ব্লক। ভুলে গেছিল ওটায় ব্লক করতে।
আমি সেখানে কাকুতি মিনতি করতে শুরু করলাম। গোটা দিন কেটে গেল রিপ্লাই করল না। ফোন ধরল না। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বাদে দেখলাম ফেসবুকে আন ব্লক করেছে।
তারপরে আবার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ঝুলিয়ে রাখল সে দিনটা।
এগুলোর ব্যাপার আছে। রাগ না ভাঙালেও সমস্যা।
প্রথম প্রথম আমি মিতুর রাগ ভাঙাতাম না। তখন দেখা গেল, সে রাগ না ভাঙানোর জন্য আরেক প্রস্থ রাগ করে বসে থাকত। ধীরে ধীরে সব বুঝেছি। মিতুর রাগের কারণ একবার বুঝে গেলে সমস্যা হত না।
সমস্যা হত মিতুর রাগের কারণ না বুঝলে।
তখন আমাকে খাতা নিয়ে বসতে হত। লিস্ট করতে হত কী কী কারণে মিতু রেগে থাকতে পারে। সেই মত মিতুর রাগ ভাঙাতে আমাকে গেস করে যেতে হত।
"তুমি কেন রাগ করেছো? আমি নীল জামাটা পরেছিলাম বলে?"
"তুমি কি রাগ করেছো? কেন রাগ করেছো? বলবে না?"
"মিতু, কেন রাগ করলে? আমি ফোন ঘাঁটছিলাম বলে?"
উত্তর পাওয়া যেত না। তারপর অনেক প্রশ্ন টশ্ন করে জানা যেত, দুদিন আগে কিছু একটা বলেছিলাম, সেটা মনে পড়ে রেগে গেছে। সে রাগ ভাঙাতে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত।
যাই হোক, আসল কথা এগুলো নয়, আসল কথা হল, মিতুর সঙ্গে দেখা হল রাস্তায় গতকাল।
জামাইষষ্টীতে এসেছে। সঙ্গে ওর বর। মিতু আমার দিকে তাকাল না। অন্য দিকে মুখ করে চলে গেল।
বর ছিল বলেই হয়ত।
আমার খারাপ লাগে নি। একটু বুক চিন চিন করল এই যা।
বুক চিন চিন করার একটা ওষুধ আমি বের করেছি। বেশি করে দুধ দিয়ে কফি বানিয়ে তাতে ক্রিম বিস্কুট চুবিয়ে খেতে হয়। তাহলে খানিকটা বুকের ব্যথাটা কমে।
সমস্যা হল, এক প্যাকেট বিস্কুট শেষ করার পরেও ব্যথাটা গেল না। বরং বাড়তে থাকল।
একটা সময় সন্দেহ হল, মেডিকাল কেস হল নাকি?
আমি শুলাম। এপাশ ওপাশ করলাম।
লাভ হল না। দেখলাম কষ্ট হচ্ছে।
কোন মতে রাতটা ঘুমিয়ে সকাল হতেই সাইকেল নিয়ে মিতুদের বাড়িতে গিয়ে কলিং বেল বাজালাম।

মিতুর বাবা বেরিয়ে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে যেন ভূত দেখলেন। বললেন, "কী চাই?"
আমি বললাম, "মিতুকে চাই। মানে মিতুর সঙ্গে একটু কথা ছিল"।
ভদ্রলোক আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "মিতু বরের সঙ্গে এসেছে। তুমি কি ড্রামা করতে এসেছো কোন?"
আমি বললাম, "না। আমি একটা কথা বলতাম শুধু। আর কিছু না। সেরকম অসুবিধে হলে থাক কাকু"।
মিতুর বাবা আমার আপাদমস্তক দেখে বললেন, "ঠিক আছে, আমি মিতুকে পাঠাচ্ছি। দয়া করে কোন ঝামেলা তৈরী করবে না"।
আমি মাথা নাড়লাম।
কিছুক্ষণ পরে মিতু এল।
আমি বললাম, "রাগ করে আছো?"
মিতু ভ্রু কুঁচকাল, "মানে?"
আমি বললাম, "কী নিয়ে রাগ করে আছো বলবে না?"
মিতু বলল, "কেন রাগ করতে যাব তোমার উপরে?"
আমি বললাম, "রাস্তায় দেখা হল, অপরিচিতের মত চলে গেলে। রাগ কর নি? সত্যিই?"
মিতু বলল, "না। আশিষ আছে। তুমি বাড়ি যাও"।
আমি বললাম, "ঠিক তো? রাগ কর নি তো?"
মিতু একবার ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "না, রাগ করি নি। তুমি যাও"।
আমি বললাম, "যাক। নিশ্চিন্ত। তুমি রাগ করে আছো ভাবলে এখনও কেমন অস্বস্তি হয়। আসি"।
মিতু বলল, "অস্বস্তি হয় মানে?"
আমি বললাম, "একটা সময় তোমার রাগ গেস করে যেতাম তো! কেন রাগ করতে পারো, রাগ করার কারণটা কী, কাল আমাকে দেখে চিনতে পারলে না। ভাবলাম রাগ করেছো হয়ত। বাড়িতে গিয়েও অস্বস্তি হচ্ছিল। এখন রাগ কর নি জেনে অস্বস্তিটা কমল"।
মিতু থমথমে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কথা শোনাতে এসেছো?"
আমি বললাম, "না না। রাগ আছে নাকি দেখতে এসেছিলাম। আসি?"
বাড়ির পথ ধরলাম। এবার নিশ্চিন্তে ক্রিম বিস্কুট দিয়ে কফি খাওয়া যাবে।
মিতু দাঁড়িয়ে রইল।
আমার বেকার থাকার জন্য ছেড়ে যাওয়া জীবনের একমাত্র প্রেমিকা...

খেলোয়াড়

ইঙ্গিতের যে ফুটবল হবে না, তা তার বাবা শ্যামলবাবু ছোটবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলেন।

ছোট ইঙ্গিতকে খেলাতে মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক আশা ছিল ছেলে তার মত প্লেয়ার হবে। মাঠে নেমে দেখা গেল ইঙ্গিত নড়েও না, চড়েও না। তার নাকি দৌড়লেই পায়ে ব্যথা হয়।

শ্যামল মুষড়ে পড়লেন। ছেলে মামাবাড়ির ধাঁচ পেয়েছে। তার মত হয় নি।

কথাতেই আছে "নরানাং মাতুলাকৃতি"। ইঙ্গিতের বেলাতেও তাই হয়েছে। কী আর করা।

শ্যামলবাবু যৌবনে কলকাতায় ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল খেলেছেন।

স্ট্রাইকার ছিলেন।

গর্ব করে বলেন তিনি খেলার মাঠের লোক। এলাকার কারো সঙ্গে ইঙ্গিতের দেখা হলেই তাকে গল্প শুনতে হয় বাবা কী দুর্দান্ত সব গোল করত। বাবার পায়ে শট ছিল না। গোল কিপারকেও নাকি কাটিয়ে দুর্দান্ত সব গোল করত। একবার লিগের এক ম্যাচে বাবার ভয়ে গোল কিপার অবধি পালিয়ে গেছিল নাকি। সাতটা গোল করেছিল বাবা সে ম্যাচে। আট নম্বর গোলের সময় বল নিয়ে শ্যামল এগোচ্ছিলেন, সে দেখে গোল কিপার পালিয়ে যায়।

উল্টোদিকে শ্যামলবাবুর স্ত্রী গৌরী স্কুল টিচার। তাদের প্রেম করে বিয়ে।

কী করে যে এই জুটির বিয়ে হল সেটা ইঙ্গিত এখনও বুঝতে পারে না।

বাবার মুখ দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গালিগালাজ বেরিয়ে যায়, আর মা গালিগালাজের ঘোর বিরোধী। বাড়িতে কত বার যে বাবার গালাগালির জন্য দুজনের ঝামেলা হয়ে গেছে তা গুণে শেষ করা যাবে না।

যাই হোক, ইঙ্গিত বড় হয়ে পড়াশুনায় ভাল হল।

ভাল চাকরিও পেল।

কিন্তু খেলার দিকে আর গেল না।

শ্যামলবাবু ইপিএল, লা লিগা দেখেন। ইঙ্গিত তখন থাকলে গম্ভীর গলায় বলেন, "ছেলেটা অকালকুষ্মাণ্ড হল"।

ইঙ্গিত রেগে যায়। কিন্তু বাবার সঙ্গে কি আর ঝামেলা করবে?

উঠে অন্য ঘরে চলে যায়।

ভুঁড়ি বাড়ছে ইঙ্গিতের। অফিসে বসে চাকরি।

বাবা তার দিকে আজকাল তাকিয়ে যা তা বলে। মাও বলে। ইঙ্গিতের মন খারাপ হয়ে যায়। ঠিক করল সকালে উঠে মাঠে হাঁটতে যাবে।

এলাকার বেশ কিছু ছেলে মাঠে দৌড়া দৌড়ি করে।

ভোর পাঁচটার অ্যালার্ম দিয়ে শুয়েছিল। বিতিকিচ্ছিরি শব্দে ঘুম ভাঙলে উঠে অ্যালার্মটা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল। তারপর মিনিট দশেক পরে নিজে উঠে মাঠে গেল। বেশ কিছু ছেলে দৌড়চ্ছে। সে হাঁটতে শুরুল।

একটু হেঁটেই বুঝল কেউ হাঁটছে না পুরোটা সময়, একটু হেঁটে সবাই দৌড়য়। সে দৌড়নো শুরু করল।

আধ পাক দৌড়েই দম আটকে এল তার।

বাপরে! একী কষ্ট। রণে ভঙ্গ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

পাড়ার ছোটবেলার যারা বন্ধু ছিল, তারা আওয়াজ দিতে শুরু করল। "কী রে ভাই, ভুঁড়ি হয়ে একী অবস্থা হয়েছে? দৌড়ো দৌড়ো"।

ইঙ্গিত তাদের দিকে কটমট করে তাকাল। ছেলেরা দৌড়ে নিয়ে ফুটবল খেলতে শুরু করল।

তাকে ডাকতে লাগল, "ও দাদা, চলে এসো। আমাদের একজন কম আছে"।

ইঙ্গিত বাড়িতে কাজ আছে বলে বাড়ি চলে গেল।

শ্যামল প্রাণায়ম করছিলেন বাইরের ঘরে। তার ঘামে ভেজা টি শার্ট দেখে বললেন, "কী রে, আধ ঘন্টাও মনে হয় গেলি না, এর মধ্যে এই অবস্থা?"

ইঙ্গিত বলল, "প্রথম দিন তো। হবে"।

শ্যামল গজগজ করতে লাগলেন, "সব মামা বাড়ির মত পেয়েছে। আমার মত যদি কিছু হত"।

ইঙ্গিত ঘরে এসে হাঁফ ছাড়ল। কী কষ্ট।

২।

দ্বিতীয় দিন মাঠে গিয়ে ইঙ্গিত অবাক হল। মেয়েরাও যে এত শরীর সচেতন, আগে তো বোঝে নি!

মিলি পাশের পাড়ায় থাকে। ছোটবেলায় তার মৃদু ব্যথা ছিল মিলির ওপরে। কিন্তু কোন কালে বলতে পারে নি।

মিলি রীতিমত মাঠে দৌড়চ্ছে।

ইঙ্গিত মাঠে নেমে হাঁটতে লাগল। পাড়ার বন্ধুরা আগের দিন দেখেছে। এদিন আর বেশি কিছু বলল না। তবে মিলি একবার তাকে পেরিয়ে যাবার সময় সে দেখল মিলির মুখটায় কেমন যেন বাঁকা হাসি দেখা গেল। দ্বিতীয় পাকেও তাই।

ইঙ্গিত বুঝল তাকে দেখেই করছে এটা। সে দৌড়নোর চেষ্টা করল। আবার একই অবস্থা। খানিকটা দৌড়ে আবার থেমে গিয়ে ধীরে সুস্থে হাঁটতে লাগল।

মিলি দৌড় শেষে এক্সারসাইজ শুরু করল। ইঙ্গিতকে আজকেও ডাকল, "খেলবে?"

ইঙ্গিত মিলির কাছাকাছি ছিল। ইঙ্গিত "না" সূচক মাথা নেড়েই মিলির দিকে তাকাল। যেন হেসে গড়িয়ে পড়বে এবার। সে আর বেশিক্ষণ থাকল না। বাড়ি চলে গেল।

শ্যামলবাবু একইভাবে প্রাণায়ম করছিলেন। এবার আর কিছু বললেন না।

তিন চারদিন এভাবেই চলল। রোজ মিলি তাকে দেখে হাসে। সে জ্বলে যায়। কিছু বলতেও পারে না।

একদিন হাঁটছে। আগের থেকে একটু হাঁফ কম ধরছে।

মিলি হঠাৎ দৌড় থামিয়ে তাকে বলল, "আচ্ছা আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে, তুমিই সেই ছেলেটা না, আমি স্কুল যাওয়ার সময় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে?"

এরকম ভয়ংকর প্রশ্নে ইঙ্গিত বেজায় ঘাবড়ে গেল। মিলি তো ঠিকই বলছে। সে দাঁড়িয়ে থাকত। এখন গম্ভীর মুখে দাড়ি চুলকে বলল, "আমার মনে নেই। আপনাকে তো এই মাঠেই প্রথম দেখছি"।

মিলি চোখ বড় বড় করে বলল, "তাই নাকি? তো রঞ্জনকে চেনো? তাকে দিয়ে একবার বলিয়েছিলে না? সেটাও ভুলে গেছো?"

ইঙ্গিতের সব মনে পড়ে গেল। কী সর্বনাশ! তাই তো! রঞ্জনকে বলেছিল মিলিকে বলার জন্য কিন্তু রঞ্জন বলেছিল ওকে নাকি মিলি বলেছিল ওর বয়ফ্রেন্ড আছে। সে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় পড়ল।

ঠিক এই সময় তাকে ফুটবলের ছেলেগুলো বাঁচাল। ডাকল, "ও দাদা, খেলবে আজকে?"

ইঙ্গিত মিলির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি খেলতে যাই বুঝলেন? পরে কথা হবে। বাই"।

মিলিকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ইঙ্গিত ফুটবল খেলতে দৌড়ল।

এ দিন মিলির প্রশ্নবানে তার বুক ধড়ফড় করছিল। রঞ্জন যে বলে দেবে সে ভুলেও ভাবতে পারে নি। একটা বেঁটে মত ছেলে খুব দৌড়চ্ছিল। রঞ্জনের কথা ভাবতে ভাবতেই সে বেঁটে ছেলেটার থেকে অবলীলায় বলটা কেড়ে নিল। পাড়ার বঙ্কার পায়ে খুব জোর। জোরে জোরে ট্যাকেল করে। ইঙ্গিতের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইঙ্গিত যেন বঙ্কাকে দেখলই না, হালকা একটা লাফ দিল বলটা নিয়ে, বঙ্কা কেটে গেল।
সবার মধ্যেই সে রঞ্জনকে দেখতে পাচ্ছিল। কী শয়তান, কী শয়তান ছেলে! বলবে না বলে আসলে বলে দিয়েছে? আর তাকে বেমালুম ঢপ মেরে দিয়েছে! একী?
সামনে শুধু গোল কিপার। তার দিকে এগিয়ে আসছে। ইঙ্গিত অনায়াসে তাকে কাটিয়ে বলটায় আলতো টোকা মারল পা দিয়ে। বলটা আপনমনে গিয়ে গোলের মধ্যে ঢুকে গেল। গোটা মাঠ প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেল।
তারপরে সবাই এসে ইঙ্গিতকে জড়িয়ে ধরল। "এ কী গোল করলে গো! তুমি খেলো না কেন?"
ইঙ্গিতের সম্বিত ফিরল এতক্ষণে! তার চোখ গেল মিলির দিকে। দেখল মিলি হাততালি দিচ্ছে। সে খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলল, "আমার অফিস আছে, আমি বাড়ি যাই"।
বাকি ছেলেগুলো হতাশ হয়ে বলল, "বাড়ি চলে যাবে?"
ইঙ্গিত বলল, "হ্যাঁ। অফিস আছে", কেউ আর কিছু বলল না।
কিন্তু আসল টুইস্টটা তখনও বাকি ছিল। ইঙ্গিত দেখল মাঠের এক কোণে বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে। সে দৌড়ে বাবার কাছে গিয়ে বলল, "তুমি কী করছিলে?"
শ্যামল হাসতে হাসতে বললেন, "বাঁড়া, বাপের জিন। যাবে কোথায়"? বলেই জিভ কাটলেন। চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর মা নেই তো?"
ইঙ্গিত হো হো করে হেসে ফেলল।
#
ফুলশয্যার রাতে ইঙ্গিত মিলিকে জিজ্ঞেস করল, "রঞ্জন তোমাকে বলেছিল আমি তোমাকে ভালবাসি?"
মিলি বলল, "না তো। বলেছিল ও আমাকে ভালবাসে। শুনে জুতো নিয়ে তাড়া করেছিলাম"।
ইঙ্গিত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "তাহলে সেদিন যে বললে..."
মিলি ফিক করে হেসে বলল, "সেটা তো পিওর গেস ওয়ার্ক ছিল, দাঁড়িয়ে থাকতে কী রকম হাঁদারামের মত"।
ইঙ্গিত মাথা চুলকাল। তার রাগার দরকার। কিন্তু রাগলে মিলিকে আদর করা যাবে না। আদর না করা গেলে মুড ভাল হবে না।
মুড ভাল না থাকলে অফিস লীগের খেলায় ভাল খেলতেও পারবে না।
টিমকে চ্যাম্পিয়ন করতে হবে তো।
বাবার মত!

গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন

-আপনাকে একটা কথা বলতে পারি?

-বলুন।

-আপনি বাড়ি থাকেন না কেন?

-মানে?

-মানে জানেনই তো এখন চারদিকে কোভিড কেস কত বেড়ে গেছে। আপনার তো বাড়ি থাকা উচিত।

-আপনি কি জনে জনে লোককে সচেতন করে বেড়ান?

-না, আপনাকেই করলাম।

-কেন আমাকে করলেন কেন?

-আপনাকে দেখলেই আমার কোভিডের সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয় বলে!

-মানে?

-মানে আপনাকে দেখলে আমার কেমন জ্বর জ্বর লাগে, গলার কাছটা কেমন ব্যথা ব্যথা করে, শ্বাসকষ্ট হয়, মনেও কষ্ট হয় যে কোন দিন তো আপনাকে প্রপোজ করে উঠতে পারব না। এ সবই তো কোভিডের সিম্পটম, তাই না?

-হাউ রাবিশ। আপনি কি পাগল?

-হ্যাঁ, আমার নিজেরও তাই মনে হয়। যেদিন থেকে আপনাকে দেখেছি আমার নিজেকে পাগল পাগলই মনে হয়। তারপরে যখন দেখছি আপনি এই সময়েও বেরোচ্ছেন, আপনাকে ডেকে বলে দিলাম। এখন ঘরে থেকে নিজেও ভাল থাকুন, আমাকেও ভাল থাকতে সাহায্য করুন।

-শুনুন।

-বলুন।

-আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। যত্তসব ভুল ভাল লোক।

-ভুল ভাল লোক তো বটেই। ঠিক ঠাক লোক কী করে হতে পারব বলুন? যেদিন থেকে আপনাকে দেখেছি, মনে হচ্ছে আমার মাথার কলকবজা সব নড়ে গেছে। আমি আর নিজের মধ্যে নেই। আমি যেন একটা মানুষই না।

-মানুষ তো ননই। নইলে রাস্তায় মেয়েদের টিজ করার সাহস পান কোত্থেকে? আমি লোক ডাকব?

-দেখুন, ভাল মানুষীর কোন জায়গাই নেই এই পৃথিবীতে। আপনাকে আমি টিজ করলাম বুঝি? আপনার সেটা মনে হল? কাউকে ফোন করলেও এখন তিন মিনিটের জ্ঞান শুনতে হয়, আপনাকে আমি একটা এগারো সেকেন্ডের ছোট্ট কথা বললাম আপনার এবং আমার স্বার্থে, সেটা টিজ হয়ে গেল? নেহাত আমার নাক আজকে সুরসুর করছে না, নইলে এই মুহূর্তে দুটো হাঁচি দিলে তো আপনি বলে বসতেন আমি পরিবেশ দূষণ করছি।

- সে বলতেই পারি। আপনার যদি সে সব সেন্স থাকত তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলতেও আসতেন না। সরুন, আমাকে যেতে দিন।

-বলছি, আপনাকে দেখি বাজার করতে যেতে। এত কষ্ট করার কিছু নেই। আমিই বাজার দিয়ে আসতে পারি। ছোটখাটো ব্যবসা করি, বাবা মার একা ছেলে, সম্বন্ধও দেখতে বলছে মা, এদিকে আমি আবার একটু

হিসেবী বুঝলেন তো, চিন্তা করে দেখলাম এই মুহূর্তে বিয়ে হলে পঞ্চাশ জন লোকের বেশি খাওয়াতে হবে না। আপনাদেরও সেফটি, আমাদেরও সেফটি। সে টাকাটা মিউচুয়াল ফান্ডে খাটিয়ে দেব, ছেলে মেয়ে বড় হলে ওদের কাজে লাগবেন। কী বলেন?

-আপনি উন্মাদ।

-বিয়ের প্রস্তাব দিলে যদি উন্মাদ হয়, তাহলে পৃথিবীর সব প্রেমিকই উন্মাদ। আপনার বাড়িতে বাবা আছেন, মা আছেন। আপনি একা মেয়ে। আমি ভাল মানুষ। সৎ মানুষ। বিশ্বাস না হলে খোঁজ নিয়ে দেখুন।

-এই, আপনি স্টক করেন আমায়?

-আপনাকে কী করে স্টক করব? স্টক তো আমার ব্যবসার জিনিস করি। আপনি কি স্টক করার জিনিস?

-দূর। স্টক মানেও জানেন না? অশিক্ষিত নাকি?

-শিক্ষা ব্যবস্থা তো সেদিনই ডকে উঠেছিল যেদিন স্কুলের শিক্ষকরা পড়ানোর জায়গায় চাল ডাল কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমাকে আর দোষ দিয়ে কী করবেন বলুন?

-এই আপনি যান তো।

-কোথায় যাব?

-আমার বাড়িতে যান। আমার বাবা মার সঙ্গে কথা বলুন। ওদের গিয়ে জ্বালান। আমাকে রেহাই দিন।

-মানে? আপনি রাজি? বিয়ে করবেন?

-হ্যাঁ করব। আপনার আমাকে দেখলে করোনার লক্ষণ দেখা যায় তো? সব লক্ষণ স্যানিটাইজার দিয়ে ধুয়ে দেব।

-খেয়েছে, এ কি খাল কেটে কুমীর আনলাম নাকি?

-আজ্ঞে!

-মরেচে!

সারপ্রাইজ

কুয়াশা ঘিরে এসেছে পাহাড়ে। বৃষ্টিও হচ্ছে।
হুইস্কির একটা বোতল শেষ হয়ে গেছে।
নীল, অনিন্দিতা, রুদ্র আর তানিয়া হোটেলের ব্যালকনিতে চেয়ারে বসে আছে।
সন্ধ্যে নেমেছে।
চারজনই কলেজ সবে পাস আউট হয়েছে। বাড়িতে মিথ্যে বলে আসতে হয়েছে অনিন্দিতা বাদে সবাইকে।
দুটি কাপল।
নীল আর অনিন্দিতা।
রুদ্র আর তানিয়া।
চারজনেই নেশাগ্রস্থ।
দার্জিলিঙে এসে উঠেছে সস্তার একটা হোটেলে। বেরোতে পারে নি কেউই। ম্যালে গিয়ে সেলফি তুলতে তুলতেই বৃষ্টি নেমে গেছে। দৌড়ে এসে ঘরে পৌঁছে হোটেলের বয়কে দিয়ে সস্তার মদ আনিয়েছে। চারজনই ক্যাম্পাসিঙে চাকরি পেয়েছে।
নীল সিগারেট ধরাল। অনিন্দিতা হাফ প্যান্ট পরে আছে। সিগারেট ধরিয়ে অনিন্দিতার প্যান্টের ভিতরে হাত গলাতে গেল, অনিন্দিতা নীলকে চড় মারল একটা।
নীল বলল, "এরকম করছিস কেন? একদিন তো বিয়ে করবই"।
অনিন্দিতা বলল, "সব খানে সব জিনিস করা যায় না, কবে শিখবি"?
নীল বলল, "শেখার কিছু নেই তো। লাইফ ইজ ভেরি সিম্পল। বিয়ে করলে হ্যাপি কাপল, না করলে মিটু খাব। এই তো? মিটু দিবি তো?"
অনিন্দিতা বলল, "স্টপ টকিং রাবিশ। আমি কেন তোকে মিটু দেব?"
তানিয়া বলল, "আমার আজকাল রুদ্রকে পোষায় না। পার্টনার সোয়াপিং করি চ"।
অনিন্দিতা বলল, "তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে তানি। তুই গিয়ে ঘুমিয়ে পড়"।
তানিয়া বলল, "কেন মাথা খারাপ হবে? মদ খেলে কবে আমার মাথা খারাপ হয়েছে? আমি খুব ঠান্ডা মাথাতেই কথাটা বললাম। পার্টনার সোয়াইপ করি। সেক্সই তো। আর কিছু না। কী হবে?"
অনিন্দিতা এলিয়ে শুয়ে ছিল। উঠে বসে নীলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর এই ব্যাপারে কী মত?"
নীল বলল, "আমি কী জানি? তুই কী চাস সেটা বল"।
অনিন্দিতা বলল, "তোর ইচ্ছা আছে? তোদের মধ্যে কিছু একটা চলছে, আমার সন্দেহ হয়েছে আগেই। সত্যি করে বল"।
রুদ্র মদ খেলে কম কথা বলে। সব শুনে যাচ্ছিল চুপ করে।
তানিয়া বলল, "আমার তোকে দেখলে কিছু হয় না। নীলকে দেখলে হয়। ইফ হি ওয়ান্টস মি, আই ক্যান স্পেন্ড আ নাইট উইথ হিম"।
অনিন্দিতার নেশা কেটে গেছিল। সে উঠে তানিয়ার চুলের মুঠি ধরে বলল, "কী বলছিস তুই বিচ? কী দাবী তোর?"
তানিয়া বলল, "এক রাত তো অনি। স্পেয়ার হিম। কাল থেকে ও আবার তোর হয়ে যাবে"।

অনিন্দিতা নীলের দিকে তাকাল, “তুই রাজি?”
নীল অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল। উত্তর দিল না।
সে বলল, “তার মানে রাজি। শুয়োরের বাচ্চা। তোদের মধ্যে আমাকে লুকিয়ে কিছু চলে তার মানে। ঠিক আছে, যা। যা তানিয়া, তুই আর নীল আমাদের রুমে যা। আমি কিছু বলব না”।
তানিয়ার চুলে লেগেছিল। তবু সে অনিন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলল, “আর ইউ শিওর?”
অনিন্দিতার মাথা কাজ করছিল না, সে কোন মতে বলল, “শিওর। বাট এটা এখানেই শেষ হল। জাস্ট গো টু হেল”।
তানিয়া নীলের হাত ধরে টেনে তুলল। নীল একবারও অনিন্দিতার দিকে তাকাল না। তানিয়া নীলের হাত ধরে রুমের ভিতর নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।
পুরো ব্যাপারটা অনিন্দিতার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। নেশা কেটে গেছিল তার। সে চুপ করে ব্যালকনিতে বসে রইল।
রুদ্র রেলিঙে ঠ্যাঙ তুলে দিয়ে বলল, “তানিয়ার বরাবরই নীলকে পছন্দ। ওরা দুজনেই সেক্সুয়ালি খুব অ্যাক্টিভ। তোর যেমন সব সময় ইচ্ছা করে না,তানিয়ার তেমনি আমাকে পছন্দ না। খানিকটা জোর করেই চলছিল ক’দিন ধরে। এভাবে শেষ হল। প্রবলেম হচ্ছে?”
অনিন্দিতা কেঁদে ফেলল। বলল, “এক বছরের সম্পর্ককে এভাবে শেষ করতে পারে কেউ? মা ঠিকই বলছিল, কলেজ এক্সকারসানের নামে এসব করিস না”।
রুদ্র অবাক হয়ে বলল, “তোর মাকে সব বলিস?”
অনিন্দিতা বলল, “বলি তো। কেন বলব না?”
ওদের রুম থেকে তানিয়ার শীৎকারের শব্দ আসতে লাগল। রুদ্র হাসল, “এটা তোকে জ্বালানোর জন্য করছে। অ্যাকচুয়ালি আমার আর তানিয়ার ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছিল আগেই। বাদ দে, জাস্ট লিভ দেম। বৃষ্টিটা থেমেছে। চ একটু হেঁটে আসি”।
অনিন্দিতা বলল, “আমার ভাল লাগছে না। তার ওপর শর্টস পরে আছি”।
রুদ্র উঠে অনিন্দিতার হাত ধরে টানল, “চল, ওই পরেই চল। এখানে থাকলে খুন খারাপি করে দিবি তুই। চল”।
খানিকটা ইতস্তত করে অনিন্দিতা উঠল। হোটেল থেকে রাস্তায় নামল দুজন।
ভিজে আছে পথ ঘাট। রাস্তায় লোক গিজ গিজ করছে।
রুদ্র বলল, “আমাকে একটা কথা সিরিয়াসলি বল অনি, তুই কি সত্যি নীলকে বিয়ে করতিস?”
অনিন্দিতা কান্নামাখা গলায় বলল, “আমি জানি না”।
রুদ্র বলল, “তাহলে এমন ক্ষেপে গেলি কেন?”
অনিন্দিতা বলল, “আমি এখনই বুঝলাম, তানিয়ার সঙ্গে নীলের কিছু একটা চলছিল বলে। মিথ্যা বলার কী দরকার ছিল, পার্টনার সোয়াপিং এর নাটক করার কী দরকার ছিল? আমার যদি সব সময় ফিজিক্যাল হতে ভাল না লাগে, তাহলে আমি কী করব?”
কেভেন্টারসের সামনে পৌঁছে গেছিল ওরা। রুদ্র বলল, “চ। ছাদে বসে পকোড়া খাই”।
অনিন্দিতা বলল, “টাকা নেই ভাই। এখানে আসতে টাকা জোগাড় করতেই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল। আবার কোত্থেকে পাব?”
রুদ্র অনিন্দিতার হাত ধরে টানল, “আমি খাওয়াব, আয়”।
দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উঠল কেভেন্টারসের ছাদে। একটা টেবিল ফাঁকা আছে। দুজনে বসল।

রুদ্র বলল, "গত তিন মাস ধরে ওরা ডেট করছে। আমি এখানে আসার আগেই জেনেছি। এখানে আমাদের চার বন্ধুর আসার প্ল্যানটা আমার ছিল। যেদিন প্ল্যান করলাম, তার পরের দিন জানলাম। রাগ করি নি। কিন্তু তার পর থেকে তানিয়াকে আর ছুঁইও নি। তোকেও কিছু বলি নি। কী হবে বলে? জানলে কী হবে? জোর করে কিছু হয়?"

অনিন্দিতা চমকে বলল, "মানে? তুই জানতিস?"

রুদ্র হাসল।

অনিন্দিতা বলল, "আমাকেই সব শেষে জানতে হল?"

রুদ্র বলল, "ভালবাসা না থাকলে জেনেই আর কী করবি অনি? একটা ব্যর্থ সম্পর্কে জোর করে টিকে থাকার থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যা। পকোড়া খাই। খেয়ে বাজার টাজার দেখি। ওরা ওদের মত থাকুক। তুই তোর মত থাক। নীল তোকে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড ভেবে নিয়েছিল আর তানি আমাকে। ওদের জন্য কাল একটা ছোট্ট সারপ্রাইজ রেখে দেব"।

অনিন্দিতা বলল, "কী?"

রুদ্র হাসল, "দেখাই যাক"।

#

সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে নীল টের পেল রুদ্র আর অনিন্দিতা চেক আউট করে চলে গেছে। তাদের ট্যুরের সব টাকা পয়সা রুদ্রর কাছে রাখা ছিল। নীল বা তানিয়া কারো কাছেই হোটেলের টাকা দেওয়ার টাকা বা কার্ড কিছুই নেই...

ভয়

“দীঘির ধারে যাবেন না। ও জায়গা ভাল না”।

আরতির মুখে কথাটা শুনে অবাক হল প্রবীর আর অনন্যা দুজনেই। অনন্যা বলল, “কেন রে? কী আছে দীঘির ধারে?”

আরতি কেয়ারটেকার তারকের মেয়ে। তার বয়স তেরো চোদ্দ হবে।

যখন থেকে প্রবীর আর অনন্যা এ জমিদার বাড়ি বেড়াতে এসেছে, আঠার মত লেগে আছে। বর্ধমান পেরিয়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে খানিকটা গিয়ে যে রাস্তা ডান দিকে ঢুকে যায়, সে রাস্তায় ঢুকে আরও দু ঘন্টা ভাঙা চোরা রাস্তা পেরিয়ে এ জমিদার বাড়ি পরে। প্রবীর গাড়ি কিনেছে গত মাসে। দুজনের বিয়ের দু মাস হল।

উইকেন্ডে অফ বিট জায়গা খুঁজছিল দুজনেই। অফিসের এক কলিগের কাছে শুনে রাসপুর নামের গ্রামে বেড়াতে এসেছে তারা। শনিবার থেকে রবিবার চলে যাবে। শনিবার বেলা বারোটার মধ্যেই পৌঁছে গেছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জমিদার বাড়ি, রাজবাড়িতেই এখন থাকা খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। রাসপুরের জমিদারবাড়ি কম পরিচিত। তবে দুজনেই একমত হয়েছে, এ বাড়ি খুবই ভাল মেইন্টেন্ড। তাদের জন্য একটা বড় ঘর খুলে দেওয়া হয়েছে। দুপুর বেলা বাড়ির লোক জন বেশ ভাল খাওয়া দাওয়া করাল।

থালা সাজিয়ে দিয়েছিল গোবিন্দভোগ চালের ভাত, সোনামুগের ডাল, লম্বা লম্বা করে কাটা বেগুনভাজা, ভেটকির ঝোল, খাসীর মাংসের লাল লাল ঝোল, চাটনি, পায়েস, রাজভোগ। আরতির কাছ থেকেই জানতে পারল শীতকালে এ বাড়ি তে একটা ঘরও ফাঁকা যায় না। বর্ষাকালটা সমস্যা করে। লোকজন কম আসে।

প্রবীর বলল, “ভালই হল। আমরা বেশি ভিড় চাই নি”।

আরতি বলল, “লোক থাকা ভাল। কম লোক ভাল না”।

আরতি এরকমই কথা বলে। বেশিরভাগ কথাই বোঝা যায় না।

এই যেমন বিকেলের দিকে দুজন ভাবল ঘুরতে বেরোবে, হঠাৎ এসে বলে বসল “দীঘির ধারে যাবেন না”।

অনন্যার প্রশ্নের উত্তরে আরতি বলল, “অনেক কিছু আছে”।

প্রবীর বলল, “ধুস। এখানে আর কিছু দেখার আছে? একটু ঘুরেই চলে আসি”।

আরতি একবার তাদের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জমিদার বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

অনন্যা বলল, “মেয়েটা কেমন অদ্ভুত না?”

প্রবীর বলল, “হ্যাঁ। একদিকে ভালই হয়েছে। সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে চললে, আমাদের রোম্যান্সটা বড্ড কম হয়ে যায়”।

অনন্যা প্রবীরকে চিমটি কেটে বলল, “কত রোম্যান্স কর তুমি, হুহ। সারাক্ষণ শুধু একটাই তালে আছো। কখন দরজা বন্ধ করবে”।

প্রবীর অনন্যার পেটে টোকা মেরে বলল, “সে তো করবই। কেন করব না? তোমার ভাল লাগে না?”

অনন্যা চারদিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে বলল, “এসব কী? কেউ দেখে ফেলবে”।

প্রবীর বলল, “ভাগ। শুধু ভয়। নিজের বউকে ধরব না তা কি অন্যের বউকে ধরব?”

অনন্যা মুখ বেঁকিয়ে বলল, “হয়েছে। চল তো হেঁটে আসি। বাবা, এত খাওয়ার পরে আর সুস্থ থাকা যায়? শরীরটা কেমন আইঢাই করছে। রাতে নাকি আবার লুচি, ছোলার ডাল। পেট ছাড়লে জানি না”।

প্রবীর হাসল, “ঠিক আছে। সারারাত জেগে হজম করিয়ে দেব”।
অনন্যা ঠেলল প্রবীরকে, “এ তুমি সারাক্ষণ এক জিনিস নিয়ে ভাবো কেন বল তো? পৃথিবীতে আর কোন বিষয় নেই?”
দুপাশে গাছ। মাঝে ছোট পায়ে চলা পথ। একজনের পিছনে আরেকজন যাচ্ছিল। আগে অনন্যা, পরে প্রবীর। প্রবীর পেছন থেকে অনন্যাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “নেই”।
অনন্যা হেসে উঠল। কয়েক মিনিট হাঁটার পর তারা দীঘির সামনে এসে পৌঁছল। সুন্দর বাঁধানো ঘাট। জল টল টল করছে। পরিচ্ছন্ন দীঘি। প্রবীর বিস্ময় সূচক শব্দ করে বলল, “কী সুন্দর জায়গা। আর আরতি নাকি আমাদের আসতে বারণ করছিল। ঈশ, আগে বুঝলে ডিএস এল আরটা নিয়ে আসতাম। তোমার ভাল ভাল ছবি তুলে দিতাম”।
অনন্যা ঘাটের সিঁড়িতে বসে বলল, “তা আনবে কেন? তোমার তো আসল জিনিসগুলোই মনে থাকে না”।
প্রবীর বলল, “ফোনেই তুলি, কী বল?”
অনন্যা বলল, “তোল”।
ফটো তোলা শুরু হল দুজনের। কখনও সেলফি। কখনও প্রবীরের একার। নির্জন দীঘির ঘাট দুজনের হাসি ঠাট্টার শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল।
কিছুক্ষণ পরে আরতি এসে হাজির হল।
প্রবীর বলল, “কী রে, তুই যে বললি এখানে না আসতে? কী আছে এখানে?”
আরতি হেসে বলল, “এমনিই বলেছি”।
অনন্যা বলল, “কী যে বলিস তুই। পাগলী একটা। এতক্ষণ কী করছিলি?”
আরতি বলল, “নৌকা চড়বে?”
প্রবীর বলল, “আজ থাক। সন্ধ্যে নেমে যাবে”।
অনন্যা বায়না ধরল, “চল না, প্লিজ। কী আছে? এই আরতি, নৌকা কোথায়?”
আরতি বলল, “আসছি”।
বলে আবার হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলে গেল।
প্রবীর বিরক্ত গলায় বলল, “উটকো বায়না ধর কেন? কী দরকার ছিল এখন নৌকা চড়ার?”
অনন্যা বলল, “তুমিই বা এত আপত্তি তুলছো কেন? তুমি কি সাঁতার জানো না?”
প্রবীর বলল, “না জানি না”।
অনন্যা বলল, “আমি তো জানি। চিন্তা করছো কেন?”
প্রবীর বলল, “এখানে লোক জন নেই তেমন, এটা ঠিক বোটিং করার জায়গা লাগছে না, যাই বল”।
অনন্যা বলল, “শহরে থেকে থেকে তোমার মাথা গেছে। কিছুই ভাল লাগে না। চুপ চাপ থাকো তো। এই সেলফি তুলি আসো ছাতিম গাছটার তলায়”।
দুজনে মিলে সেলফি তুলতে শুরু করল আবার।
মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটা নৌকা দেখা গেল দীঘির অপর পাড় থেকে আসছে। নৌকা চালাচ্ছে আরতি।
অনন্যা বলল, “এই দেখো, এই টুকু মেয়ে নৌকা চালাচ্ছে, আর তুমি ভয়েই মরছ”।
প্রবীর রেগে গিয়ে বলল, “ভয় পাওয়ার নেই? বরং ও না চালিয়ে কোন মাঝি চালালেই ভাল হত। এ মেয়ে কী নৌকা চালায় কে জানে”।
অনন্যা বলল, “ওরা লোকাল লোক। অভ্যেস আছে। তোমাদের মত শহুরে পুতুপুতু টাইপ না”।

আরতি নৌকা ঘাটে লাগাতে অনন্যা সিঁড়ি দিয়ে নেমে নৌকায় উঠল। পিছন পিছন ব্যাজার মুখে প্রবীর। অনন্যা বলল, "কীরে আরতি, তোর তো খুব ক্ষমতা। নৌকা চালাতে পারিস? আর কী কী পারিস? ঘোড়াও চালাতে পারিস মনে হয় বল?"
আরতি লাজুক হেসে দাঁড় টানতে শুরু করল।
বিরাট দীঘি। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দেখা যায় না। মাঝে আবার চর জেগে আছে। তাতে ছোটখাটো জঙ্গল।
পড়ন্ত বিকেলের আলো পড়ছে দীঘির জলে। মায়াবী আলো। চারদিকে গাছপালার ছায়া পড়ে জলটাকে কালচে করে দিচ্ছে। অনন্যা সেলফি তোলায় ব্যস্ত হয়ে বলল, "অসাধারণ জায়গা। আবার আসব। উফ। কী সুন্দর। থ্যাঙ্ক ইউ এখানে নিয়ে আসার জন্য"।
প্রবীর মুখ ঘুরিয়ে বলল, "হু"।
আরতি বলল, "ওই যে চর দেখছো না, ওখানে এক জমিদার গিন্নীর লাশ পাওয়া গেছিল। কে নাকি খুন করে রেখে গেছিল ওখানে"।
অনন্যা উৎসাহিত গলায় বলল, "ঈশ, এক্কেবারে গা ছমছমে ব্যাপার তো রে। তুই কোত্থেকে জানলি?"
আরতি বলল, "বাবা বলেছিল"।
অনন্যা বলল, "কবেকার ঘটনা?"
আরতি বলল, "সে অনেক আগের। আমাকে গল্প বলে বাবা। তখন শুনেছি। তবে বাবা বলে সেই জমিদারই নাকি তার বউকে মেরে ওখানে ফেলে রেখে এসেছিল। জমিদার কোথাকার এক বাঈজীকে বিয়ে করেছিল বলে খুব ঝামেলা লেগেছিল"।
অনন্যা প্রবীরের হাত চেপে ধরে বলল, "শুনছো? আমরা দারুণ বাড়িতে থাকতে এসেছি। এ হাউজ ফুল অফ কেচ্ছা কাহিনী। আহা। আর তুই কী সুন্দর দাঁড় বাইছিস রে মেয়ে! আমাকে শিখিয়ে দিবি?"
আরতি বলল, "দেব। আবার আসবে তোমরা?"
অনন্যা বড় করে ঘাড় নাড়ল, "আসব। কী যে ভাল লাগছে। কাল ভোরে আবার আসব"।
প্রবীর রাগী গলায় বলল, "হ্যাঁ, সারাদিন দাঁড় বেয়েই কাটিয়ে দাও"।
অনন্যা হাসতে লাগল। বলল, "আর কোন কেচ্ছা নেই? এই মেয়ে?"
আরতি চিন্তিত মুখে বলল, "ভেবে বলতে হবে। শুধু জমিদার বাড়িতেই কি কেচ্ছা থাকে? সব বাড়িতেই থাকে। তোমার বরেরও কেচ্ছা আছে"।
অনন্যা এতক্ষণ হাসছিল। এ কথাটা শুনে সে অবাক হয়ে বলল, "মানে?"
আরতি খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল, "জিজ্ঞেস কর"।
প্রবীরের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পরক্ষণেই সে রেগে গিয়ে আরতিকে বলল, "কী বলছিস? একটা চড় মারব"।
অনন্যা প্রবীরের হাত চেপে ধরে আরতির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বলতে চাইছিস বল"।
আরতি বলল, "বললাম তো, কেচ্ছা সব বাড়িতেই থাকে। জানতে হয়, খুঁজতে হয়। বুঝতে হয়"।
বিচ্ছিরিভাবে হেসে উঠল আরতি।
অনন্যা প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী কেচ্ছা তোমার?"
প্রবীর বলল, "কী বাজে কথা বলছ? আমার আবার কেচ্ছা কীসের?"
অনন্যা বলল, "বল, নইলে আমি কিন্তু জলে ঝাঁপ দেব"।
আরতি হেসেই চলেছে।

প্রবীর আরতির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মেয়ে, কী বলে যাচ্ছিস?"
অনন্যা বলল, "তুমি বলবে না আমি ঝাঁপ দেব?"
প্রবীর বলল, "বলছি তো কিছু নেই আমার। এ মেয়ে ভাট বকছে"।
অনন্যা বলল, "না, তোমাকে বলতেই হবে। বল"।
প্রবীর বলল, "তুমি আমায় বিশ্বাস না করে একটা অচেনা মেয়েকে বিশ্বাস করছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"
অনন্যা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ দীঘির পাড় থেকে একটা গলা ভেসে এল, "ও দাদা, ও বৌদি, কোথায় যাচ্ছো তোমরা?"
দুজনেই চমকে দীঘির পাড়ে তাকাল, যা দেখল তাতে দুজনেরই বুক শুকিয়ে গেল। পাড়ে আরতি দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে দুজনে সে দিকে তাকাল।
জলে ঝপ করে একটা শব্দ হল।
দাঁড় এখন আর কেউ বাইছে না। কোত্থেকে একটা মারাত্মক দমকা হাওয়া এসে তাদের ধাক্কা মারল। নৌকাটা টলতে টলতে পালটি খেয়ে গেল।
অনন্যা আর প্রবীর দুজনেই জলে পড়ে গেল। অনন্যা যাও বা সাঁতার কাটতে চেষ্টা করছিল, প্রবীর তাকে জাপ্টে ধরল। দুজনেই তলিয়ে যাচ্ছিল।
খিলখিলিয়ে হাসির শব্দ আসছে কোনখান থেকে। জ্ঞান হারানোর আগে অনন্যা স্পষ্ট শুনতে পেল তার কানে একজন বলছে, "তোর বর তোকে লুকিয়ে কার সঙ্গে কথা বলে রে?"
#
দুজনের জ্ঞান ফিরল যখন, তখন সন্ধ্যে গড়িয়েছে।
কপাল ভাল নৌকাডুবি চরের কাছে হয়েছিল। চরে পড়ে ছিল দুটো শরীর।
আরতি জমিদার বাড়ি থেকে লোক নিয়ে এসেছিল। আলোর ব্যবস্থা করে সবাই মিলে পাড়ে নিয়ে এসেছে দুজনকে।
সবাই অবাক গলায় একই কথা বলছে, "কীভাবে বেঁচে গেল?"
আরতি গম্ভীর মুখে শুধু বলল, "বারণ করেছিলাম এখানে আসতে"।
আর কেউ কিছু বলল না। যেন সবাই সব কিছু জানে, শুধু কিছু বললে বড় কোন শাস্তি হয়ে যাবে।
দুজনকে ধরা ধরি করে জমিদারবাড়ি নিয়ে যাওয়া হল।
স্থানীয় ডাক্তার এসে দেখে জানিয়ে গেলেন ভয়ের কিছু নেই।
জ্ঞান ফেরার পর থেকে অনন্যা পুরো সময়টাই গম্ভীর হয়ে রইল। প্রবীর যতবার কথা বলতে গেল কিছু বলল না।
#
রাতে খাবার পরে দরজা বন্ধ করে অনন্যাকে ছুঁতে যেতেই অনন্যা বলল, "আমাকে লুকিয়ে তুমি কার সঙ্গে কথা বল?"
ঘরের বাইরে থেকে বিকেলের সেই খিলখিল করা হাসিটা ভেসে এল।
এখন অনন্যা আর ভয় পেল না।
প্রবীর পেল... কারণ সে স্পষ্ট দেখতে পেল অনন্যার পিছনে আরেকজন এসে দাঁড়িয়েছে...

শান্তি বর্ষিত হোক

অফিসের কাজের সূত্রে লস এঞ্জেলসে রূপমের দু মাস হয়ে গেল। প্রথম প্রথম সমস্যা হলেও মাস খানেকের মধ্যেই মানিয়ে নিতে পারল সে।

উইকেন্ডগুলো বেশ ভাল লাগতে শুরু করল তার। এদিক সেদিক যাচ্ছিল।

এরকমই এক উইকেন্ডে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল প্যাট্রিক হারপারের।

ভাল আবহাওয়া ছিল। রূপম স্টারবাকসে কফি খেতে গেছিল দুপুরের দিকে। গিজগিজ করছে ভিড়। একটা টেবিল ফাঁকা পেয়ে তাতে কফি নিয়ে বসল। এক মধ্যবয়সী শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বললেন, "মে আই সিট হিয়ার?"

রূপম হাসল, "শিওর"।

ভদ্রলোক কফি নিয়েই এসেছিলেন। বসে বললেন, "আপনি এশিয়ান?"

রূপম বলল, "হ্যাঁ। ভারতীয়"।

ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন, "আমি প্যাট্রিক হারপার। এক্স মিলিটারি ম্যান। আপাতত ম্যালিবুতে থাকি। এখানে একটা কাজে এসেছিলাম। আমি কিন্তু এককালে আপনাদের ওখানে ছিলাম"।

রূপম বলল, "ইন্ডিয়ায়?"

ভদ্রলোক বললেন, "না না, আফগানিস্তানে"।

রূপম হেসে ফেলল, "তাহলে আপনি আমাদের দেশে থাকেন নি। আফগানিস্তান আমাদের থেকে অনেক দূরে। যতটা দূর আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড, ততটাই"।

ভদ্রলোকও হাসলেন, "সরি সরি। অ্যাকচুয়ালি আপনাকে দেখে অনেক কিছু কথা মনে পড়ে গেল, তাই এতটা বেশি বলে ফেললাম। এক্সট্রিমলি সরি"।

রূপম অবাক হয়ে বলল, "মানে? আমাকে দেখে আপনার কী মনে পড়ল?"

ভদ্রলোক বললেন, "অনেক কিছু"।

রূপম বলল, "স্কিন কালার দেখে, তাই তো?"

প্যাট্রিক বললেন, "আমি রেসিস্ট নই। জীবিকার প্রয়োজনে সেনাবাহিনীতে ছিলাম বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর কোন জাতি সম্পর্কেই আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমার গল্পটা শুনবেন?"

রূপম বলল, "শিওর। আমার কোন কাজ নেই এখন। বলতেই পারেন"।

প্যাট্রিক বললেন, "কফিটা খেয়ে নিন। আমার সঙ্গে চলুন। এই পরিবেশে গল্পটা ভাল লাগবে না"।

রূপম বলল, "কোথায় যাব?"

প্যাট্রিক বললেন, "আমার বাড়িতেই চলুন। ম্যালিবু বিচের কাছে। সমুদ্রের ধারে বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে গল্পটা শুনবেন। সে ঘটনাটার পর এমনিতেই আমি একা থাকতে পারি না। ব্যাপারটা রোজ আমাকে হন্ট করে চলে। বিয়ে করেছিলাম। সেটা আবার টিকল না। একা থেকে থেকে এমনিতেও হেদিয়ে গেছি। যাবেন আমার সঙ্গে?"

প্যাট্রিক আগ্রহী চোখে তাকালেন।

রূপম খানিকটা অবাক হল। ভদ্রলোক সেনায় ছিলেন, অথচ সুন্দর প্রফেসরের মত চেহারা। দেখে একেবারেই প্রতারক বলে মনে হচ্ছে না। তার মত একজন অকিঞ্চিৎকর বাঙালির মধ্যে প্যাট্রিক কী

দেখলেন কে জানে! খানিকটা কৌতূহলবশতই সে রাজি হয়ে গেল।
কফিটা শেষ করে প্যাট্রিকের সঙ্গে বেরোল সে।
প্যাট্রিকের মার্সিডিজে লস অ্যাঞ্জেলসের ভয়াবহ জ্যাম পেরিয়ে ম্যালিবুতে যখন পৌঁছল তখন ঘড়ির কাঁটা বিকেল পাঁচটা পেরিয়েছে।
চাবি দিয়ে বাড়ির তালা খুলতে খুলতে প্যাট্রিক বললেন, "ফিল ফ্রি রূপ। একবারেই সঙ্কোচ বোধ করবেন না"।
রূপম বলল, "ঠিক আছে। আমি যদিও এখনও বুঝতে পারলাম না, আপনি কেন আমাকে নিয়ে এলেন"।
প্যাট্রিক হাসলেন, "আসুন"।
ছোট্ট একটা বাড়ি। কিন্তু ভারি গোছানো। সমুদ্রের ধারে।
রূপম দেখল ঘরের দেওয়ালে একটা কালো পতাকায় আরবীতে কিছু লেখা আছে। সে অবাক হয়ে বলল, "এটা কী?"
প্যাট্রিক হাসলেন, "এক আফগান ফকির দিয়েছিল। ওটা নিয়েই এদেশে এসেছিলাম। আমাদের দেশেও এটা নিয়ে অনেক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু ওটা ফেলতে পারি নি"।
রূপম বলল, "ওটায় কী লেখা আছে?"
প্যাট্রিক দুটো বিয়ারের ক্যান ফ্রিজ থেকে বের করে একটা রূপমের হাতে দিয়ে বললেন, "এতে আরবীতে লেখা আছে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর কিছু না"।
রূপম অবাক হয়ে বলল, "আর কিছু না? কিন্তু এটা এখানে রাখার কী অর্থ?"
প্যাট্রিক বললেন, "ব্যালকনিতে আসুন। সমুদ্র দেখতে দেখতে কথা বলি"।
সুন্দর ছোট ব্যালকনি। ব্যালকনিতে চেয়ারে বসতে দিলেন প্যাট্রিক। নিজেও বসে বললেন, "ওই ফকির এই কাপড়টা আমাকে দিয়েছিলেন বলেই হয়ত এখনও আমি রাতে ঘুমোতে পারি। নইলে পারতাম না"।
রূপম বলল, "কেন? কী হয়েছিল?"
প্যাট্রিক হেসে বললেন, "শুরু থেকেই বলি তবে। আমি পড়াশুনায় খুব একটা ভাল ছিলাম না। চেহারা যত ভাল আমার, পড়াশুনার ক্ষেত্রে আমি ততটাই গাধা ছিলাম। বাবা বুঝেই গেছিল এ ছেলে বড় হয়ে নিশ্চিতভাবেই ম্যাকডোনাল্ডে বা কোন মাল্টিপ্লেক্সে পপকর্ণ বেচবে। আমিও তাই জানতাম। কিন্তু কী থেকে কী হল, এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে আর্মিতে জয়েন করে গেলাম। সেই সময় সবে নাইন ইলেভেন হয়েছে, দেশে সবার মধ্যে একটা মারাত্মক তেড়িয়া ভাব, ভয়ও পেয়ে গেছে সবাই, এত মহান একটা দেশের ভিত নড়িয়ে দেবে কিনা আল কায়েদার মত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন? তার ওপরে বুঝতেই পারছেন টুইন টাওয়ার ধ্বংস আমাদের মনে কী ধরণের প্রভাব ফেলেছিল!
বাবা বারণ করল। আমাকে অবাক করে দিয়ে সৎ মাও বারণ করল। কিন্তু আমি শুনলাম না। আমি আর্মিতে চলে গেলাম। এবং নাম মাত্র ট্রেনিং দিয়ে আমাদের আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। জর্জ বুশের ব্যাপার স্যাপার ছিল ভারি পরিস্কার। আগে বোম মেরে জায়গাগুলো উড়িয়ে দাও। তারপর আর্মি নামাও। তালিবানদের একবারে হাতে ও ভাতে মেরে দাও। কাবুল ততদিনে তালিবান মুক্ত। আমাদের একটা প্লেনে করে নামিয়ে দেওয়া হল। সেনা ছাউনিতে থাকতাম। আর মেশিনগান নিয়ে এলাকা টহল দিতে বেরোতাম। আচ্ছা, আপনি কিছু খাবেন?"
প্যাট্রিক হঠাৎ কথা থামিয়ে রূপমকে জিজ্ঞেস করলেন।
রূপম মাথা নাড়ল, "না না আপনি বলুন। খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে"।

প্যাট্রিক হাসলেন, "ইন্টারেস্টিং তো বটেই। আরও বেশি ইন্টারেস্টিং তালিবানরা। তালিবানরা যে কী ভয়াবহ পাবলিক, তা না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আমেরিকা যত বোমাই মারুক, যারা বেঁচেছিল, তারা চোরাগুপ্তা হানা চালিয়ে যাচ্ছিল। এমনই একদিন রাতের বেলা, আমাদের ছাউনিতে আত্মঘাতী হামলা করল তালিবানরা। যেটুকু অস্ত্র ছিল, তা নিয়েই"।

প্যাট্রিক চোখ বন্ধ করে চুপ করে গেলেন।

কয়েক সেকেন্ড পরে বলতে শুরু করলেন, "আমাদের ক্যাম্প ছিল ছাউনির পূর্ব দিকে। ওরা ওয়েস্টার্ন সাইড থেকে এসেছিল বলে সে যাত্রা বেঁচে গেলাম। শেষ জিহাদীটা যখন আমাদের হাতে মারা পড়ল, ততক্ষণে আমাদের চুয়ান্ন জন সেনা শেষ। একগাদা হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে এসে ভয়াবহ একটা হামলা করেছিল। সেই প্রথম সরাসরি এনকাউন্টার দেখা। নিজের সেনা আর শত্রুপক্ষের লোকেদের রক্তাক্ত লাশ দেখা। সারি সারি লাশ। ওহ"।

প্যাট্রিক এক ঢোকে অনেকখানি বিয়ার খেয়ে নিয়ে বললেন, "আমি রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। এ কী রে বাবা, এ আমি কী করলাম? দিব্যি ছিলাম নিজের দেশে। খাচ্ছিলাম, দাচ্ছিলাম, ঘুরছিলাম। ম্যাকডোনাল্ডসেই না হয় চাকরি করতাম, কেন মরতে সেনায় ভর্তি হলাম? এরকম লাশ দেখার জন্য? অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বমি হতে থাকল। মেডিক্যাল ক্যাম্পে পাঠানো হল আমাকে। হ্যালুসিনেট করতে লাগলাম সেদিনের ঘটনাটা। মাস খানেক লাগল সুস্থ হতে। আবার যখন ক্যাম্পে জয়েন করলাম, দেখলাম সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আটোসাটো হয়েছে। আগে কাঁটাতারের বেড়া ছিল। এখন প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়েছে। চেক পোস্ট বাড়ানো হয়েছে। শিফট ডিউটি চালু হয়েছে। আমায় মাঝে মাঝেই নাইট শিফটে কাবুল টাউনে টহল দিতে পাঠানো হত একটা কনভয়ে করে। আমার সঙ্গে আমাদের সহকর্মীরা থাকতেন। ঘটনাটা ঘটল এক ডিসেম্বরের রাতে"।

প্যাট্রিকের ক্যান শেষ হয়ে গেছিল। তিনি ঘরের ভিতর থেকে আরেকটা ক্যান নিয়ে এসে সেটা থেকেও অনেকখানি বিয়ার খেয়ে রূপমের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর ইউ এ মুসলিম?"

রূপম বলল, "না। হিন্দু"।

প্যাট্রিক বললেন, "ওহ। সরি ফর আস্কিং"।

রূপম মাথা নাড়ল, "নো প্রবলেম। প্লিজ ঘটনাটা বলুন। ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি"।

প্যাট্রিক বললেন, "অবশ্যই। ঘটনাটা আমি খুব কম লোককে বলেছি এখন অবধি। আমাদের দেশের লোক অনেকেই বিশ্বাস করে নি। আপনিও করবেন না হয়ত। যাই হোক, বলি।

সে রাতে মারাত্মক ঠান্ডা পড়েছে। আমাদের কনভয়টা টহল দিতে বেরিয়েছে ওই ডেড সিটিতে। ডেড সিটি কেন বলছি আশা করি বুঝতেই পারছেন। বোম মেরে মেরে আমেরিকা কাবুলের বেশিরভাগ বাড়ি ঘরই ভেঙে দিয়েছিল। একটা ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যেন আমাদের গাড়িটা যাচ্ছিল।

এরকম সময়ে আমাদের গাড়িটা গেল পাংচার হয়ে।

কনভয় থেমে গেল। আমাদের গাড়ির যে ড্রাইভার, সে তড়িঘড়ি নেমে টায়ার পাল্টাতে শুরু করল। বাকি গাড়িগুলো যখন দেখল খুব একটা সমস্যা নেই, তারা আমাদের ছেড়ে রেখে বেরিয়ে গেল। আমরা কয়েকজন গাড়ি থেকে নেমে হাত পা ছাড়লাম। রাত বারোটা বেজেছে। যেখানে আমাদের গাড়িটা পাংচার হয়েছিল, সেখানে একটা ছোট বাড়ির ভেঙে চুরে পড়ে আছে। আমি ভাবলাম একটু বসি। বাড়িটার ভাঙা ইটের মধ্যে গিয়ে বসলাম। আমাদের মধ্যে একজন সিগারেট ধরাল। আমি স্মোক করি না। চুপ করে বসে রইলাম আর ভাবতে লাগলাম কী কুক্ষণে আর্মি জয়েন করেছিলাম। হঠাৎ নাকে একটা গন্ধ এল। পচা গন্ধ। উঠে দাঁড়ালাম। ভাঙা বাড়ির মধ্যে থেকেই আসছে। কী মনে হতে টর্চ জ্বালিয়ে বাড়ির মধ্যে ফেললাম।

ইটের স্তুপ। এগিয়ে গিয়ে হাত দিয়ে দু চারটে ইট সরাতেই যা দেখলাম, তাতে সঙ্গে সঙ্গে আমার বমি হতে শুরু করল"।

প্যাট্রিক থামলেন। এক হাত দিয়ে দু চোখ চেপে কয়েক সেকেন্ড বসে বললেন, "দেখলাম একটা তিন চার বছরের শিশুর মাথা পড়ে আছে। থ্যাতলানো। শরীরটা আরেকটু দূরে। সেনাবাহিনীর বোমে গোটা শহরটারই এই দশা, সকালে এরকম দৃশ্য দেখলে হয়ত কিছু হতও না আমার, কিন্তু রাতে, সে দৃশ্য দেখে আর নিতে পারলাম না। বমি করতে শুরু করলাম। আমার সঙ্গে যারা ছিল, তারা আমাকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নিয়ে এসে গাড়িতে বসালো। পাংচারও ঠিক হয়ে গেছিল। আমাকে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হল। ক্যাম্পে এসে খেয়ে দেয়ে শুলাম তাবুতে। রাত তিনটে। ঘুম ভেঙে গেল একটা বাচ্চা কাঁদার শব্দ শুনে। চোখ খুলে দেখলাম একটা বাচ্চা আমার পায়ের কাছে বসে কেঁদে চলেছে। আমি চিৎকার জুড়ে দিলাম। সবাই ছুটে এল। সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। সবাই বলল আমি হ্যালুসিনেট করছি। আবার মেডিক্যাল ক্যাম্পে পাঠাল। সেখানে কড়া কড়া সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়ানো শুরু হল। কিন্তু সে ছেলে আমাকে ছেড়ে গেল না। ছাউনিতে ফিরে এলেও আমি প্রায়ই তাকে দেখতে লাগলাম। সবাই আমাকে বলতে শুরু করল আমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। আমি নিজেও ঠিক করলাম। অ্যাপ্লাই করলাম উপর মহলে। আমার আবেদন মঞ্জুর হল। মেডিক্যাল হিস্ট্রির জন্যই হয়ত। যেদিন ফিরব, তার আগের দিন গাড়ি করে ঘুরছি।

কাবুলের ধ্বংসাবশেষ দেখে যাচ্ছি, হঠাৎ গাড়ির মধ্যে এই কালো কাপড়টা ছুড়ে দিল এক ফকির। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, "ইট উইল স্টপ ইউ টু সি নাইটমেয়ারস"।

আমার কলিগরা হৈ হৈ করে উঠল, কী সাহস ফকিরের, আমেরিকান সেনার গায়ে কাপড় ছোঁড়ে? কিন্তু আমি ওদের আটকালাম। কাপড়টা মুড়ে পকেটে রাখলাম। অবাক কান্ড হল, সে রাতে আমি সত্যিই বাচ্চাটাকে আর দেখলাম না"।

প্যাট্রিক থামলেন।

দ্বিতীয় ক্যানটাও শেষ করে বললেন, "বিশ্বাস হল না নিশ্চয়ই?"

রূপম প্যাট্রিকের কাহিনীটা শুনে খানিকটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। বলল, "অবিশ্বাস হবার কোন কারণ নেই প্যাট্রিক। এরকম হতেই পারে"।

প্যাট্রিক সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এত বড় দেশ, এত সুসভ্য জাত আমরা, কীভাবে থেতলে খুন করলাম আরেকটা জাতকে, সবাই তো দোষী ছিল না, এইটুকু শাস্তি আমার মত কয়েকজন সৈন্যকে তো পেতেই হত, বলুন?"

রূপম কী বলবে বুঝতে পারল না। চুপ করে থাকল।

শুধু তার চোখটা চলে গেল প্যাট্রিকের ঘরের ভেতর ফ্রেমে রাখা কালো কাপড়টার দিকে, "শান্তি বর্ষিত হোক"।

কত সহজ কথা, অথচ কত কঠিন...

লেডিস হোস্টেলের একরাত

গরমের ছুটি পড়েছে। হোস্টেলের বেশিরভাগ মেয়েই বাড়ি গেছে।
পৃথা যায় নি। বাবার পক্স হয়েছে। যেতে বারণ করেছে। দোতলার আরেকটা মেয়ে যায় নি। সিনিয়র। তানিয়া।
তানিয়ার নামে হোস্টেলে বদনাম আছে। তানিয়া শুধু লেসবিয়ানই না, মেয়েদের ওপর জোর জুলুম করে। রিখিয়া পৃথাকে বলে গেছে তানিয়ার ধারে কাছে না যেতে।
পৃথা দরজা বন্ধ করে দেয় সন্ধ্যে থেকেই। তক্কে তক্কে থাকে খাওয়ার সময়ে। কিছুতেই যেন তানিয়ার পাল্লায় না পড়ে। র‍্যাগিং পিরিয়ড চলছে এমনিতেই। তাদের ইয়ারের একটা মেয়েকে যা তা করেছিল তানিয়া। তারপর থেকে আতঙ্কে ভোগে সবাই।
রবিবার সন্ধ্যে।
পৃথা চুপ করে শুয়ে মোবাইল ঘাঁটছিল। এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়তে শুরু করল।
পৃথা ভয়ে ভয়ে গলা তুলল, "কে?"
বাইরে থেকে তানিয়ার গলা ভেসে এল, "আমি। খোল"।
পৃথা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল প্রথমে। খানিকটা জল খেয়ে দরজা খুলল।
তানিয়া একটা ব্রা আর শর্টস পরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে বলল, "দরজা বন্ধ করে রেখেছিস কেন?"
পৃথা বলল, "এমনি। আমি ভূতের ভয় পাই তো"।
তানিয়া ফিক ফিক করে হাসল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, "চল, সব খোল। আজ তোর সাথে শোব"।
পৃথা কেঁদে ফেলল, "প্লিজ আমাকে ছেড়ে দাও"।
তানিয়া তার খাটে বসে বলল, "বাওয়া। বিরাট ভয় তো তোর। তা বল কোথায় বাড়ি তোর? বাড়ি যাস নি কেন?"
পৃথা বলল, "বাবার পক্স হয়েছে"।
তানিয়া বলল, "সিগারেট আছে?"
পৃথা বলল, "আমি স্মোক করি না"।
তানিয়া শিষ দিয়ে বলল, "উরিসশালা। চ চ। আমার ঘরে চ"।
পৃথা বলল, "আমার মাথা ধরেছে দিদি। আজ না গেলে হয় না?"
তানিয়া পৃথাকে চমকে দিয়ে ওর একটা স্তন ধরে বলল, "ভাল ভাবে কথা বলছি, শুনবি না? তাই তো?"
পৃথা ঘাবড়ে গিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "চল"।
তানিয়া দরজা খুলল। পৃথার কান্না পাচ্ছিল। এমন কপাল তার আজকেই তানিয়ার পাল্লায় পড়তে হল!
তানিয়ার ঘরে এসে দরজা খুলে তানিয়া সিগারেট বের করে ধরিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নে, ফোক"।
পৃথা সিগারেটটা টানল। দমকে কাশি হতে শুরু করল।
তানিয়া জোরে হেসে বলল, "তোর কী কপাল ভাল রে, আজ অন্য সিনিয়ররা নেই। ভালই হয়েছে। আয় খুলে ফেল সব"।

পৃথা টি শার্ট আর পাজামা পরে ছিল। খুলল। তানিয়া ধমকাল, “ব্রা খোল”।
পৃথা কেঁদে ফেলল, “প্লিজ দিদি, ছেড়ে দাও”।
তানিয়া চোখ বড় বড় করে বলল, “যা বলছি কর”।
পৃথা তাই করল।
তানিয়া পৃথার বুকের দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে বলল, “ঈশ, এক্কেবারে ছোট। একবারেই কিছু করিস নি। দেখি এদিকে আয়”।
হাত বাড়ালো তানিয়া।
পৃথা দু হাত দিয়ে বুক ঢাকল।
তানিয়া পৃথাকে চড় মারল। পৃথা শিউরে উঠল।
তানিয়া বলল, “বেশি বেড়েছিস নাকি রে? সিনিয়রকে আটকাচ্ছিস?”
পৃথা মাথা নাড়ল, “প্লিজ ছেড়ে দাও”।
তানিয়া বলল, “হাত সরা, নইলে কপালে দুঃখ আছে”।
পৃথা ভয়ে ভয়ে হাত সরাল।
চোখ বন্ধ করল।
তানিয়ার গরম নিঃশ্বাস পৃথার শরীরে পড়ছে। পৃথার একটা অসহ্য অনুভূতি হচ্ছিল, এমন সময় দরজায় কেউ জোরে কড়া নাড়ল।
তানিয়া চ্যাচাল, “কে রে?”
কোন সাড়া এল না। তানিয়া উঠে দরজা খুলল। কেউ নেই। বলল “কী হারামি রে। কে রে?”
কোন উত্তর এল না।
দরজা বন্ধ করতে আবার একই কান্ড।
জোরে জোরে কেউ কড়া নাড়ছে।
তানিয়া দরজা খুলে বাইরে বেরোল। কোথাও কেউ নেই।
তানিয়া ফ্লোরে, সিড়ির কাছে গেল। কোথাও কেউ নেই।
তানিয়া এসে বলল, “এই কী ব্যাপার রে?”
পৃথার কান্না পাচ্ছিল। সে কেঁদে ফেলল।
তানিয়া বলল “মহা জ্বালা তো। এই তুই ঘরে যা। যা। যত্তসব ছিঁচকাঁদুনে”।
পৃথা প্রায় দৌড়ে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করল।
খানিকক্ষণ পরে বিল্ডিং জুড়ে তানিয়ার জোর চিৎকার শোনা গেল।
পৃথা ভয়ে ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে তানিয়ার ফ্লোরে গিয়ে দেখল তানিয়া ঠক ঠক করে কাঁপছে। তার গায়ে একটা সুতো নেই।
তানিয়া বলল, “আমায় ক্ষমা করে দে বোন। জীবনে আমি আর র‍্যাগিং করব না”।
পৃথা বলল, “কী হয়েছে?”
তানিয়া তার পা জড়িয়ে ধরল, “বল, ক্ষমা করেছিস”।
পৃথা বলল, “কী হয়েছে দিদি বলবে তো”।
তানিয়া বলল, “দিদি তুই, আমি না। বিশ্বাস কর দিদি, আর কোন দিন র‍্যাগিং করব না। বল ক্ষমা করেছিস”।
পৃথা বলল, “আচ্ছা ক্ষমা করেছি, কী হয়েছে বলবে তো”।

তানিয়া বলল, “কিছু না। যা যা দিদি, তোর ঘরে যা”।
পৃথা কিছুই না বুঝে নিজের ঘরে গেল।
#
একবছর পরের কথা।
নতুন ব্যাচ এসেছে। পৃথা সিনিয়র হয়েছে। বাড়ি যায় নি ছুটিতে।
নীচের তলায় একটা নতুন মেয়ে একা আছে। পৃথার ইচ্ছা হল র‍্যাগিং করবে।
মেয়েটার ঘরে যেতেই চোখে পড়ল মেয়েটার দরজার সামনে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটার পা নেই। একটা ভাসমান শরীর। হঠাৎ করেই যেন মনে হল মূর্তিটা তাকে দেখে হাসছে।
দৌড়ে পৃথা নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল।
এতদিন পর বুঝতে পারল সে রাতে তানিয়া কেন অত ভয় পেয়েছিল...

আঠেরো বছর পর

মাথা ধরে আছে ঋষির। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল গ্যাসের ব্যথাটা শুরু হবে একটু পরে। বরাবর পেটের রুগী সে।
রুবির সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথা আসবে।
পৃথার সঙ্গে দেখা হলে এখনও সেই বুক চিনচিনে ব্যথাটা হয় ঋষির। টেনশন হয়।
অথচ হবার কথা না। দুজনের দুটি পথ আলাদা হয়ে গেছে কবে।
আঠেরো বছর পর দেখা হবে শুধু অন্য একটা কারণে।
তার ছেলের স্কুলের অ্যাডমিশনের ব্যাপারে।
ঋষির ছেলে আয়ান আগে তাদের গ্রামের বাড়ি ছিল। কলকাতা নিয়ে আসতে হল হঠাৎ করেই। বাবা মারা যাবার পর অগ্নিবীণা আর গ্রামে থাকতে চাইল না। খানিকটা বাবার ইচ্ছেতেই ছিল এতদিন। বাবা যেদিন চলে গেল, বাড়ি যেতে অগ্নিবীণা ঋষির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুযোগ করতে শুরু করল, "তুমি তো ভুলেই গেছো আমাকে। কীভাবে থাকি আমি ভেবেছো কখনো?"
ঋষি আর ভাবে নি। আয়ান আর অগ্নিবীণাকে নিয়ে চলে এসেছে কলকাতা।
মিড সেশন। কোথাও ভর্তি নিচ্ছে না। এই সময়েই কাকতালীয়ভাবে পৃথার সঙ্গে ফেসবুকে কথা হল। দুজনেই দুজনের ফ্রেন্ডলিস্টে অনেকদিন ধরে ছিল। কথা কেউই বলত না। হঠাৎ করে পৃথা পিং করল গতকাল, "কী খবর?"
অন্য কোন কথার আগে তার সমস্যাটা বলল ঋষি। সে দেখেছিল পৃথা একটা স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছে এখন। পৃথারই ফেসবুক প্রোফাইলে।
পৃথা বলল, "ঠিক আছে, একটা ঠিকানা দিচ্ছি, এসো। দেখি কী করা যায়"।
সেই মত চলে এসেছে ঋষি। টেনশনটা শুরু হয়েছে পরে। এখনো সেই বুক চিন চিন।
কত দিন পর দেখা হবে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বলে গাড়ি থেকে নেমে একটা লজেন্স কিনে খেল। এবং তারপরেই হার্টবিট মিস করল তার। পৃথা আসছে।
একটা হলুদ শাড়ি পরেছে।
একটু মুটিয়েওছে।
তবু কী মানিয়েছে!
তাকে দেখে দূর থেকেই হাসল পৃথা। কাছে এসে বলল, "দাড়ি পেকে গেছে তো"।
ঋষি হাসল, "বয়স হয়ে গেল"।
পৃথা বলল, "ভালো সব?"
ঋষি বলল, "অলমোস্ট। এবার তোমার দয়া হলেই হল। আচ্ছা, আমরা অন্য কোথাও যেতে পারি? এখানে বেশিক্ষণ পার্ক করলে ঝামেলা হবে"।
পৃথা বলল, "শিওর। চল"।
ঋষি গাড়ির দরজা খুলে দিল। পৃথা উঠলে ড্রাইভিং সিটে এসে বসল।
গাড়ি চলতে শুরু করলে পৃথা বলল, "আনোয়ার শা রোড চল। আমার ফ্ল্যাটে"।
ঋষি বলল, "ওকে"।

পৃথা বলল, "নাইস কার পারফিউম। বউয়ের পছন্দ নিশ্চয়ই? তুমি এখনো গ্রাম থেকে বেরিয়েছো বিশ্বাস হয় না। মাঝে মাঝে যা সব কালারের জামা পরা ছবি দাও। ভাবি বলি, তারপর নিজেকে আটকাই। কী দরকার, পরের সম্পত্তিতে নজর দেওয়ার"।
ঋষি হেসে ফেলল, "বললে ভালই লাগত। অ্যাটলিস্ট খানিকটা শহুরে হওয়া যেত। হতে পারলাম কই আর?"
পৃথা শ্বাস ছাড়ল, "সেই। তবে তুমি এরকমই থেকো। চেনা মানুষ হঠাৎ করে পাল্টে গেলে ভাল লাগে না। আর তোমাকে মানাবেও না হঠাৎ করে শহুরে হওয়ার চেষ্টা করলে। বন্যেরা বনে সুন্দর, ঋষি মিত্র গ্রাম্য পোশাকে। খুব ভাল করেছিলে বউকে বাবার কাছে রেখে। আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট"।
ঋষি বলল, "অগ্নিবীণাই চেয়েছিল অ্যাকচুয়ালি। তবে প্রথম দিকটা। ওরও গ্রাম ভাল লাগে। বাবা অসুস্থ হবার পর খানিকটা হেজে গেল। ওর হাতেই বাবা চলে গেল। তারপর আর থাকতে পারল না"।
পৃথা বলল, "আমি পারতাম না কিছুতেই"।
বলেই তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাল পৃথা, "তুমি ছেলের নাম আয়ান রেখেছো না?"
ঋষি বলল, "হ্যাঁ"।
পৃথা বলল, "দিন কত তাড়াতাড়ি চলে যায় বল? তুমি গাড়িও চালাচ্ছ। অথচ এককালে তোমার আমার কত কষ্ট হত"।
ঋষি হেসে ফেলল, "মনে আছে তোমার?"
পৃথা বলল, "কেন ভুলব?"
অভিষিক্তার সামনে দিয়ে ডানদিকে ঢুকল গাড়িটা। রাস্তায় জ্যাম নেই তেমন।
পৃথা বলল, "অফিস থেকে বেরিয়ে কিছু খাও নি নিশ্চয়ই?"
ঋষি বলল, "ব্যস্ত হতে হবে না। আমি মুড়ি খেয়ে নেব বাড়ি গিয়ে। পৈটিক সমস্যায় জর্জরিত আছি"।
পৃথা বলল, "সে তুমি বরাবর থাকো। শহরের সব সুলভেই যাওয়া হয়ে গেছে মনে হয় তোমার এত দিনে"।
ঋষি হাসল।
আবার কিছুক্ষণ চুপ চাপ। যাদবপুর থানার কাছে সামান্য একটু জ্যাম। কিছুক্ষণ পরেই পৃথার দেখানো পথে ওর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছল ঋষি। হাউজিং কমপ্লেক্স একটা। চার তলায় পৃথার ফ্ল্যাট। চাবি দিয়ে দরজা খুলল পৃথা।
ঋষি অবাক হল, "একা আছো? বর কি অফিসে?"
পৃথা বলল , "আমরা এখন সেপারেটেড"।
ঋষি বলল, "সেকী?"
পৃথা বলল, "মুড়ি খাবে বলছিলে না? আনছি, বস একটু। টিভি দেখো"।
পৃথা টিভি চালিয়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
অন্যমনস্কভাবে রিমোটটা নাড়াচাড়া করতে করতে ঋষি টিভিতে চোখ রাখল।
পৃথা এক বাটি মুড়ি নিয়ে এসে বলল, "চল, দুজনে মিলে মুড়িই খাওয়া যাক। তোমার সেই মুড়ি প্রেম এখনো গেল না বল?"
ঋষি বলল, "সেপারেশন কেন?"
পৃথা বলল, "ছাড়ো না"।
ঋষি বলল, "না, শুনব"।

পৃথা বলল, “ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। ওর চাকরিটা যাওয়ার পর থেকেই কেমন হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে… টাকা পাঠাই নিয়মিত। শুধু এক সঙ্গে থাকব না ঠিক করেছি। চোখের সামনে একটা ভাল লোককে জন্তুতে পরিণত হতে দেখলে ভাল লাগে না”।

ঋষি এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে খেয়ে বলল, “তোমার ছেলে মেয়ে?”

পৃথা বলল, “হয় নি। আমি তো তোমার ফেসবুক প্রোফাইলে আয়ানকে দেখি মাঝে মাঝে। খুব মিষ্টি হয়েছে। তোমার মত হয় নি যদিও। অগ্নিবীণার মত হয়েছে। ভারি মিষ্টি বউ পেয়েছো। বাদরের গলায় মুক্তোর মালা যেন”।

ঋষি হেসে ফেলল। বলল, “ভাল মেয়ে। আমি সত্যিই ভাগ্যবান। কোন চাহিদা নেই, কিছু নেই। শুধু ছেলে নিয়ে মাথা খারাপ। এই সেশনে ভর্তি না করতে পারলে আবার গ্রামের স্কুলে নিয়ে যেতে হবে পৃথা। কিছু করা যায় না?”

পৃথা বলল, “করে এসেছি। ছেলেকে নিয়ে এসো কাল। হয়ে যাবে”।

ঋষি পৃথার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি জানতাম জানো তো। তুমি কিছু না কিছু ঠিক করবে। আয়ানকে তুমি নিজের ছেলের মতই…”

পৃথা হাত তুলল, “আমাকে এরকম কথা বলবে না। দয়া করে বলবে না। আমার এই কথাগুলো শুনলে ভীষণ অস্বস্তি হয়। সন্তান প্রসব না করার যন্ত্রণা যে কী, তা বলে বোঝাতে পারব না তোমাকে”।

ঋষি চুপ করে গেল।

পৃথা বলল, “তোমাকে রোজ ভেবেছি একবার মেসেজ করি। করতে গিয়েও থমকেছি। কাল অত সাহস করে করলাম, তুমি সঙ্গে সঙ্গে ছেলের কথা বললে। প্রথমে রাগ হল। তারপর মনে হল, এই বয়সে এসে এটাই তো স্বাভাবিক”।

ঋষি বলল, “এই বয়সে মানে? তুমি কি বুড়ি হয়ে গেছো নাকি? আমার চল্লিশ হলে তোমার কত হবে? উনচল্লিশ? এমন করে বললে কথাটা, যেন কত বয়স তোমার”!

পৃথা বলল, “তাই যদি হবে, তাহলে কাল প্রথমেই ছেলের কথা বললে কেন তুমি? কেন একবারও আমার সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হল না তোমার?”

ঋষি বলল, “আমি ভেবেছিলাম তুমি সুখে আছো। ছবিগুলো দেখে তো সেরকমই লেগেছে। কবিতা শেয়ার করছো, খাবারের রেসিপি শেয়ার করছো, এরকম জানলে…”

পৃথা বলল, “এরকমের কিছু না। রকম সকমের তো কিছু নেই। একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে অকারণে মার খাবে কেন? কী আনন্দে মার খাবে? আমি কোন কালে সতীলক্ষী ছিলাম?”

ঋষি উঠল।

পৃথা বলল, “কোথায় যাচ্ছ?”

ঋষি বলল, “জল খাই”।

পৃথাও উঠল। “পাবে না। দিচ্ছি”।

ঋষিকে পেরোতে গিয়ে পৃথার হাত লাগল ঋষির হাতে।

ঋষি যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হল। পৃথাকে টেনে নিয়ে ঠোঁটে চুমু খেল। পৃথা বাধা দিল না। ঋষি চুমু খেতে খেতে পৃথার শাড়ি খুলে দিল। মেঝেতে কার্পেট দেওয়া। পৃথা সেখানে বসল। ঋষি পৃথাকে চুমু খেতে খেতে শুইয়ে দিয়ে সায়া ব্লাউজ খুলে দিল। নিজে প্যান্ট, জামা খুলে জড়িয়ে ধরল পৃথাকে। পৃথার শরীর এতদিন তার স্বপ্নে এসেছিল। এতদিন পরে সেটা চোখের সামনে এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

পৃথা ঋষিকে টেনে নিল। পাগলের মত একে অপরকে আদর করে চলল।

সঙ্গম শেষে ঋষি মেঝেতে পৃথাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকল।
দুজনে চুপ করে শুয়ে রইল।
কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করল পৃথা, "টেস্ট করিয়েছিলাম। ওর সমস্যা ছিল। আমি যদি তোমার সন্তানকে গর্ভে নিতে চাই, আপত্তি করবে?"
ঋষি বলল, "না। নাও। পারবে তুমি?"
পৃথা বলল, "অগ্নিবীণাকে ঠকানো হবে তখন, তাই না?"
ঋষি বলল, "আমি অত ভাবতে পারছি না এখন। শুধু মনে পড়ছে, তোমাকে ভুলতে হাতে কতগুলো সিগারেটের ছ্যাকা দিতে হয়েছিল"।
পৃথা বলল, "ভুলতেই হত? এত জরুরি ছিল ভুলে যাওয়াটা?"
ঋষি চুপ করে বসে রইল। বলল, "আমি আসি। মেয়েটা একা একা গ্রামের বাড়ি ছিল, আর আমি এটা ঠিক করলাম না আজ"।
পৃথা হাসল। ঋষির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "ঠিকই। ঠিক হল না। তোমার আবার সিগারেটের দরকার হবে আজ?"
ঋষি বলল, "হয়ত"।
পৃথা বলল, "ভাল থেকো। আর এসো না কোন দিন"।
ঋষি বলল, "তোমার বরের জন্য কষ্ট বা অপরাধবোধ হচ্ছে না?"
পৃথা তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "হচ্ছে না। তোমাকে ভালবেসেছি। শারীরিকভাবে পেলাম আজ। আজকের গল্পটা আজকেই শেষ হবে। একটাই জীবন। সেটাকে অপরাধবোধে পিষে পিষে শেষ করে দেওয়ার কোন মানে হয় ঋষি?"
ঋষি খালি গায়ে চুপ করে বসে রইল। পৃথা ঋষির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "ভাল থেকো। দূরেই থেকো। অগ্নিবীণার কাছে থেকো"।
ঋষি বলল, "তুমিও ভাল থেকো পৃথা। দিনের শেষে আমিও আর পাঁচটা পুরুষ হয়ে গেলাম বুঝতে পারছি। তবু, ভাল থেকো।
ঋষি উঠে জামা, প্যান্ট পরল।
পৃথা ঋষির কাছে এসে বলল, "আঠেরো বছর ধরে ভেবে গেলাম আমি তোমাকে ভালবাসি না, তুমি আমাকে ভালবাসো না। আঠেরো বছর ধরে দুজনে নিজেদেরকে এভাবেই ঠকিয়ে যাওয়ার পর আজ একে অপরকে কাছে পাওয়ার পর মনে হল আমরা আমাদের পার্টনারকে ঠকালাম। তাই না ঋষি?"
ঋষি কয়েক সেকেন্ড পৃথার দিকে তাকিয়ে বলল, "যাই। সিগারেট কিনতে হবে আবার"।
ঋষি চলে গেল। পৃথা চুপ করে বসে থাকল মেঝেতে।
আর উঠতে ইচ্ছা করছিল না তার...

করোনা ও ফুলশয্যা

পঞ্চাশটা লোকের আসার কথা ছিল।

আমার বাবা ভয়ে তাও হতে দিল না।

যে বাড়িতে সাতশো লোকের আসার কথা ছিল আমার বিয়ে খেতে, সে বিয়েতে চুয়াল্লিশটা লোক উপস্থিত থাকল।

মেয়ের বাড়ি আর ছেলের বাড়ি মিলিয়ে। কমন রিসেপশনে।

পুরুত মশাই মাস্ক পরে বসে আছেন, আমি মাস্ক পরে আমার মাস্ক পরা বউকে সিঁদুর পরালাম, মালাবদল করলাম, তারপর সব হয়ে গেলে মাস্ক পরা আত্মীয় স্বজন আমাদের একটা স্যানিটাইজ করা ঘরে, স্যানিটাইজড রজনীগন্ধা আর গোলাপফুলের গন্ধ ভরা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমার বউ মাস্ক খুলে হাতে স্যানিটাইজার মেখে খাটে বসল।

আমি হাতে স্যানিটাইজার মেখে বউয়ের সামনে বসলাম।

বউ বলল, "দু ফুট দূরে"।

আমি লজ্জিত গলায় বললাম, "ধুস, আজ না আমাদের ফুলশয্যা?

বউ বলল, "যা হবে চোদ্দদিন হবে। দুজনে দুটো ঘরে থাকব। চোদ্দ দিন দূরত্ব মেন্টেন করে থাকুন। আপনি যদি অ্যাসিমটোম্যাটিক হন, আপনার থেকে আমার করোনা হয়, তখন কে দায় নেবে? আপনার বাবা?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তাও ঠিক"।

বউ বলল, "ঘুমিয়ে পড়ুন"।

আমি শুয়ে পড়লাম। দু ফুট সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মেন্টেন করে। ঘুম আসছিল না। কেমন কেমন লাগছিল। একটা আস্ত বউ, মানে গোটাটাই আমার সম্পত্তি, এরকম দূরে দূরে থাকবে? এটা নেওয়া যায়?

আমি একটু গলা খাকরে বললাম, "একটু গল্প তো করাই যায়, তাই না?"

বউ বলল, "তা যায়"।

আমি বললাম "আপনার কোন প্রেম ছিল?"

বউ বলল, "না। আপনাকে বলেছি আমি খুব স্টুডিয়াস ছিলাম, ওসব করার সময় পাই নি। বলেছি না? ভুলে গেছেন?"

আমি বললাম, "তা বটে"।

বউ বলল, "আর বলুন। কী জানতে চান?"

আমি বললাম, "খাসীর মাংস ভালবাসেন দেখলাম। তখন চেয়ে নিলেন"।

বউ বলল, "হ্যাঁ। কথা শোনাবেন নাকি? মাংসের হাফ টাকা কিন্তু আমার বাবাও দিয়েছে। দু বাড়ির কমন রিসেপশন। লজ্জা করে খেতে হত নাকি?"

আমি উল্টে লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বললাম, "এমা, না না কী যে বলেন"।

বউ বলল, "আপনি খাসী ভালবাসেন?"

আমি বললাম, "তা আবার বাসি না? খাসী হল ভালবাসা। হাড়ওয়ালা খাসী আমার পোষায় না অবশ্য। দাঁতের ফাঁকে আটকে যায়"।

বউ বলল, "সেকী? আপনার দাঁত ডিফেক্টিভ নাকি?"

আমি বললাম, "সামান্য। কোণার দিকের একটা দাঁতে সেন্সিটিভিটি আছে"।
বউ থমথমে গলায় বলল, "আগে বলা উচিত ছিল। ডিফেক্টিভ মাল গছিয়ে দিল"।
আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "মানে? সেন্সিটিভ দাঁত মানে আমি ডিফেক্টিভ মাল? আপনার সব পারফেক্ট? হতে পারে?"
বউ হাই তুলে বলল, "ঘুমিয়ে পড়ুন, চোদ্দ দিন পর দেখা যাবে"।
কে একজন বাইরে হ্যাচ্ছো দিল। হই হই পড়ে গেল। একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আরসেনিকাম অ্যালবাম খাও"।
একজন বলল, "করোনীল নেই?"
কে একজন বলল, "অত চাপ না নিয়ে গোয়াল ঘরে চলে যাও। লক্ষীর পেছন টিপ করে বসে থাকো। গরম গরম হিসি বেরোলেই গ্লাসের করে খেয়ে নাও। ভাল লাগবে"।
আমি উঠে বসলাম। বেজায় গরম। পাঞ্জাবী খুলে গেঞ্জি পরে এলাম।
বউ বলল, "গেঞ্জিটা স্যানিটাইজ করা?"
আমি বললাম, "হ্যাঁ। আমার মা ডেটলে ধুয়েছে"।
বউ গম্ভীর গলায় বলল, "ডেটলে অ্যালকোহল থাকে? ওতে কি স্যানিটাইজ হয়?"
আমি বললাম, "তাহলে কি বাংলায় চুবিয়ে আনব গেঞ্জিটা?"
বউ বলল, "দূরে শুয়ে থাকুন। আমার করোনা হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে"।
আমি বললাম, "শুনুন, আপনি খাটে শুয়ে থাকুন। আমি মেঝেতে শুচ্ছি। খুশি?"
বউ বলল, "না, আপনি খাটেই শোন। আমার ভূতের ভয় লাগে"।
আমি বললাম, "মানে? বাড়িতে আপনার সাথে কে শুত?"
বউ বলল, "মা শুত। ভূত খাটের তলায় থাকে। আমি বাথরুমে গেলে তাকিয়ে থাকবেন"।
আমি বললাম, "আপনি দরজা খুলে করবেন?"
বউ বলল, "ধ্যাত! দরজা খুলে কেন করব? আপনি শুধু তাকিয়ে থাকবেন। তাকিয়ে থাকলে ওরা আসে না"।
আমি বললাম, "আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?"
বউ বলল, "ভূত থাকে তো। আমি দেখেছি। খাটের তলায়। রাত হলে দেখবেন ওদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়"।
শুনে আমারও কেমন ভয় ভয় পেল। বললাম, "ঠিক আছে"।
বউ বলল, "একবার খাটের তলা চেক করে নিন"।
আমি বললাম, "আমি কেন চেক করব? আপনি করুন। আমার ভয় লাগে"।
বউ বলল, "আপনি ভয় পেলে কী করে হবে? দুজনের একজনকে সাহসী হতে হবে"।
আমি বললাম, "আপনি হয়ে যান। আমার সাহসী হবার কোন প্রয়োজন নেই। যত্তসব"।
বউ বলল, "থাক। দেখার দরকার নেই। আপনি খাটের কোন দিকে শোবেন? ঠিক করেছেন?"
আমি বললাম, "একদিক হলেই হল। আমার ঘুম ভাল"।
বউ বলল, "নাক ডাকবেন না"।
আমি বললাম, "আমি কী করে জানব আমি নাক ডাকব কি না? নিজের নাক ডাকা কি শুনতে পাওয়া যায়?"
বউ বলল, "ঠিক আছে। ঘুমিয়ে পড়ুন"।
আমি বললাম, "কিছু করব না?"

বউ বলল, "কী করবেন? ডন বৈঠক?"
আমি বললাম, "না মানে আজ আমাদের ফুলশয্যা"।
বউ বলল, "প্রথমত অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, দ্বিতীয়ত আপনার সঙ্গে আমার সেভাবে কোন কথাই হয় নি এখনই। তৃতীয়ত আপনি দেখেন নি সবাই কীভাবে বলছে দূরে থাকতে? এত কিছুর মধ্যে আপনার এসব কথা মাথায় আসে কী করে? লজ্জা থাকা দরকার"।
আমি বললাম, "না মানে বুঝছেন তো। হাত ধরে বসে থাকতে পারলেও হত"।
বউ বা হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "নিন। ধরে বসে থাকুন।তারপর স্যানিটাইজ করে দেবেন। আমি ঘুমোলাম"।
আমি করুণ গলায় বললাম, "সে আপনি যা বলতে চাইছেন, তাতে তো বুঝতেই পারছি, এ ক'দিন ওই ধরেই বসে থাকতে হবে"।
বউ বলল, "কী ধরে বসে থাকতে হবে?"
আমি বললাম, "কিছু না। বলছিলাম কী, আমি যদি গোটা বডিতে স্যানিটাইজার মাখি, তাহলে কি কোন চান্স আছে?"
বউ বিরক্ত গলায় বলল, "অদ্ভুত হাওয়াস তো আপনার! দেশ ও সমাজের প্রতি আপনার কোন কর্তব্য নেই? গোটা পৃথিবী করোনাতঙ্কে ভুগছে, আর আপনি আছেন আপনার ধান্দায়?"
আমি বললাম, "তা বলে কি প্রেম দেব না, যদি মারি কলসীর কানা নেশার ঘোরে?"
বউ বলল, "আপনি কিছু খেয়েছেন না? কেমন একটা গন্ধ আসছে"!
আমি বললাম, "আমার এক বন্ধু ডাক্তার তো, ও বলল দু ছিপি বিপি খেয়ে নে, ইন্টারনাল অরগ্যান স্যানিটাইজ হয়ে যাবে। তাই খেয়ে নিলাম"।
বউ বলল, "এই জন্যই এত পুরকি উঠেছে। ঘুমিয়ে পড়ুন। জ্বালাবেন না"।
আমি বিমর্ষ মুখে আলো নিভিয়ে শুলাম।
কিছুক্ষণ পর খাটের তলা থেকে শব্দ হতে লাগল। বউ ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ভূ... ভূ... ভূ..."
আমার নাকে বউয়ের গায়ের গন্ধ এসে লাগল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে একই রকম ভয়ার্ত গলায় বললাম, "থাকতে পারে, প্রায়ই এরকম শব্দ হয়"।
বউ শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরল।
আমার বুকে ওর গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। আমি আরেকবার ওর শরীরের গন্ধ নিয়ে বললাম, "ওটা ধেড়ে ইঁদুর। খাটের নিচে থাকে"।
বউ সঙ্গে সঙ্গে সর গেল। বলল, "আগে বলবেন তো। খামোখা ভয় পেয়ে গেছিলাম"।
আমি বললাম, "ইনফ্রারেড কানেকশন করা প্র্যাকটিস করছিলেন তো! বাধা দিই কী করে?"
বউ বলল, "অসভ্য লোক"।
আমি বললাম, "বলছি শুনুন না"।
বউ বলল, "কী?"
আমি বললাম, "আপনি তো ছুঁয়েই দিলেন। এবার কি কিছু করা যায় না? মানে হার্ড ইমিউনিটিটা তৈরী করতে বলছে স্ব বিজ্ঞানীরা। বুঝতেই পারছেন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এত দূরে থাকা কী ভালো, আপনিই বলুন? তাছাড়া বললাম বটে ইঁদুর, যদি তা না হয়..."
বউ আবার আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, "আপনি লাইট জ্বালিয়ে দেখুন"।

আমি বউয়ের কপালের চুল সরিয়ে ওকে জাপটে বুকের মধ্যে টেনে ধরে বললাম, "এরকম করে থাকলে ভূত থাকে না"।
বউ আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, "সরুন। আপনি কী ভাবছেন, আমি কিছু বুঝি না?"
আমি বললাম, "তাও ঠিক। দুজনে না রাজি থাকলে কিছু করা উচিত না। ঠিক আছে, আপনি ঘুমান"।
আমি ওপাশ ফিরলাম। খাটের তলা থেকে খুঁট খুঁট শব্দ হতে লাগল।
বউ মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে সুইচ বোর্ড এলোমেলো ভাবে হাতড়ে আলো জ্বালাল।
উঠে খাটের তলা দেখল। বলল, "ইঁদুরই। চলে গেছে"।
আমি সাড়া দিলাম না।
বউ আমাকে ঠেলল। আমি বললাম, "কী হল? আপনি আমাকে ছুঁচ্ছেন কেন? স্যানিটাইজার দিন"।
বউ সত্যি সত্যি স্যানিটাইজার দিল হাতে। তারপর বলল, "আপনি সাড়া না দিলে আমার ভয় লাগছিল"।
আমি বললাম, "সারাদিন অনেক পরিশ্রম হয়েছে। আমি ঘুমালাম"।
বউ বলল, "আর কী কী আছে আপনার ঘরে?"
আমি বললাম, "আপাতত আমিই আছি। আর কিছু আছে নাকি জানি না। ঘুমান"।
বউ বলল, "আলো জ্বালিয়ে ঘুমাই?"
বললাম "ঘুমান"।
বউ খাটের উপর বসে থাকল। আমি ঘুমাতে চেষ্টা করলাম।
বাইরে কী নিয়ে ঝগড়া লেগেছে। কে নস্যি নিয়ে হাঁচি দিয়েছে। একজন বলছে এখন হাঁচি নিষিদ্ধ, কেন হাঁচছেন। আরেকজন নস্যির উপকারিতা বোঝাচ্ছেন। একটা বাচ্চা আমাদের দরজা ধাক্কাল, "ফুল কাকু ফুল কাকু কী করছ?"
আমার দিদির ছেলে ভুচুন। দিদি ভুচুনকে বকা দিয়ে বলল, "ফুলকাকু কাজ করছে। তুই চ"।
আমার "ওরা কাজ করে" কবিতাটা মনে পড়ে গেল। সমস্যা হল আমি কাজ করছি না। কত আশা ছিল, জম্পেশ বিয়ে হবে। সুন্দর ফুলশয্যায় সর্ষের তেল মালিশ করে সুহাগ রাত হে ঘুঙ্ঘট উঠা রাহা হু মে গাইব। এক করোনা সব আশার মাথায় কন্ডোম পরিয়ে দিল।
বউ শুল। আমি বললাম, "আপনার জীবনে আমিই প্রথম পুরুষ?"
বউ বলল, "হ্যাঁ"।
আমি বললাম, "হাত ধরার অফারটা আছে এখনও?"
বউ হাত এগিয়ে দিল। আমি ধরলাম। হাত থেকে স্যানিটাইজারের গন্ধ আসছে।
বললাম, "আপনার হাতটা বেশ সুন্দর"।
বউ বলল, "ফালতু ঢপ মারতে হবে না। আমার হাত শক্ত। ছেলেদের মত। চড় মারলে লাগে"।
আমি ঘাবড়ে গিয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, "কাউকে মেরেছেন বুঝি?"
বউ বলল, "হ্যাঁ, বাড়ি ফেরার সময় একটা লোক পিছু করছিল। দিয়েছি ধরে একদিন"।
আমি বললাম, "সেকী ভয় পান নি?"
বউ বলল, "ভয় পাওয়ার কী আছে? ইভ টিজার দেখলে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়"।
আমি বললাম, "শুধু ভূতে ভয় পান"।
বউ গম্ভীর হয়ে বলল, "ওটাই। আর কিছুতে ভয় পাই না"।
আমি বললাম, "আমার হাত নরম। দেখুন"।
বউ বলল, "হ্যাঁ। উল্টো। ছেলেদের হাত শক্ত হয়। মেয়েদের নরম"।

বউ আমার হাত টিপে টিপে দেখতে লাগল।
আমি শুয়ে রইলাম। হঠাৎ বাইরে থেকে দুম করে শব্দ এল। হৈ হৈ পড়ে গেল।
বাইরে বেরিয়ে দেখি বড় জ্যেঠিমা গোবর জল দিয়ে ঘর স্যানিটাইজ করতে গিয়ে পড়ে গেছেন। সবাই আমাদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। এর মধ্যে ড্রেস চেঞ্জও হয়ে গেল। সবার মুখে আমাদের নিয়ে প্রশ্ন বুঝতে পারলাম। একটাই ভাবনা, “এরা কি যুদ্ধটা করতে পারছে?” নেহাত ভদ্রতার খাতিরে কেউ কিছু বলতে পারছে না। আমাদের বাড়ির লোক সুশীল সমাজ টাইপ। অকারণে মুখ খুলে ক্যাচালে পড়তে চায় না। কারো সাতে পাঁচে থাকে না।
বউয়ের মেসো বলল, “আহ। তোমরা বেরোলে কেন? যাও যাও আমরা দেখছি। ক্যারি অন”।
আমি দরজা বন্ধ করে বললাম, “কী ক্যারি অন করতে বললেন তোমার মেসো?”
বউ শুয়ে পড়ে বলল “আমি কী জানি?”
আমি আবার স্যানিটাইজার দিলাম হাতে। বউ বলল, “আমায় একটু দাও তো। স্যানিটাইজার দিতে ভুলে গেছিলাম”।
আমি ওর হাতে স্যানিটাইজার দিলাম। ও হাত মুছে নিল। শাড়ির ফাঁক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গিরিখাতগুলো দেখা যাচ্ছে। আমি প্রাণপণে সেদিক দিয়ে চোখ সরিয়ে শুলাম। বউ বলল, “কী দেখছিলেন?”
আমি বললাম, “পৃথিবীতে অনেক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আছে তো। কোনটা কখন জেগে ওঠে কে জানে। আপাতত আমার আগ্নেয়গিরিটাকে ঘুম থেকে জেগে না উঠলেই হল। বাই দ্য ওয়ে, তুমিটাই ভাল লাগছে”।
বউ বলল, “মানে?”
আমি আলো বন্ধ করলাম। বললাম, “শুয়ে পড়ুন”।
কিছুক্ষণ চুপ চাপ।
হঠাৎ সেই শব্দটা হতে শুরু করল।
বউ আমায় পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল।
বউ বলল, “এপাশে ফিরে শোও। আমার ভয় লাগছে। ওরে বাবারে”।
আমি বউয়ের দিকে ফিরলাম। বউয়ের ঠোঁট আমার গালে লেগে গেল। বুক আমার বুকে। আমি বউয়ের গালে চুমু খেলাম। বউ কিছু বলল না। সাহস পেয়ে এবার ঠোঁটে খেলাম।
এবারেও চুপ।
ইদুর বীরদর্পে শব্দ করতে শুরু করল।
বউ আমার বুকে শক্ত করে মাথা দিয়ে শুয়ে রইল। আমার আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত করতে করতে লাভা উদগীরণ শুরু করল। আমি ক্যালানের মত শুয়ে থাকলাম। নড়তে গেলেও বউ নড়তে দিল না।
একসময় শব্দটা বন্ধ হল।
আমি বললাম, “ঠিক আছে, এবার শুয়ে পড়ুন তাহলে। কোয়ারান্টাইন কাটলে না হয়...” ভাবলাম উঠে প্যান্টটা পাল্টে আসব।
আমার কথা শেষ হবার আগে এবার বউই আমাকে টেনে নিয়ে ঠোঁটে ওর ঠোঁট বসিয়ে দিল।
আমি আর কী বলব। একে অপরকে মাউথ টু মাউথ অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়ে এল।
আগ্নেয়গিরি তাপ পরিবর্তন করে নদীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল।
বেশি কথা বললে অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন হতে পারে। তাই এর বেশি কিছু আর বলা গেল না...
#
পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি দুজনেই জন্মদিনের পোষাকে শুয়ে আছি।

বউ আমাকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। বুক ভর্তি সিঁদুর আমার। ওর মাথা থেকে এসে লেগে আছে।

মুছলাম না আর। বউয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হেসে ফেললাম।

স্যানিটাইজারের বোতলটা টেবিল থেকে কেমন রাগী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মাস্কদুটো তাকাচ্ছেই না আমাদের দিকে। গম্ভীর হয়ে ছাদ দেখছে যেন।

আমি বউকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজলাম।

লকডাউনে বেশি নড়াচড়া ভাল না।

যে যেখানে আছে, তাকে সেখানেই থাকতে হবে।

এক বিখ্যাত ভূ পর্যটক বলে গেছেন।

তার নামটা আর নিলাম না...

বিচ্ছেদ

বিচ্ছেদ একটা যন্ত্রণাকাতর অনুভূতি। আমি জানি না মানুষ কী করে এই বিচ্ছেদ থেকে বেরোতে পারে। আমি পারি না। প্রতি রাতে আমার ঘুম আসে না।
আমি একা মেসে জেগে বসে থাকি।
আমার শরীর সাড়া দেয়। রাগ হয়।
ইচ্ছা করে সব ভাংচুর করে দি। সোহিনীকে টেনে হিচড়ে রাস্তায় নামিয়ে খাবলে খুবলে রেখে দিই।
আমার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বললে হয়ত বুঝতাম রাগ করেছে। কোন অসুবিধা নেই, রাগ ভাঙানো যাবে। সেটা তো হল না।
ব্রেক আপের পরের দিনই আমি ফোন করলাম। অদ্ভুত শান্ত গলায় সোহিনী আমার সঙ্গে কথা বলে গেল। বুঝিয়ে দিল আমার থেকে ও বেরোবে এবার। বেরোবেই।
তার পর থেকে আমাকে ফোনও করে নি আর।
আমি পাগল পাগল হয়ে গেলাম। রোজ ফোন করি। ধরে হীমশীতল গলায় কথা বলে ফোন কেটে দেয়।
সোহিনী কেন এরকম করল বুঝতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল।
বাঘ যেমন নরমাংসের স্বাদ পেলে নরমাংসের নেশায় বিভোর হয়ে ওঠে, আমারও তাই হয়েছিল। প্রেমের থেকেও বেশি আমায় টানতে শুরু করল সোহিনীর শরীর।
কল্পনা করলাম, স্বমেহন করলাম, মদ খেয়ে পড়ে থাকলাম।
কোন লাভ হল না।
ঘুরে ফিরে সোহিনী আসতে শুরু করল আমার মাথায়। কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না।
পর্ণ সাইট দেখতে শুরু করলাম।
লাভ হল না।
শরীরের স্বাদ দেখায় মেটে না। সেক্স চ্যাটের সময় সোহিনী যে ন্যুডসগুলো পাঠাত, সেগুলো দেখতে দেখতে মাথা খারাপ হতে শুরু করে দিল।
সোহিনী যে আমাকে নিঃস্ব করে দিয়ে যাবে, বুঝিনি।
সোহিনীকে ভুলতেই হবে।
আবার ফোন করলাম। দেখলাম নাম্বার সুইচড অফ বলছে। ফেক প্রোফাইল থেকে দেখলাম ওর এক অফিস কলিগের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে।
থম মেরে বসে রইলাম।
মদ খেলাম অনেকটা। মদ খেয়ে সোহিনীকে টেক্সট করলাম "তোর ন্যুডসগুলো পাবলিক করব? দেখবি নাকি কেমন মজা?" অনেকদিন এই ইচ্ছাটা চেপে রেখেছিলাম। এবার হুমকি দিলাম। দেখে নেবো ওকে। এত সাহস! ছাড়ব না।
দেখলাম মেসেজগুলো পায় নি। অফলাইন আছে। ফোন করলাম। অফ বলছে।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে চৌরাস্তায় এলাম।
কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। একজনকে বললাম, "সোনাগাছি যাবে?"
সে গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সাতশো টাকা লাগবে"।

আমি দরজা খুলে গাড়ির ভিতরে বসে পড়লাম।
ট্যাক্সি স্টার্ট দিল।
ড্রাইভারকে বললাম, "সোনাগাছিতে আমি কোন দিন যাই নি"।
ড্রাইভার বলল, "কোন ব্যাপার না। সবাই একদিন শুরু করে"।
আমি বললাম, "সবাই?"
ড্রাইভার বলল, "সবাই"।
আমি বললাম, "দূর বাল, আমার বাবা কোন দিন সোনাগাছি গেছিল নাকি?"
ড্রাইভার বলল, "সেটা আমি কী করে বলব"?
বলে চুপ করে গেল।
আমি অবাক হয়ে গেলাম। মদের ঘোরে ছিলাম। তবু ড্রাইভারের কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ভুল কী বলেছে? যেতেই পারে? আমি কী করে জানব? মানুষ কোথায় কখন কীভাবে যাবে, আমি কী করে জানব? বাবাকে ফোন করব? জিজ্ঞেস করব?
একটু ভেবে বুঝলাম ঘোরের মাথায় কিছু করা ঠিক হবে না।
ড্রাইভার বলল, "কন্ডোম ইউজ করবেন"।
আমি বললাম, "কে তুমি? বুলা দি?"
ড্রাইভার চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পর বলল, "ওরাই দেবে না করতে। চিন্তা করবেন না। হেবি অ্যাডভান্স"।
আমি বললাম, "আমার কন্ডোম পোষায় না। রসগোল্লাকে প্লাস্টিকে ভরে তার বাইরে থেকে খেতে ভাল লাগে?"
ড্রাইভার চুপ করে গেল। উত্তর দিল না আমার কথার।
রাস্তায় মারাত্মক জ্যাম। কোন মিছিল যাচ্ছে। আমি জলের বোতলে মদ নিয়ে এসেছিলাম। চুমুক দিতে লাগলাম একটু একটু করে। ড্রাইভারের মনে হয় এরকম প্যাসেঞ্জারের অভ্যাস আছে। কিচ্ছু বলল না।
গাড়ি স্টার্ট নিল। আমি বললাম, "তুমি সোনাগাছি গেছো কাকা?"
ড্রাইভার বলল, "গেছি"।
আমি বললাম, "বউ জানে?"
ড্রাইভার বলল "সব কথা বউ কেন জানবে? সব কথা সবার জানার দরকার নেই"।
উচ্চ মার্গের দার্শনিক কথা। আমার ড্রাইভারকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করল।
আমি বললাম, "আমার সোনাগাছি যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই। তাও যাচ্ছি। আমাকে ছেড়ে চলে গেল মেয়েটা বুঝলে?"
ড্রাইভার বলল, "ও"।
সেরকম ইন্টারেস্ট দেখালো না।
আমি বললাম, "কী হল? কিছু বললে না? ও কেন?"
ড্রাইভার বলল, "কী বলব? আপনার দুঃখ আমি বুঝব কী করে? আমার দুঃখ আপনি বুঝবেন?"
আবার হাইলি ফিলোজফিকাল কথা বার্তা। বললাম, "দিনে কি সি ইউর প্রফেসারি কর কাকা? আর রাতে ট্যাক্সি চালাও? এত দার্শনিক তো সক্রেটিসও ছিল না। সক্রেটিসকে চেনো?"
ড্রাইভার এবারেও উত্তর দিল না। মদ আমি খাই বটে, কিন্তু সহ্য হয় না।
গাড়ি দাঁড় করাতে বললাম।

গাড়ি থেকে নেমে হড় হড় করে বমি হয়ে গেল। ভি আই পি রোডের ওপর বমি করছি। পুলিশের গাড়ি এসে গেল। আমায় বলল "ওই, কী করছিস?"

আমি নিজের মাথা নিজে চাপড়াতে চাপড়াতে বললাম, "বমি করছি"।

গাড়ি থেকে পুলিশ নেমে ড্রাইভারকে হম্বি তম্বি করতে লাগল। ড্রাইভার আমাকে ঠেলে গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল।

আমি বললাম, "পুলিশ ভাল না"।

ড্রাইভার বলল, "এটা ঠিক"।

আমি খুশি হলাম। এতক্ষণ পরে ড্রাইভার আমার সঙ্গে সহমত হয়েছে। বললাম, "কাকা আমার মত মাতাল গাড়িতে ওঠে তোমার?"

ড্রাইভার বলল, "রোজ ওঠে"।

আমি বললাম, "বাড়িতে তোমার কে কে আছে?"

ড্রাইভার বলল, "বউ আছে, আপনার বয়সী দুই ছেলে আছে"।

আমি বললাম "ছেলেরা সোনাগাছি যায় না?"

ড্রাইভার বলল, "জানি না"।

আমি বললাম, "সোনাগাছি গেলে দুঃখ চলে যাবে কাকা?"

ড্রাইভার বলল, "তাহলে শহরটাই সোনাগাছি হয়ে যেত। বুঝলেন?"

আমি সিটি বাজালাম। "কাকা আপনি প্রণম্য। পাশে থাকলে মাঝের পায়ে প্রণাম করতাম"।

ড্রাইভার এতক্ষণে হাসল। হো হো করে হাসতে শুরু করল।

আমিও হাসতে শুরু করলাম।

ড্রাইভার বলল, "বাড়িতে কে কে আছে?"

আমি বললাম, "বাবা আছে, মা আছে"।

ড্রাইভার বলল, "এক ছেলে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ"।

ড্রাইভার বলল, "তাদের সাথে কথা বলেন না?"

আমি বললাম, "বলি তো। কিন্তু বাবা মা কি সব পারে নাকি? বউ লাগে"।

ড্রাইভার বলল, "আপনি স্টুডেন্ট?"

আমি বললাম, "না। চাকরি করি। এই তো চাকরি পেলাম দু মাস হল"।

ড্রাইভার আর কিছু বলল না।

আমি বললাম, "কাকা মাঝে মাঝে সাইলেন্ট মোডে চলে যাও কেন?"

ড্রাইভার বলল, "সোনাগাছি গেলে নেশা হয়ে যাবে। তখন মাইনের সব টাকা ওখানেই ঢুকে যাবে"।

আমি বললাম, "আমার কাছে অনেক টাকা আছে। দাঁড়াও"।

মানিব্যাগ বের করতে গেলাম। নেই।

আমি বললাম, "কাকা, মানিব্যাগ ফেলে এসেছি"।

ড্রাইভার কোন কথা না বলে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল।

আমার মদ খেয়ে বমি করার পর ঘুম পায়। কী যে বকতে বকতে ঘুমিয়ে পড়লাম কে জানে।

ঘুম ভেঙে দেখি যেখান থেকে উঠেছিলাম সেখানেই ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

ড্রাইভার আমাকে আমার মানিব্যাগ ফেরত দিয়ে বলল, "বমি করতে গিয়ে পড়ে গেছিল। যান, বাড়ি যান"।

আমার কী হল কে জানে, আমি ড্রাইভারকে জড়িয়ে ধরলাম। রাস্তা ঘাটে লোকজন দেখছে। পরোয়া করলাম না।

চোখ থেকে অনেকটা জল পড়ে গেল। ড্রাইভার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার ছেলেরা সোনাগাছি যায় নাকি জানি না, কিন্তু আপনি গেলে ভাল হবে না। বাড়ি যান”।

আমি বেশ কয়েক সেকেন্ড ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললাম “কত দিতে হবে?”

ড্রাইভার হাসল, “সাবধানে বাড়ি ফিরুন। যান, টাকা লাগবে না”।

আমি হাঁ করে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ড্রাইভার বলল, “যান যান। আমার গাড়ি জমা দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আপনি চলে যান”।

আমি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে মেসের দিকে রওনা দিলাম।

ঘরে ফিরে বসলাম।

সোহিনী ফোন করছে।

ধরলাম। বলল “বল কী বলছিলি”।

আমি বললাম, “কিছু না। রাখি?”

সোহিনী বলল, “রাখি মানে? হুমকি দিচ্ছিস কেন? ন্যুডসগুলো নিয়ে কী করবি? কী চাস বল, চাইলে তোর সঙ্গে সপ্তাহে দুদিন শোব। তাহলে খুশি? শোন, আমি বুঝতে পারছি তুই কী চাইছিস। ব্ল্যাকমেইলটা করিস না। শোন শোন...”

আমি সোহিনীর মত ঠান্ডা গলায় বললাম, “চিন্তা করিস না। ডিলিট করে দিয়েছি। কিচ্ছু নেই আর। রাগের মাথায় বলে ফেলেছিলাম। আমার আর কিছু বলার নেই। ভাল থাকিস। আর কোন দিন তোকে জ্বালাব না। কথা দিলাম”।

সোহিনী বলল, “মানে? কেন কিছু বলার নেই? এই তো হ্যাংলার মত বার বার ফোন করে যাচ্ছিলি! হ্যালো, হ্যালো... হ্যালো”...

আমি চুপ করে ওর হ্যালো শুনতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে ফোনটা কেটে দিলাম।

বেশ বুঝতে পারছিলাম অনেক দিন পরে একটা ভাল ঘুম হবে।

নিশ্চিন্ত ঘুম...

নষ্টনীড়

রাস্তায় ক্রিকেট খেলছিল অভিরূপ।
গলি ক্রিকেট।
অনেক দিন পরে। ভাল লাগছিল ক্রিকেট খেলতে।
বনধের দিন।
অনেক দিন পর সফল বনধ হয়েছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলতে ইচ্ছা করল।
ওরা রবিবার করে ফেলে।
আজ বুধবার। বনধ বলেই খেলা হচ্ছে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা জমে উঠল। অনেক দিন পর হাত ঘুরিয়ে ক্যাম্বিস বলে বল করা। মন্দ লাগছিল না। বুঝতে পারছিল হাতে ব্যথা হবে পরের দিন সকালে, তবে পাত্তা দিল না।
পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন পর খেলার মজা আছে।
পলাশ ব্যাট করছিল। অভিরূপ খুব জোরে দৌড়ে এসে বলটা ফেলল। বাউন্সার হয়ে গেছিল। পলাশ ঠাহর করতে পারে নি। থুতনিতে লাগল। লাগার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।
পলাশ পড়াশুনোয় ভাল। খেলাধুলোয় অতটা না।
নরম প্রকৃতির ছেলে।
অভিরূপ দৌড়ে গেল। "কী রে, ঠিক আছিস তো?"
পলাশ থুতনি ধরে বসে পড়েছিল। চি চি করে বলল, "আমায় নামিয়ে দিয়ে আয়। আমি আর খেলব না"।
অভিরূপ বলল, "চ"।
পলাশ স্কুটি নিয়ে এসেছিল। পাশের পাড়ায় থাকে। ওর স্কুটিটা অভিরূপ চালাল।
পলাশ বলল, "বউকে বলিস না আমি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে কেলিয়েছি। খ্যাপাবে"।
অভিরূপ হাসল, "বলব না"।
অভিরূপকে বলতে বারণ করে বাড়ি গিয়ে পলাশ নিজেই বউয়ে সিমপ্যাথি আদায় করতে সব গড় গড় করে বলে বসল।
অভিরূপ লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকল।
বলল "আসি বরং"।
পলাশ বলল, "কোথায় যাবি? বস। একটু গল্প করি। কতদিন পর এলি"।
অভিরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসল। পলাশের বউ পলাশের কানে কানে কী একটা বলল।
পলাশ তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাই একটু বস, এক্ষুণি আসছি"।
অভিরূপ অবাক হয়ে বলল, "কোথায় যাবি?"
পলাশ বলল, "এই যাচ্ছি আর আসছি। তুই বস"।
অভিরূপ বুঝল পলাশ নিশ্চয়ই কোন খাবার আনতে যাচ্ছে। সে শ্বাস ছেড়ে বসল। পলাশ বেরিয়ে গেল।
পলাশ বেরোতেই পলাশের বউ তার সামনে বসে বলল, "আপনি কোথায় থাকেন? ওর বন্ধু?"
অভিরূপ বলল, "হ্যাঁ এই তো পাশের পাড়াতেই থাকি। আমরা ছোটবেলা থেকেই বন্ধু"।
পলাশের বউ বলল, "আমার নাম ইরা"।

অভিরূপ বলল, “আমি অভিরূপ”।
ইরা বলল, “আপনাকে আমি চিনি। আপনি আমাদের কলেজেই পড়তেন। সিনিয়র ছিলেন”।
অভিরূপ অবাক চোখে ইরার দিকে তাকিয়ে বলল, “তাই নাকি? আপনি আমাকে চেনেন?”
ইরা বলল, “হ্যাঁ। আপনি বিয়ে করেছেন?”
অভিরূপ মাথা নাড়ল, “না”।
ইরা বলল, “করবেন না?”
অভিরূপ বলল, “হ্যাঁ, করতে হবে। কেন বলুন তো?”
ইরা তার দিকে তাকিয়ে হাসল, “এমনি। আচ্ছা আপনার বন্ধু ছোটবেলা থেকেই বুঝি এমন মেয়েলী?”
অভিরূপ অবাক চোখে ইরার দিকে তাকাল, “মেয়েলী মানে?”
ইরা গভীর চোখে তার দিকে তাকাল, “মেয়েলী মানে যে ছেলের পৌরুষত্ব নেই”।
অভিরূপ অপ্রস্তুত হল। পলাশের বউয়ের মুখে এমন কথা সে আশা করে নি। বলল, “সেরকম তো ঠিক বলতে পারব না। আমরা একসঙ্গে খেলেছি এই অবধিই। এই পর্যন্তই”।
ইরা বলল, “আমার বাপের বাড়ি খুব গরীব। নইলে আমি এ বিয়েটা থেকে বেরিয়ে যেতাম”।
অভিরূপের অস্বস্তি শুরু হল। তার মনে হতে লাগল কখন পলাশ আসবে। এই কথাগুলো ওর বউ তাকে বলবে কেন?
কারও সংসারের ভিতরের কথা, তাকে বলার কী আছে?
সে কথা ঘুরাতে চেষ্টা করল, “আপনারা হানিমুনে কোথাও যান নি?”
ইরা বলল, “সিমলা। ওটাকে হানিমুন বলে না। যে কাপল হানিমুনে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে সারাদিন ঘরে না থেকে ঘুরতে বেরোয়, তাকে কি হানিমুন বলে? আমার কপাল”।
অভিরূপ বলল, “ওহ। আচ্ছা। আমি আসি?”
ইরা তার দিকে তাকিয়ে বলল, “ভয় পেলেন, তাই না? আমাকে আপনার খারাপ মেয়ে মনে হচ্ছে?”
অভিরূপ বলল, “এমা, না না, সেসব না। পলাশ দেরী করছে। আমি যাই”।
ইরা বলল, “পলাশ দেরী করবে। ওকে ইচ্ছা করেই দেরী করে আসতে বলেছি। আপনার আমাকে পছন্দ না?”
অভিরূপ চমকাল খানিকটা। মেয়েটা এরকম করছে কেন? সে বলল, “পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন তো আসবে না। আপনি আমার বন্ধুর বউ। আমার বোনের মত”।
ইরা বলল, “যদি বলি মাঝে মাঝে আসবেন, আমার সঙ্গে থাকবেন, রাজি হবেন?”
অভিরূপ বেরোতে পারছিল না। ইরার গলায় একটা অদ্ভুত আকুতি।
পরক্ষণেই নিজেকে সামলাল। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
ইরা পিছু ডাকল না। বসে রইল চুপ করে।
পলাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে জোরে হাঁটতে শুরু করল।
খানিকটা হাঁটার পর দেখল পলাশ স্কুটি নিয়ে রাস্তার মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাথাটা মাটির দিকে নামানো। সে দৌড়ে গিয়ে পলাশের কাছে গিয়ে বলল, “কীরে, আমাকে রেখে তুই কোথায় গেলি?”
পলাশ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে রইল বড় বড় চোখ করে।
অভিরূপ পলাশের হাত ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিল, “কীরে গান্ডু, কী হয়েছে বলবি তো?”
পলাশ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, “আমি সরি ভাই। বিয়েটা টেকাতে হেল্প কর না ভাই”।
অভিরূপ বলল, “মানে?”

পলাশ বলল, “বিশ্বাস কর, আমি ওকে খুব ভালবাসি। কিন্তু কী বলব... আমি...”
অভিরূপ বলল “ডাক্তার দেখা”।
পলাশ বলল, “দেখিয়েছি। লাভ হবে না। বিয়ে আমি করতে চাই নি। বাড়ি থেকে জোর করে দিল। ফুলশয্যাতে কিছু করি নি। ও ভেবেছিল লজ্জা। একটা সময় সেই করতেই হল। পারলাম না। হচ্ছিল না আমি জানতাম আমার হবে না। শোন, কেউ জানবে না, আমি থাকব না, তুই মাঝে মাঝে আসবি। আমি ওকে বলেই দিয়েছিলাম ও যার সঙ্গে খুশি সম্পর্ক করতে পারে ওর ফিজিক্যাল নিডসের জন্য। আমি কিছু বলব না। হঠাৎ করে তখন আমাকে ডেকে বলল ওর তোকে ভাল লেগেছে, আমি যেন চলে যাই”। পলাশের গলা হঠাৎ বেপরোয়া শোনাল।
অভিরূপ কয়েক সেকেন্ড পলাশের দিকে তাকিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, “ডিভোর্সটা কর। মিউচুয়ালি করে না। ভাল খোরপোষ দিবি। দরকার হলে ওর আরেকটা বিয়ে দে। এভাবে বিয়ে টেকাস না। এভাবে কিছু টেকে না। যাই রে”।
পলাশ মাথা নিচু করল।
অভিরূপ পলাশের কাঁধে একটা হালকা বাড়ি মেরে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করল।
পিছনে পলাশ কেঁদে চলল... নিঃশব্দে...

অসুখ

আমার মাসী ডাক্তার। তার করোনা ধরা পড়েছে। উপসর্গ নেই। তবে হোম কোয়ারান্টাইনে থাকার পরামর্শ পেয়েছেন।

বাবা সে কথা শুনে ফোনটা রেখেই আমার দিকে তাকিয়ে নার্ভাস গলায় বলল, "পাপান দেখ তো, আমার গলাটা কেমন ব্যথা ব্যথা করছে। আমার মনে হয় দিন ফুরাল"।

আমি বললাম, "ধুস। কিচ্ছু হয় নি। সব মানসিক"।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "না রে। আজ সবজি আনতে গেছিলাম না? সেখানে আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক খুক খুক করে কাশছিল। লোকটার শিওর করোনা আছে। রোগ লুকোচ্ছে। গরম জল বসা তো। তোর মাকে বললেই খ্যাক করে উঠবে। তুই গরম জল বসা। আমি একটু বিটাডিন দিয়ে গারগেল করে ফেলি"।

আমি গরম জল বসালাম। বাবা গজগজ করতে লাগল, "কোত্থেকে একটা রোগ এসে সবাইকে পাগল করে দিল। দিব্বি ছিলাম। কী যে হল! তোতন কোথায়?"

আমি বললাম, "উপরের ঘরে"।

বাবা বলল, "বউমাও উপরের ঘরে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ"।

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লকডাউন শুরুর ঠিক আগে দাদার বিয়ে হয়েছিল। ফুকেটে হানিমুন করতে যাবার কথা ছিল।

যেতে পারে নি। তাতে একদিকে বেঁচে গেছে। আমার কিপ্টে দাদার এখন এক্সটেন্ডেড হানিমুন চলছে। সারাদিন বউদিকে নিয়ে উপরের ঘরে থাকে। খেতে বেরনো ছাড়া বেশিরভাগ সময়টা ঘরেই বসে থাকে। খেতে বসলেও দুজন দুজনের দিকে নেশাতুর চোখে তাকায়। আমার ওদের দেখলেই কবিতা মনে পড়ে "ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ..."

অবশ্য ওরা শিশু নয়। শিশু তৈরীর চেষ্টা করছে বলা চলে। মার দাদার দিকে টান। বাবা দাদার নামে কিছু বললেই তেড়ে যাবে।

বাবা মুখ গোমড়া করে থাকে। খেতে বসে বাবার সামনেই দাদা বউদি একে অপরকে প্রেম বিলোলে বাবা রেগে যায়। এদিকে মার ভয়ে কিছু বলতে পারে না। দোতলার এক কোণে আমার ঘর। আরেক কোণে দাদাদের।

মা বাবা নিচের ঘরে থাকে। মা টিভি দেখছিল।

আমি বাবাকে গরম জল করে দিলাম।

বাবা গারগেল করতে করতে ব্যাজার মুখে বলল, "ছোটবেলায় তোদের শিক্ষা দেওয়াতেই গলদ হয়ে গেছে। উচিত ছিল আমার নিজের হাতে শেখানো। না শিখলে কঠোর বেত্রাঘাত করা। তা করি নি। এর ফল চোখের সামনে দেখতে পারছি। তুই চাকরি পেলেই বিয়ে করবি, তাই তো পাপান?"

আমি বাবাকে খুশি রাখার চেষ্টা করি, গম্ভীর মুখে বলি, "আমার শিগগিরি বিয়ের কোন প্ল্যান নেই বাবা"।

বাবা খুশি হল না। বলল, "সে তোর দাদাও একই কথা বলল। চাকরি পেয়েই কোত্থেকে যে কী ঘটিয়ে বসল। যাক গে, দাঁড়া আমি গারগেল করি"।

জলে বিটাদিন দিয়ে বাবা গারগেল করতে শুরু করল।
মাফলার বের করেছে। বৈশাখের তীব্র গরমে বাবা কুটকুটে মাফলার গলায় দিয়ে বলল, "গলাটা ঠিক লাগছে না। শোয়ার টেস্ট না কী বলে, করাবো নাকি রে?"
আমি বাবার কপালে হাত দিলাম। বরফের মত ঠান্ডা।
বললাম, "তুমি কাগজ পড়। তোমার কিচ্ছু হয় নি। বাজার আর যেতে হবে না। অনলাইনে কিনে আনব যা লাগবে"।
বাবা রেগে গেল, "থাম। শুধু অনলাইন শিখেছিস। অনলাইনে সব কেনা সম্ভব? এই অনলাইন বউ পেয়েই তোতনটা বখে গেল। একদম অনলাইন অনলাইন করবি না। আমি নিজে দেখে, দরদাম করে আনব"।
আমি ঘাড় নাড়লাম।
বাবা খাটে শুয়ে পড়ল।
আমি উপরের ঘরে গেলাম। দাদার ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে দুজনের খিলখিল হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দাদা বিয়ের আগে গম্ভীর লোক ছিল। এখন নিজের রিমোট কন্ট্রোল পুরোপুরি বউদির হাতে দিয়ে দিয়েছে। বউদি সারাদিন ধরে দাদাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে থাকে।
আমি ঘরে এসে মোবাইলে গেম খেলতে শুরু করলাম। স্ট্র্যাটেজি গেম। যথেষ্ট কঠিন। দেখি ফোন বাজতে শুরু করল। বাবা ফোন করেছে।
ধরলাম, "বল"।
বাবা বলল, "পিয়ালী এসেছে। আমার জ্বর জ্বর লাগছে। তোর মা আবার স্নানে গেছে। তুই তোর ঘরে নিয়ে বসা। আমার কেমন কেমন লাগছে"।
বিরক্ত হলাম। বাবার আবার করোনা বাতিক শুরু হল।
পিয়ালীদি পাড়ারই মেয়ে। এককালে সবাই জানতাম দাদার সঙ্গে পিয়ালীদির বিয়ে হবে।
সবাইকে অবাক করে দাদা অন্য জায়গায় বিয়ে করল।
নিচে নামলাম। দেখি পিয়ালীদি বসার ঘরে বসে কাগজ পড়ছে।
আমাকে দেখে বলল, "মেসো বলল, মাসী স্নানে গেছে। আমি যাই, বল?"
পিয়ালীদির এবাড়িতে অবারিত দ্বার। এই লকডাউনের সময়েও আসে।
আমাদের পাড়া গ্রীন জোন। প্রথম দিকে সবাই বাড়িতে থাকলেও ধীরে ধীরে আড় ভাঙছে। পিয়ালীদি কেন এসছে আমি বুঝতে পারি। পিয়ালীদির মধ্যে একটা কেমন কেমন ব্যাপার আছে।
দাদাকে খুশি থাকতে দেখে নিজে দুঃখের আগুনে পুড়ে যাওয়ার মত স্যাডিস্টিক প্লেজার পায় হয়ত। আমি বললাম, "তুমি আমার ঘরে এসো। মা ফিরলে নামবে না হয়?"
পিয়ালীদি খুশি হয়ে আমার সঙ্গে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, "সব ঠিক আছে বল?"
আমি ঘাড় নাড়লাম, "হ্যাঁ সব ঠিক"।
দাদার ঘর থেকে হাসির শব্দ আসছিল। পিয়ালীদির মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়েই ঠিক হয়ে গেল।
আমার ঘরে এসে বলল, "তোতন বউদির সঙ্গে দেখা করার কত ইচ্ছা, তোর দাদা ঘর থেকে বেরোলে তো!"
আমি লাজুক হেসে বললাম, "আমের আচার খাবে পিয়ালীদি? মা বানিয়েছে?"
পিয়ালীদি বলল, "দে"।
আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছাড়লাম।

মাকে বলতে হবে পিয়ালীদির আসাটা বন্ধ করতে। কেমন যেন একটা পাগল পাগল ব্যাপার দেখতে পাই ওর চোখে।

নিচে নেমে আচার নিয়ে এসে দেখি পিয়ালীদি দাদার ঘরের দরজায় কান পেতে আছে। আমাকে দেখেই স্বাভাবিক চোখে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "দে দে আচার খাই"।

আমি আর কিছু বললাম না। দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এই আচরণের কিছুই আমার স্বাভাবিক লাগে না।

পিয়ালীদি খানিকটা আমের আচার খেল। আমার খাটে বসে ম্যাগাজিন পড়তে লাগল।

আমি মোবাইলে গেম খেলা শুরু করলাম।

দাদাদের ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম।

শব্দটা পিয়ালীদিও পেয়েছে। সচকিত হল।

পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি গেম খেলছিলাম। খেয়াল করি নি অতটা। হঠাৎ পিয়ালীদি খাট থেকে নেমে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার ঠোঁটটা নিজের ঠোঁটে নিয়ে নিল।

আমি চমকে গেলাম। আটকাতে পারলাম না।

আমার ঘরের দরজা খোলা ছিল।

আমি আমের আচারের গন্ধ পেলাম আমার ঠোঁটে।

অবশ হয়ে গেলাম।

কয়েক সেকেন্ড চুমু খেয়ে পিয়ালীদি আমাকে ছেড়ে দিল। শুনলাম দাদার ঘরের দরজাটা জোরে বন্ধ হয়ে গেল।

পিয়ালীদির চুল আমার মুখে এসে পড়ছে। পিয়ালীদি আমার গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, "তোর দাদা কথা দিয়েছিল আমাকে বিয়ে করবে। তোর দাদাকে এখানে আসতে দেখেই এটা করলাম। কেন করলাম জানি না। রাগ করিস না। আসি"।

পিয়ালীদি আমাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম।

দাদার দরজা বন্ধ করার শব্দটা বড্ড কানে লাগল, এটুকুই বুঝলাম...

জীবন

মারাতে বুকের ব্যথাটা বুঝতে পারলেন অরুণাভ।
চাপ চাপ ব্যথা।
জ্বর ছিলই।
ঘুম ভাঙতেই ব্যথাটা এল হঠাৎ করে।
অরুণাভ উঠে আলো জ্বালালেন।
দু বছর আগে চলে যাওয়া স্ত্রী সুরূপার ছবির দিকে তাকালেন।
টেবিল থেকে জলের বোতল নিয়ে জল খেলেন।
ঘড়িতে রাত দেড়টা।
খোকাকে ফোন করার ইচ্ছাটা দমন করলেন।
রোগটা বুঝতে পেরেছেন দু দিন আগেই। পাড়ার পারিজাতের হয়েছে। পারিজাতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মাঝ রাতে। বাকিদের হোম কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে। সেদিনই সকালে পারিজাত তার কাছে এসে চা খেয়ে গেছে।
তাকে পাড়ার লোক জিজ্ঞেস করেছিল।
পারিজাতকে সবাই এই মারে কি সেই মারে।
অরুণাভ বলে দিয়েছেন পারিজাত তার বাড়িতে আসে নি। কেউ দেখে থাকলে ভুল দেখেছে।
নিজে ঠিকই জানতেন। সেদিনই সন্ধ্যেয় গলা ব্যথা।
অরুণাভ চেষ্টা করেন নি।
চেষ্টা করার কোন ইচ্ছেও নেই তার।
একদিন তো যেতেই হবে। যদি এভাবেই চলে যেতে হয়, যেতে হবে।
থাকার জন্য কেই বা এসেছিল?
পাড়ায় আতঙ্কের চোরাস্রোত বইছে। পাড়া কন্টেইনমেন্ট জোন হয়ে গেছে। বাঁশ পড়েছে। পাড়ার সবাই হোম কোয়ারান্টাইনে আছে।
পুলিশ থেকেই খাবার দিয়ে যাচ্ছে।
অরুণাভকেও চাল ডাল বাড়ির বাইরে নামিয়ে দিয়ে গেছে।
প্রশাসন করছে না বললে ভুল বলা হবে। করছে।
শত হাজার সীমাবদ্ধতা থাকলেও করছে।
কিন্তু এখন এত কিছু করেও শেষরক্ষা হচ্ছে না সেটাও সবাই বুঝতে পারছে। অসম্ভব, অস্বাভাবিক দ্রুতগামী একটা ভাইরাস। হাওয়ার চেয়েও দ্রুতগামী।
যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হাওয়ার চেয়েও দ্রুতগামী কী?
এ যুগে হলে হয়ত যুধিষ্ঠির বলে দিতেন, "করোনা ভাইরাস"।
অরুণাভ মৃদু ভলিউমে গান চালালেন। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে"।
এ গানের আবেদন চিরস্মরণীয়। চোখ বন্ধ করে গানটা পুরোটা শুনলেন অরুণাভ। দু চোখ বেয়ে জল নেমে পড়ল তার। সুরূপা যেদিন চলে গেছিল, সেবারে খোকা আসতে পারে নি।

অফিসে দারুণ কাজ।
পাড়ার ছেলেরাই সব করল।
বাপে তাড়ানো মায়ে খ্যাদানো ছেলেগুলো।
অরুণাভ সবাইকে খাইয়েছিলেন। স্ত্রী বিয়োগের দিনেও। নিজের মনেই বলেছিলেন, আরেকটা ছেলে হলে ভাল হত। খোকার মত ব্রিলিয়ান্ট নয়। এরকম বাপে খ্যাদানো মায়ে তাড়ানো টাইপ। যখন খুশি ডাকলে চলে আসবে।
একাকীত্ব এমনভাবে গ্রাস করে রাতগুলোতে, অরুণাভর আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় নি।
পেরে ওঠেন নি ঠিক। চেষ্টা করেন নি তা নয়। পেরে ওঠেন নি।
এসবে অনেক সাহস লাগে। আগুয়ান মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দিতে গিয়ে একটা বাচ্চার দিকে চোখ পড়ে গেছিল। স্কুল যাবে। মনে হল তিনি ঝাঁপ দিলে তো বাচ্চাটা স্কুল যেতে পারবে না।
পিছিয়ে এসেছিলেন। কখন কী মাথায় আসে নিজেই জানেন না। বুঝতে চেষ্টাও করেন না।
বড় বাড়িটাতে ভূতের মত বসে থাকতে আর ভাল লাগে না।
কেমন যেন অস্থির করা এক অনুভূতি। অথচ যৌবনটা তো এরকম যায় নি। বেশ জমজমাট ছিল সব কিছু। নিজেরা, বন্ধুরা, সবাই মিলে যে জীবনটা কাটিয়েছিলেন তা রীতিমত ঈর্ষণীয়। এখন সব কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ জীবনের এই এক অভিশাপ।
কাগজ কাটিং করে দেওয়ালে সাটিয়েছেন অরুণাভ। কী কী উপসর্গ বয়ে আনতে পারে ভাইরাস।
গলা ব্যথা থেকে তীব্র জ্বর। শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, ভেন্টিলেটর... তারপরে ইমিউনিটি না থাকলে মৃত্যু।
ইলেক্ট্রিক কেটলিতে গরম জল বসালেন। পরের গান শুরু হয়েছে, “আকাশ ভরা সূর্য তারা”।
“ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি, বনের পথে যেতে, ফুলের গন্ধে চমক লেগে, উঠেছে মন মেতে”।
মাথায় একবার ঢুকলে লাইনগুলো আর বেরোতে চায় না।
টি ব্যাগ দিলেন গরম জলে। দু চারবার টি ব্যাগ ডিপ করে চায়ে চুমুক দিলেন।
জ্বরে কাঁপুনি দিতে শুরু করেছে শরীর।
অরুণাভ খুশি হলেন।
শ্বাসকষ্টটা কখন শুরু হবে? তাহলে নিশ্চিন্ত। কাউকে কিচ্ছু বলবেন না। ঘরেই শেষ হয়ে যাবে সব।
এভাবেই হত একদিন। হয়ে যাচ্ছে। তার খুশি হবারই কথা।
খোকার জন্য অভিমান নেই তার। তারাই জোর করে পাঠিয়েছিলেন। বাপ মায়ের জন্য ছেলে কেন কষ্ট পাবে? সে নিজের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যা করার করুক। সুরুপা একটু ঘ্যান ঘ্যান করতেন। অরুণাভ বুঝিয়েছিলেন। পরে বুঝতেন।
গলায় গরম চা লাগলে আরাম লাগছে।
চা শেষ করে খাটে গিয়ে শুলেন অরুণাভ। জ্বর আসছে... ধুম জ্বর। চোখ বন্ধ করলেন।
এভাবেই আসুক মৃত্যু। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে...
#
ঘুম ভাঙল। ভাঙবে না ভেবেছিলেন। ভাঙল।
জানলা দিয়ে রোদ আসছে। শরীরে এক ফোঁটাও জ্বর নেই।
অরুণাভ উঠে বসলেন। বুকে ব্যথা, শ্বাস কষ্ট কিচ্ছু নেই।
সুরূপাও ছবি থেকে কেমন ভাবে যেন একটা হাসছেন।
অরুণাভ থার্মোমিটার বের করে দেখলেন। সাতানব্বই দশমিক পাঁচ।

একেবারেই স্বাভাবিক।
ঘরের বাইরে এলেন।
পাড়া একেবারেই স্বাভাবিক। অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে। পারিজাত হাসছে, “ওরে ভাই, নেগেটিভ রিপোর্ট। উফ, সবাই যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল! আসছি, চা বসা তো”।
সবাই বকা ঝকা করে পারিজাতকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।
বাপে খ্যাদানো মায়ে তাড়ানো ছেলেগুলো এখন পাড়ায় গরীব মানুষদের জন্য খাবারের ক্যাম্প খুলেছে। গরীবদের যেতে হচ্ছে না। এরাই প্যাকেট করে করে দিয়ে আসছে।
অরুণাভ একটু ইতস্তত করে একটা ছেলেকে ডাকলেন, ছেলেটা কৌতূহলী চোখে এসে বলল, “হ্যাঁ কাকু”।
অরুণাভ বললেন, “খিচুড়ির টাকাটা আমি দেব। যা লাগবে নিয়ে যেও”।
ছেলেটা হাসিমুখে চলে গেল।
অরুণাভ হাসি মুখে আরাম কেদারায় বসলেন।
এখনও কত কিছু বাকি আছে, এখনও কত “ফুলের গন্ধে চমক লেগে” মন মেতে ওঠা বাকি আছে...
অরুণাভ অনেক দিন পরে হাসলেন। চোখ বুজে নিঃশ্বাস নিলেন।
বেঁচে থাকার নিঃশ্বাস...

দাগ

নাম- আনোয়ার আলী

বয়স- ২৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্কুল যায় নি

প্রিয় নেশা- খুন

....

রাত সাড়ে আটটা।

কলকাতা শহরে একটা হাউজিং কমপ্লেক্সের একটা দু কামরার ফ্ল্যাট।

ছুরি দিয়ে মেয়েটার গলাটা কেটে চুপ করে বসে রইল আনোয়ার।

মেয়েটা থরথর করে কেঁপে স্থির হয়ে গেল। মাছি এসছে কোত্থেকে একটা। ঘুর ঘুর করছে মেয়েটার শরীরের কাছে।

মেয়েটার বয়স বাইশ। গলায় একটা সোনার চেনে লকেটে জি লেখা। জি দিয়ে নাম শুরু হবে হয়ত। আনোয়ার নামটা জানারও প্রয়োজন বোধ করে নি।

আনোয়ারকে মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড নিয়ে এসেছিল মেয়েটার ফ্ল্যাটে। মেয়েটা জানত না ওর বয়ফ্রেন্ড তাকে খুন করার জন্য নিয়ে এসেছে। কেন মেয়েটাকে খুন করা হবে, কারণ কী আনোয়ার জানে না। তার জানার ইচ্ছাও নেই। সে কন্ট্র্যাক্ট কিলার। টাকা নিয়ে খুন করে। কোন কিছুর বিস্তারিত জানার ইচ্ছা তার কোন কালেই নেই।

ঘরে ঢোকার পরেই মেয়েটার মাথায় বাড়ি মেরে ওকে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়। সে কাজ ছেলেটাই করে। ছেলেটাকে দেখে মেয়েটা ছেলেটাকে আদর করতে ঝাঁপায়, ছেলেটার হাতে একটা শক্ত টর্চ ছিল, সেটা দিয়ে ছেলেটা মেয়েটার মাথায় সজোরে মারে। মেয়েটা জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগে বিস্মিত হবার সময়টুকু পায় নি।

আনোয়ার ছেলেটাকে বলল, "আপনিও তো পারবেন মনে হচ্ছে"।

ছেলেটা তার দিকে না তাকিয়েই বলল, "নাহ। তুমি কমপ্লিট করে নিচে নেমে এসো"।

ছেলেটা নিচে নেমে গেল গাড়িতে অপেক্ষা করতে।

আনোয়ারকে খুন করে গাড়িতে চলে যেতে হবে।

শরীরটা নিথর হয়ে পড়ে আছে।

আনোয়ার কয়েক সেকেন্ড জ্ঞানহীন মেয়েটাকে দেখে গলায় ছুরিটা নিখুঁতভাবে চালিয়ে দিল। যেভাবে খাসী জবাই হয়। এখানে একটাই পার্থক্য।

মেয়েটা অজ্ঞান ছিল।

#

আনোয়ার বাথরুমে গেল। ঝকঝকে পরিষ্কার বাথরুম। লেবুর সুগন্ধ আসছে কোথা থেকে।

সে হাত আর ছুরিটা ভাল করে ধুয়ে নিল।

খুনটা আনোয়ারের পার্ট টাইম ব্যবসা। আদতে সে মুরগী কাটে। মুরগী কাটা আর মানুষের গলা কাটার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। মনের ভিতরে খুনী মানুষটা থাকতে হবে শুধু। তাহলেই সব সম্ভব।

ফোন বাজল আনোয়ারের। বয়ফ্রেন্ডটা ফোন করেছে। ধরল সে, “হ্যালো”।

“আরে তাড়াতাড়ি এসো। আর কতক্ষণ দাঁড়াব?”

আনোয়ার বলল, “আসছি”।

ফোনটা কেটে দিল।

নিরুপদ্রব অ্যাপার্টমেন্ট। পাশের ঘরে কী হচ্ছে কেউ খবর রাখে না। অদ্ভুত লোকজন। কাল যখন এরা জানতে পারবে এখানে একটা খুন হয়েছে, তখন সবার টনক নড়বে। তার আগে কিছুই হবে না।

আনোয়ার ছুরিটা মুছে মেয়েটার গায়ে বিছানা থেকে নিয়ে একটা চাদর বিছিয়ে দিল। দরজা বন্ধ করলে হবে না। তাহলে মেয়েটার লাশ পেতে দেরী হবে। লোক জানুক, খুনটা হয়েছে।

আনোয়ার ফ্রিজ খুলল।

খুন করার পর গলা শুকিয়ে যায়। হীম শীতল জল না খেলে ভাল লাগে না। সে ফ্রিজে জলের বোতল পেল না। কোল্ড ড্রিংক্স পেল। তাই ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিল অনেকটা।

ফ্ল্যাটটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছিল না তার।

কী সুন্দর সাজানো গোছানো।

তার বস্তির বাড়ির থেকে অনেক সুন্দর।

টাকা জমিয়ে এরকম একটা ফ্ল্যাট কেনার ইচ্ছে আছে আনোয়ারের। টাকা জমলে তো!

আজ পাবে এক লাখ টাকা। সে টাকা জুয়ার ঠেকেই শেষ হয়ে যাবে। নিজের মনেই হেসে ফেলল সে। কোল্ড ড্রিংক্সটা আরেকটু খেয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরোল সে। দরজাটা আলতো খোলা রাখল। কাল কাজের মাসী এসে বুঝলে বুঝবে।

সাত তলায় ফ্ল্যাট। আনোয়ার লিফট পছন্দ করে না। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামল। বিল্ডিং এর নিচে কোন সিকিউরিটি নেই। ছেলেটা জানিয়েছিল সিকিউরিটি আজ থাকবে না। সিসিটিভিও নাকি ছেলেটা কী কায়দা করে খারাপ করে রেখেছে দু ঘন্টার জন্য।

অনেক প্ল্যান করা।

আনোয়ারের জানতে ইচ্ছা হয় নি। সে জানতেও চায় নি ছেলেটা কেন ভালবাসার মানুষকে এরকম নিষ্ঠুরভাবে মেরে দিল। তার জানার দরকার নেই।

রাস্তার ওপর ক্রেটা গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়ির কাছে যেতে ছেলেটা গাড়ির দরজা ড্রাইভিং সিটে বসেই খুলে দিল।

আনোয়ার ছেলেটার পাশের সিটে বসলে গাড়ি স্টার্ট দিল।

গাড়িটা বিল্ডিং এর চত্বর ছেড়ে বেরনোর সময় গেটে দারোয়ান একটা লম্বা স্যালুট দিল। ছেলেটা পাত্তাও দিল না। কিছুক্ষণ পরেই বড় রাস্তায় নামল গাড়িটা।

ছেলেটা শ্বাস ছেড়ে বলল, “এত দেরী হল কেন?”

আনোয়ার বলল, “সাফ করছিলাম হাত, ছুরি”।

ছেলেটা বলল, “এতক্ষণ লাগে? ফিঙ্গার প্রিন্ট পাবে এর পরে। তুমি এক কাজ কর, আরো হাজার পঞ্চাশেক দিচ্ছি, দিন কুড়ি কোথা থেকে ঘুরে আসো”।

আনোয়ার গম্ভীর গলায় বলল, “সে হবে না”।

ছেলেটা অবাক গলায় বলল, “হবে না মানে? এর পরে পুলিশ ধরলে ভাল হবে?”

আনোয়ার বলল, “ধরবে না”।

ছেলেটা বলল, “কী করে জানলে?”

আনোয়ার বলল, "আপনার অনেক টাকা। সব কিনে নেবেন। জানি"।
ছেলেটা বলল, "টাকা থাকলে হয় না। অনেক অফিসার আছে যারা টাকা খায় না। তার ওপর মিডিয়া আছে। কখন কী খবর বেরিয়ে যাবে, রিস্ক নেওয়ার দরকার কী?"
আনোয়ার বলল, "আমি বুঝে নেবো। আমি কোথাও যাব না। কাজ আছে"।
ছেলেটা বলল, "কী এমন কাজ? আমি টাকা দিয়ে দেব বললাম তো"।
আনোয়ার বলল, "টাকা দিয়ে কিছু হবে না। আপনাকে ভয় পেতে হবে না। আমার দায়িত্ব। আমি বুঝে নেব। আমি পুলিশকে কিছু বলব না ধরা পড়লেও। ভয় নেই"।
এসি চলছিল। তবু ছেলেটার মাথায় ঘামের ফোঁটা দেখা যাচ্ছে।
ছেলেটা বলল, "তুমি শিওর?"
আনোয়ার বলল, "শিওর। পেমেন্টটা দিন"।
ছেলেটা রাস্তার বা দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল আনোয়ারের হাতে। আনোয়ার বলল, "পুরো আছে তো?"
ছেলেটা বলল, "দশ বেশি আছে"।
আনোয়ার কিছু বলল না। বস্তির পাশের চৌমাথায় নামিয়ে দিয়ে ছেলেটা চলে গেল।
আনোয়ার প্যাকেটটা জামার ভিতরে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। বস্তির বিভিন্ন ঘরে টিভি চলছে। শব্দ আসছে। কোথাও কেউ মদ খেয়ে বউ পেটাচ্ছে। আনোয়ার কোন দিকে না দেখে তার ঝুপড়িতে ঢুকল।
বেশ কয়েক জন আত্মীয়স্বজন এসেছে তাদের ঝুপড়িতে। তাকে দেখে বাচ্চারা দৌড়ে এল।
হৈ হৈ পড়ে গেল।
কাল তার বিয়ে।
#
আনোয়ারকে নিয়ে মেয়েরা মস্করা করতে লাগল।
আনোয়ার প্যাকেটটা তার টাকা রাখার ট্রাঙ্কে রেখে দিল।
বিহার থেকে ভাইয়েরা এসে তাকে মদের ঠেকে নিয়ে গেল। অনেক রাত অবধি মদ খাওয়া হল।
এক ভাই বলল, "ভাই পারবি তো?"
আদিরসাত্মক মজা শুরু হল। আনোয়ারও মজা করতে শুরু করল। খুব জোরে গান বাজানো হল। সবাই বেহেড হয়ে নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে ঠেকেই শুয়ে পড়ল।
সে যে একটা খুন করে এসেছে ভুলেই গেল সেটা।
#
পরের দিন দুপুরবেলা মেয়ের বাড়ি গেল তারা একটা বড় সুমো গাড়িতে।
কাজী বিয়ে পড়ানোর পর চলে গেল।
দুপুর বিকেল ভাল খাওয়া দাওয়া হল, খুব মজা হল।
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামল।
আনোয়ারকে ঘিরে শালীরা মজা করছিল এমন সময় আনোয়ার দেখল ছেলেটা ফোন করেছে, সে ধরল, "হ্যালো"।
"শহর ছাড়ো। সিসিটিভি একটা খারাপ হয়েছিল। আরেকটায় তোমাকে দেখা যাচ্ছে। আমি পালিয়েছি"।
ছেলেটার গলা ভীষণ উত্তেজিত শোনাল।
আনোয়ার বলল, "ঠিক আছে"।

চুপ করে বসে রইল সে। কলকাতা পুলিশ তার সম্পর্কে সব জানে। এতক্ষণে বস্তিতে হানাও পড়ে গেছে নিশ্চয়ই।

সে উঠে মার কাছে গিয়ে বলল, "আম্মি, আমার কাজ পড়ে গেছে। আমাকে যেতে হবে"।

মা বলল, "সে কী কথা? এখন কোথায় যাবি? কাল যা"।

আনোয়ার গলা নামিয়ে বলল, "পুলিশের লফড়া হয়ে গেছে। যেতে হবে"।

মা সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে যা। যাওয়ার আগে বিবির সঙ্গে কথা বলে যা"।

আনোয়ার বলল, "ওকে অনেকে নিয়ে বসে আছে। তুমি বলে দাও"।

মা সবাইকে বকে ঝকে আনোয়ারের বউয়ের কাছ থেকে সরিয়ে দিল।

আনোয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বউয়ের পাশে বসল।

ঘোমটা দিয়ে আছে তার বউ।

আনোয়ার বলল, "আমি এখন কাজে বাইরে যাচ্ছি। পরে আসব, ঠিক আছে? আম্মির কাছে থাকবে। আম্মির কথা শুনে চলবে"।

তার বউ ঘাড় নাড়ল।

আনোয়ারের যেটা কোন দিন হয় না, সে ইচ্ছেটা হল। সে বউয়ের ঘোমটা তুলল। সুন্দর মিষ্টি চেহারার মেয়ে।

পরক্ষণেই আনোয়ার চমকাল। তার বউয়ের গলা ভর্তি গয়না। সব থেকে বেশি জ্বল জ্বল করছে একটা সোনার চেন, জি লেখা লকেট।

সে বলল, "এই লকেটটা কোথায় পেলে?"

তার বউ চুপ করে রইল। আনোয়ার বলল, "কী হল? কথা বলছ না কেন?"

মেয়েটা এবারেও চুপ করে রইল।

আনোয়ার কয়েক সেকেন্ড বউয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

দরজায় ধাক্কা পড়ছে। বাইরে চিৎকার চ্যাঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পুলিশের গলা শুনল আনোয়ার, "এই শুয়োর দরজা খোল"।

আনোয়ার বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "বলবে না? কোথায় পেয়েছো?"

আনোয়ারের বউ আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে হেসে গলায় পরে থাকা বাকি গয়নাগুলো সরিয়ে দিল। আনোয়ার ছিটকে সরে গেল...

তার বউয়ের গলায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে ছুরির দাগ, এখনও তাজা রক্ত পড়ছে সে দাগ থেকে। মাছিটাও কোত্থেকে এসে ঘুর ঘুর করছে তাদের কাছে পিঠেই...

কামব্যাক

প্রথম বলটা বাউন্সার এল।

রাহুল ডাক করল।

বল করছিল অর্ণব। রাহুলের দিকে এগিয়ে এসে রাগী মুখে বলল, “তোর লাস্ট নেমটা দ্রাভিড় না, মনে রাখিস, দাস। তোর মাথা ফাটাবোই আজকে"।

রাহুল রাগল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার স্টান্স নিল। এবার আরও জোরে বলটা এল, কমেন্টেটরদের ভাষায় যাকে বলে "জুসি হাফভলি"।

অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল।

রাহুল সে বলটাও পা বাড়িয়ে ছেড়ে দিল।

অর্ণব কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে আবার রান আপ শুরু করতে রওনা দিল।

খেলা সবে শুরু হয়েছে। কোচ অরুণাভদার কড়া নির্দেশ আছে, কোন রকম প্ররোচনাতেই যেন পা না দেওয়া হয়।

রাহুল মুচকি হাসল। অর্ণব দৌড় শুরু করেছে।

এ বলটা গুডলেন্থ বল। শুধু ব্লক করার বল। রাহুল সে বলটাই পুল করল সজোরে। বিস্মিত অর্ণব দেখল বলটা উড়ে গিয়ে মাঠের বাইরে পড়ল।

অর্ণব ঘাম মুছল হাতের চেটো দিয়ে।

অরুণাভদা হাত তালি দিল বটে, তবে ইশারা করল ডিফেন্সিভ খেলতে।

অরুণাভর পরের বলটা হাফ ভলি ছিল। রাহুল প্রথমে ভাবল অফ ড্রাইভ করবে। পরক্ষণেই অরুণাভদার নির্দেশ মনে পড়ল।

মনঃসংযোগ হারাল, বলটা অফ স্ট্যাম্প উড়িয়ে দিল।

অর্ণব ছুটে এসে তার কানের কাছে বলল, “যা বাড়ি যা শুয়োরের বাচ্চা"।

রাহুল প্রতিক্রিয়া দেখাল না। চুপ করে বেরিয়ে গেল।

অরুণাভদা তার সঙ্গে কথা বলল না।

রাহুল সীমানার বাইরে গিয়ে হতাশায় গ্লাভসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সায়ন ফার্স্ট ডাউন গেল।

নীলাভ তার কাছে এসে বলল, “কী বলল রে তোকে অর্ণব?”

রাহুল বলল, “নিজের বাপের নাম বলল, বাদ দে"।

নীলাভ বলল, “খুব বাড় বেড়েছে। একদিন পাড়ার মোড়ে ধরে ধোলাই করব মালটাকে, দেখে নিস"।

রাহুল হতাশ মুখে বসে রইল।

একের পর এক উইকেট পড়তে থাকল। পল্লী সঙ্ঘ আটান্ন রানে অল ডাউন হয়ে গেল।

অশোক ইউথ ক্লাবের একটাও উইকেট পড়ল না। তারা অনায়াসে দশ উইকেটে ম্যাচটা জিতে গেল।

বেশি রেগে গেলে অরুণাভদা কারো সঙ্গে কথা বলে না।

চুপ করে বাইক নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। তাই করল।

রাহুল সাইকেলে উঠতেই দেখল অর্ণব তার দিকে এসে ওর গা জ্বালানো হাসিটা হেসে বলল, “কীরে শুয়োর, কেমন ভরে দিলাম বল? আর খেলতে আসবি? ফোট শালা"।

রাহুল উত্তর দিল না।

অর্ণব ক্রমাগত গালাগাল দিয়ে যেতে লাগল।

সাইকেল নিয়ে রাহুল যতটা সম্ভব জোরে চালিয়ে বাড়ি এল।

বাবা বাইরের ঘরে বসে আছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছে। কিটব্যাগ নিয়ে তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল, “তুই পড়াশুনায় মন দে। তোর দ্বারা হবে না। যে ছেলে হাফ ভলিতে বোল্ড হয়, তার ক্রিকেট খেলার দরকার নেই। দে ক্রাচটা দে"।

রাহুল বাবার ক্রাচ এগিয়ে দিল।

বাবা সেটায় ভর দিয়ে ঘরে যেতে যেতে বলল, “সামনে ক্লাস টুয়েলভ আছে। অরুণাভকে বলে দে লোকাল লীগ তুই আর খেলবি না। যেতে হবে না তোকে আর। কী রে, চুপ করে আছিস কেন? তুই বলবি, না আমি বলব?”

রাহুল বলল, “আমি বলে দেব"।

বাবা ঘরের ভিতর চলে গেল।

রাহুল চুপ করে বসে পড়ল সোফায়। মার ছবিটার দিকে তাকাল।

মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই বাবা এত কড়া হত না। তার হঠাৎ করে খুব অভিমান হল মার ওপরে।

২।

স্কুল থেকে বেরিয়ে আরেকটু এগোলে অনন্যাদের বাড়ি। অনন্যার মাধ্যমিক সামনে। অন্য দিন হলে রাহুল একটু দাঁড়িয়ে যায়। অনন্যা হাসলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। এদিন দাঁড়াল না। সাইকেলটা জোরে চালিয়ে চলে গেল।

বাড়ি এসে ঘরে ঢুকতে দেখল অরুণাভদা এসেছে। বাবা তার দিকে তাকিয়ে বলল, “ওকে বলে দিলাম, তুই আর খেলছিস না"।

রাহুল ভেবেছিল অরুণাভদা তাকে বাঁচাবে। ব্যাপারটা পুরো উল্টো হল। অরুণাভদা বলল, “ঠিকই, ওর আর খেলার দরকার নেই বিশুদা। সেই লেভেলের টেম্পারামেন্ট লাগে। টিম ক্যাপ্টেনই যদি ওপেন করতে গিয়ে উইকেটটা অপোনেন্টকে ওভাবে গিফট করে আসে, টিম খেলবে কী করে?”

রাহুল বলতে যাচ্ছিল টিমের বাকিরা কী করতে আছে, কিন্তু বলল না। বাবা গতকাল থেকেই ভীষণ রেগে আছে। সে মুখ খুললে আরও রেগে যেতে পারে ভেবে ঘরে ঢুকে গেল।

খানিকক্ষণ পর অরুণাভদা তার ঘরে এসে বলল, “ভাল করে পড়াশুনা কর। তোকে আমরা বাইরে রাখছি এখন"।

রাহুল কাতর গলায় বলল, “পরের ম্যাচটাও তো ইউথের সাথেই আছে অরুণাভদা। একটা লাস্ট চান্স দাও। তারপর না হয় বাদ দিও"।

অরুণাভদা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বলল, “ওপেনিং করতে পাঠাবো না তোকে। সেকেন্ড ডাউনে নামাব। তুই আর্লি আউট হলে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। রাজি?”

রাহুল খুশি হয়ে বলল, “রাজি"।

ঘরে বাবা এল। বলল, “কী কথা হচ্ছে?”

অরুণাভদা বলল "লাস্ট চান্স চাইছে তোমার ছেলে। আমি দিতে চাই। তুমি?”

বাবা রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলল, “পারবি? তুই ঠিক কর। আমি কিছু বলব না। ক্লাস টুয়েলভ ফেল করলে খেপ খেলে বেড়াতে হবে সেটা জানিস তো?”
রাহুল বলল, “চেষ্টা করব"।
বাবা ঘাড় নাড়ল, “চেষ্টা না। পারবি নাকি বল"।
রাহুল বলল, “পারব"।
বাবা অরুণাভদার দিকে তাকাল, “পরের ম্যাচে রান না পেলে ওর ক্রিকেট খেলা আমি বন্ধ করে দেব। এটা বলে দে ওকে"।
অরুণাভদা খানিকটা চমকাল বাবার কথা শুনে। পরক্ষণে বলল, “তাই হবে"।
দুজনে ঘর থেকে চলে গেলে রাহুল মুখ কালো করে বসে রইল। ক্রিকেটটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিলে সে বাঁচবে কী করে?
৩।
অনন্যার সঙ্গে দেখা হল আর এস স্যারের কোচিঙে। জুনিয়রদের ব্যাচটা ঢুকছিল।
অনন্যা অন্যান্যদিন হেসে চলে যায়। এবার তাকে দেখে সবার সামনে তার বন্ধু পৃথাকে বলল, “কিছু কিছু লোকের আজকাল খুব ঘ্যাম হয়ে গেছে জানিস তো পৃথা"।
রাহুল হাসার চেষ্টা করল।
অনন্যা তাকে পাত্তা না দিয়ে স্যারের ব্যাচে পড়তে ঢুকে গেল।
রাহুলের একটু মন খারাপ হল। অনন্যা রেগে গেলে তার দিন খারাপ যায়।
তবে বেশিক্ষণ সময় পেল না সে। ব্যাচ শেষেই প্র্যাক্টিসে ছুটতে হয়। নীলাভ ব্যাট করছিল। অরুণ ফাস্ট বল করছিল।
রাহুল মাঠে গিয়েই প্যাড পরতে শুরু করল।
অরুণাভদা সেটা দেখে বলল, “এই যে হিরো হীরালাল, প্যাড না পরে আগে চার পাক দে। ওয়ার্ম তো ভুলেই গেছিস। আজ তোকে ব্যাট দেবো না। দৌড়বি। ফিল্ডিং করবি। তারপরে কথা”।
রাহুল বলল, “কিন্তু নেট না করলে কনসেন্ট্রেট করব কী করে অরুণাভদা?”
অরুণাভদা মাথা নাড়ল, “উহু, আগে ফিটনেস। তারপর ব্যাটিং। ফিট থাকিস না বলেই মাঠে গিয়ে অধৈর্য হয়ে যাস। আর তোর পেট বাড়ছে কেন রে? ইনজামাম হবার ইচ্ছা আছে নাকি? যা দৌড়ো”।
অগত্যা প্যাড আবার কিটে ভরে মাঠ জুড়ে দৌড়তে শুরু করল রাহুল। একা একা দৌড়তে হচ্ছিল বলে ভাল লাগছিল না, কিন্তু অরুণাভদা ভীষণ রাগী লোক। এমনিতেই রেগে আছে। এখন রাগলে যদি ম্যাচে বসিয়ে দেয়, সেই ভয়েই সে চারের জায়গায় পাঁচ পাক দিয়ে নিল।
জিভ বের করে তাকে হাঁফাতে দেখে অরুণাভদা এসে বলল, “এবার প্যাড আপ কর। এবার তোর ব্যাটিংটা দেখব”।
রাহুল অরুণাভদার দিকে তাকিয়ে হাসল, “ওকে”।
প্যাড পরে নেটে নামল। তখনও হৃদযন্ত্রটা সাড়াশব্দ করে যাচ্ছিল। জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস নিয়ে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করার চেষ্টা করল সে।
অরুণাভদা বল নিল।
রাহুল সতর্ক হল। অরুণাভদা এখনও মারাত্মক ফাস্ট বল করে। হালকা রান আপ নিয়ে ছুটে এসে অরুণাভদা সেই জুসি হাফ ভলিটাই দিল। রাহুল ফ্রন্ট ফুট ডিফেন্স করল।
অরুণাভদা পরের বলটাও একই জায়গায় দিল।

এবারেও রাহুল ফ্রন্টফুট ডিফেন্সই করল।

অরুণাভদা খুশি হয়ে বলল, “জানোয়ার ছেলে, ম্যাচের দিন কী হয়? নে, এবার ড্রাইভ কর। আর ডিফেন্স করতে হবে না। আমি তোকে ফ্রি ফ্লোয়িং খেলার লাইসেন্স দিলাম”।

পরের যে ক’টা বল অরুণাভদা করল, প্রতিটা ব্যাটের মাঝখানে লাগল রাহুলের। অরুণাভদা বলল, “গুড। এবার ফিল্ডিং করবি চ”।

নেট থেকে বেরিয়ে প্যাড খুলছিল রাহুল। নীলাভ বলল, “একটা কথা বলি রাহুল?”

রাহুল বলল, “বল”।

নীলাভ বলল, “অর্ণব কেন তোকে সেদিন অকারণ গালাগাল দিচ্ছিল জানিস?”

রাহুল বলল, “কেন?”

নীলাভ বলল, “অর্ণব অনন্যাকে নাকি প্রপোজ করেছিল। ওকে অনন্যা রিজেক্ট করে দিয়েছে। সামহাউ অর্ণব জানতে পেরেছে, তোদের মধ্যে কিছু আছে... তাই আর কী”।

রাহুল অবাক হয়ে নীলাভর দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড থমকে বলল, “ওহ। আচ্ছা”।

নীলাভ বলল, “তুই কিছু বলবি না এ ব্যাপারে?”

রাহুল বলল, “না, ইটস ওকে”।

৪।

কীটব্যাগ নিয়ে প্র্যাকটিস থেকে ফেরার সময় রাহুল কোন দিন অনন্যাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ফেরে না। এদিন ফিরল। অনন্যা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল।

রাহুল সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনন্যা তার দিকে কঠিন চোখে তাকাল কয়েক সেকেন্ড। আগের দিনের রাগ রাহুল বুঝতে পারল।

চারদিক তাকিয়ে নিজের কান ধরল।

অনন্যা ফিক করে হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

রাহুল হেসেই গম্ভীর হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে দেখল বাবা টিভিতে খেলা দেখছে। বলল, “ম্যাচটা কালকে না?”

রাহুল বলল, “হ্যাঁ”।

বাবা বলল, “বস”।

রাহুল বসল।

বাবা টিভি মিউট করে বলল, “দেখ, তোকে আমি একটা কথা বলি। আমার পা-টা ওরা ভেঙে দিয়েছিল ট্রায়ালের আগের দিন। স্টেট খেলতাম হয়ত। পারি নি। তুই এ গল্প জানিস। নতুন করে বলার কিছু নেই। তোকে শুধু একটা কথাই বলব। আমি কোন দিন আমার ইচ্ছা তোর উপর চাপিয়ে দিই নি। তুই নিজের যোগ্যতায় ক্রিকেট খেলিস। তোর কাছে আমার একটাই প্রত্যাশা। যেটা করবি জীবনে, মন দিয়ে করবি। যদি বিড়িও বিক্রি করিস, সেটাও মন দিয়ে করিস। ক্যাজুয়াল হোস না কোন দিন। একটা গুডলেন্থ বল অত ভাল পুল করে কীভাবে কেউ তার পরে হাফভলিতে বোল্ড হয়? কেন সিরিয়াস না তুই?”

রাহুল বলল, “কালকের দিনটা তো বাবা। দেখো আমি সিরিয়াস কী না”।

বাবা টিভিতে সাউন্ড দিয়ে বলল, “ঠিক আছে। যা। তোকে আর কিচ্ছু বলব না। কালকের দিনটায় দেখব তুই কী করিস”।

রাহুল চুপ করে নিজের ঘরে গিয়ে বসল।

৫।

উইকডেজে লীগ ম্যাচগুলোতে লোক না হলেও শীতের রবিবারে লোক গিজগিজ করে।
মাঠের চারপাশে বেশ ভিড় হয়েছে। টসে ইউথ জিতে ব্যাটিং নিল। পঁচিশ ওভারের ম্যাচ।
আগে জানত না রাহুল। অবাক হয়ে দেখল ইউথ কলকাতা থেকে দুজন ওপেনার নিয়ে এসেছে। দুজন ফাস্ট বোলারও। তার মানে অর্ণবে রক্ষা নেই। আরো দুজন দোসর।
কলকাতার ওপেনার দুজন ব্যাট করতে নেমে যথেচ্ছ পেটাতে শুরু করল।
রাহুল বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করছিল। অরুণাভদা তার কাছে এসে বলল, "রাহুল, এই ম্যাচটা হারলে আমরা চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বাইরে। এদের অন্তত একটাকে আউট করতে হবে"।
রাহুল বলল, "আমি বল করছি"।
অরুণাভদা বলল, "তুই নেটেই বল করিস না। এখন যাস না"।
রাহুল স্কোর দেখল। সাত ওভারে বাহাত্তর। বলল, "এক ওভার দেখি"।
অরুণাভদা মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইল। এবং যা ভয় পেয়েছিল তাই হল।
বল করতে গিয়ে রাহুল লাইনই ঠিক রাখতে পারল না। চারটে ওয়াইড করল। এক ওভারে বাইশ রান দিল। মাথা নাড়তে নাড়তে যখন ফিরল দেখল অরুণাভদা চলে গেছে। রাহুল বুঝল ভীষণ রেগে গেছে।
ইউথের সাপোর্টাররা হঠাৎ করেই রাহুলকে বিচ্ছিরিভাবে খ্যাপাতে শুরু করল, "ওরে এটা সেই খোঁড়া বাপির ছেলে না? ছেলেটার আজ বিচি কাটা যাবে রে"।
বিচ্ছিরিভাবে কয়েকজন আওয়াজ দিতে শুরু করল। দাঁতে দাঁত চেপে ফিল্ডিং করতে লাগল রাহুল।
একটা সময় অসহ্য হয়ে আম্পায়ারকে জানাল। আম্পায়ার বললেন, "লোকাল গ্রাউন্ড, গ্যালারি নেই, আমাদের তো কিছু করার নেই। কী করব বল?"
নীলাভ এগিয়ে এসে বলল, "আমি লঙে যাচ্ছি। তুই বরং স্লিপে থাক"।
রাহুল বলল, "না। আমিই থাকব। যা বলে বলুক"।
রাহুল চুপ চাপ ডিপ মিডউইকেটে চলে গেল আবার। কলকাতার এক জন ওপেনার আউট হতে ইউথের আব্দুল নামল। আর কাউকে আউট করতে পারল না পল্লী সঙ্ঘ। পঁচিশ ওভারে দুইশো বাইশ করে ফেলল ইউথ।
ব্রেকে অরুণাভদা শুধু বলল, "তোরা যা পারিস কর। আমি আর কিছু বলব না। আজই লীগের বাইরে চলে যাব। কী বলব বল?"
রাহুল বলল, "আমি ওপেনই করব। নীলাভ যাক আমার সঙ্গে"।
অরুণাভদা বলল, "বাহ। ভুলে গেলি কী কথা হয়েছিল?"
রাহুল বলল, "ভুলি নি। কিন্তু শুরু থেকে না মারতে পারলে এ ম্যাচ বেরোবে না। ক্যাপ্টেন হয়ে পরে নামলে ওরা বলবে ভয় পেয়েছে। সেটা ভাল হবে? আমাকে নামতে দাও"।
অরুণাভদা বলল, "এর আগে নিজে বল করে বাইশ দিলি। এবার ব্যাট করে ডোবাতে চাস তাই তো? যা, যা পারিস কর"।
রাহুল বলল, "ঠিক আছে। যাক যারা যাবে। আমি পরেই যাব"।
অরুণাভদা বলল, "গুড। নীলাভ আর রাতুল যা। তুই প্যাড পরে বস। ফার্স্ট ডাউন যাবি"।
রাহুল আর কিছু বলল না। চুপ করে বসে রইল।
নীলাভ আর রাতুলকে অরুণাভদা ডিফেন্সিভ খেলতে বলে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ প্রথম পাঁচ ওভারে মাত্র পনেরো রান হল। সবাই বিচ্ছিরিভাবে প্যাক মারতে শুরু করল। ইউথের লোকেরা তাদের কাছে এসে এসে বলে যাচ্ছে, "ওরে, পঞ্চাশ পেরোস বাপু"।

রাহুল দেখতে পেল অর্ণব বিচ্ছিরিভাবে হাসছে। সে উঠে দাঁড়াল। অরুণাভদা বলল, “কী হল?”
রাহুল বলল, “কিছু হয় নি। ওয়ার্ম আপ করছি”।
অরুণাভদা বলল, “হু”।
এক অত্যুৎসাহী ইউথ সমর্থক তাদের কাছে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, “ওরে আমাদের অয়নদার সঙ্গে পাঙ্গা নিয়েছিল বলে বাপির ঠ্যাঙ খোড়া করে দিয়েছিল অয়নদা। আজ ওর ছেলের ঠ্যাঙ ভাংব আমরা”।
অরুণাভদা লোকটাকে তাড়িয়ে দিল। তাকে বলল, “ওসব শুনবি না”।
রাহুল মাথা নাড়ল, “না না। ঠিক আছে”।
ইউথের প্রেসিডেন্ট অয়ন সেন। মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। চোখে কালো চশমা। লোকটা ঠিকই বলেছে। এই অয়নের লোকজনই তার বাবার পা ভেঙেছিল। তারপর থেকে বাবা আর কোন দিন দাঁড়াতে পারল না। মার স্কুল শিক্ষিকার চাকরিটা না থাকলে তাদের পরিবার পথে বসত।
রাহুল চুপ করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল। নীলাভ ঠুকতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ দিল।
সে ক্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করল। অরুণাভদা পিছু ডাকল, “দেখে খেলিস”।
ইউথের সমর্থকরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল তার বাবার নামে।
তাদের রান সাত ওভারে বাইশ। এক উইকেট গেছে।
আঠেরো ওভারে দুশো এক রান করতে হবে। মানে একশো আট বলে দুইশো এক। ইউথের লোকেরা বাজি এনেছিল। ফাটাতে শুরু করেছে। পল্লীর লোকেরা বাড়ি যাওয়া শুরু করেছে। রাহুল ক্রিজে গিয়ে রাতুলকে বলল, “রান নিয়ে আমাকে দিস”।
রাতুল বলল, “কী জোরে বল করছে রে কলকাতার ছেলেদুটো। দেখতেই পারছি না বল”।
রাহুল বলল, “গায়ে লাগিয়ে যেখানে খুশি লাগিয়ে আমাকে স্ট্রাইকটা দিস”।
রাতুল ঘাড় নাড়ল।
কলকাতার পেশার রাকেশ পাল প্রথম বলটাই বাউন্সার দিল রাতুলকে। রাতুল ছেড়ে দিল। ইউথের সমর্থকরা হৈ হৈ করে উঠল আনন্দে।
তার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল বাউন্সারে কীভাবে রান নেবে।
রাহুল হাসল।
পরের বল ইয়র্ক লেন্থে ছিল। কোনভাবে মিড উইকেটে ঠেলে দৌড় মারল রাতুল।
রাহুল স্ট্রাইকে গেল। অর্ণব স্লিপে ছিল। তাকে দেখে বলল, “কীরে ল্যাংচোদার ছেলে। ভাল আছিস?”
রাহুল একবার অর্ণবের দিকে তাকাল। আরেকবার অয়ন সেনের দিকে। স্টান্স নিল।
অর্ণব দৌড়ে গিয়ে রাকেশকে কানে কানে কিছু বলে এল।
রাকেশ প্রথম বলটা হাফভলি দিল। ঠিক যে বলে আগের ম্যাচে রাহুল আউট হয়েছিল।
এবারে এক সেকেন্ডও দেরী না করে বলটাকে সজোরে তুলে মারল রাহুল। অবলীলায় বলটা মাঠের বাইরে চলে গেল।
ছয় রান। মাঠের বাইরের গালিগালাজ স্তিমিত হয়ে গেল। পল্লী সংঘের সমর্থকরা সাইকেল রেখে আবার ফিরে এল। অরুণাভদা বাইরে থেকে তাকে প্রাণপণে ইশারা করতে শুরু করল, “ধরে খেল, আউট হোস না”।
রাকেশ তার দিকে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকাল। রাহুল কোন কথা না বলে আবার স্টান্স নিল। পরের বল অফ সাইডে ছিল। রাহুল গ্যাপ দেখে স্কোয়ার কাট খেলল। নিখুঁত চার।

এর পরে এলাকার মানুষ দেখল এক অনন্যসাধারণ নিখুঁত ব্যাটিং। প্রতিটা বল ব্যাটের মাঝখানে লেগে কোনটা বাউন্ডারি, কোনটা ওভার বাউন্ডারি হতে লাগল। রাতুল আউট হল, তাতে রাহুলের কোন অসুবিধা হল না। অর্ণবের একটা বলে তিনটে চার, দুটো ছয়। শেষ বলটা স্ট্রেট ড্রাইভ মারল। বল আটকাতে গিয়ে ঠিক গোড়ালির উপরে বলটা লাগল অর্ণবের। পা ধরে শুয়ে পড়ল।
স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল অর্ণবকে। বিয়াল্লিশ বলে সেঞ্চুরি করল রাহুল। তার মধ্যে একটা শটও ব্যাকরণ বহির্ভূত নয়। তিন ওভার বাকি থাকতে ম্যাচ জিতল পল্লী সংঘ। খেলা শেষে ইউথের সমর্থকরাই তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করল, “কতদিন পর এরকম ব্যাটিঙ দেখলাম। উফ গুরু, তুমি সেরা”।
অরুণাভদা জড়িয়ে ধরল।
শুধু বলল, “বাপিদা কেন যে তোর নাম রাহুল দিল শালা, বীরেন্দ্র রাখা উচিত ছিল নামটা”।
রাহুল হাসল।
অয়ন সেন দাঁড়িয়ে ছিল তার জন্য। তার কাছে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, “তুমি বাপির ছেলে, তাই না?”
রাহুল মাথা নাড়ল।
অয়ন সেন তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, “অনেক বড় হও”।
৬।
রাহুলের বাড়ি ফিরতে একটু দেরী হল। অনন্যাদের বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট চক্কর কাটতে পাঁচ মিনিট লাগল। অনন্য দাঁড়িয়ে ছিল। রাহুল সাইকেল সারানোর অভিনয় করে বসে সাইকেলের টায়ারের ফাঁক দিয়ে অনন্যাকে দেখল কিছুক্ষণ। অনন্যা চারদিকে তাকিয়ে তাকে একটা উড়ন্ত চুমু দিল।
রাহুল আর দাঁড়াতে সাহস পেল না। কেউ দেখলে নির্ঘাত গণপ্যাদানি দেবে তাকে। মেয়েটা যা তা একেবারে।
হাসতে হাসতেই গম্ভীর হয়ে গেল সে। বেশি হাসলে বাবা রেগে যায়। বলে ফোকাস নড়ে যায় নাকি।
বাড়ির সামনে এসে একটু অবাক হল সে।
একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তাদের বাড়ির সামনে। গেট খুলে সাইকেল রেখে ঘরে ঢুকে দেখল বাবার হাঁটুর কাছে মেঝেতে বসে অয়ন সেন বসে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে আর বলছে “আমাকে ক্ষমা কর বাপিদা। আমি সারাজীবন তোর জন্য মরমে মরে গেছি। প্লিজ ক্ষমা কর বাপিদা”।
বাবা তাকে দেখে বিব্রত হয়ে বলল, “এই অয়ন, ধুস, যা তো, পাগল কোথাকার। যা করেছিস বেশ করেছিলি। তুই কী খারাপ খেলতিস নাকি। কম বয়সে ওরকম ভুল একটু আধটু সবাই করে। তুই স্টেটে ভালই তো খেলেছিলি। বেঙ্গলে খেলেছিলি বলে ইন্ডিয়া টিমে চান্স পেলি না। এখন আর এসব মনে রাখিস না। এই খোকা, ওকে তোল তো। কেমন পেগলে গেল ছেলেটা”।
অয়ন বললেন, “শোন বাপিদা, তোর ছেলের দায়িত্ব আমার। ওকে আমি অ্যাটলিস্ট স্টেট খেলাব। ওর কিটস নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। খেলতে যা লাগবে আমি দেব। এইটুকু করতে দে আমাকে। প্লিজ। তোর ছেলে কমদামী ব্যাটে খেলে। ওই প্যাডগুলিও কমদামী। লেগে যাবে। আমি কিনে দেব। এইটুকু করতে দে, প্লিজ”।
বাবা রাহুলের দিকে তাকাল, “কীরে? খুশি?”
রাহুল অয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, “চা খাবে কাকু? আমি চা ভাল করি। খেয়ে দেখো। আর প্যাড, গ্লাভস তো আমার মা কিনে দিয়েছিল, অন্য কোন কিটে আমি খেলতেই পারব না। নিজের যোগ্যতায় যদি স্টেট

খেলতে পারি, তাহলেই খেলব। এখনো লেগ গ্লান্সটা ভাল করে করতে পারি না। শিখিয়ে দিও তো। বাবা খুশিই হবে তাতে। তুমি বস। চা খেয়ে যাও”।

অয়ন সেন হাঁ করে তার দিকে তাকাল। বলল, “তুমি শিখবে আমার কাছে?”

রাহুল বলল, “কেন শিখব না? বাবা এখনো তোমার লেগ গ্লান্সের প্রশংসা করে। কতবার বলেছে লেগ গ্লান্সটা যদি তোমার থেকে শিখতে পারতাম, তাহলে খুব ভাল হত”।

অয়ন রাহুলের বাবার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

রাহুল লাফাতে লাফাতে ঘরের ভিতর গিয়ে মায়ের ছবিতে একটা চুমু খেয়ে বলল, “জিতেছি মা... আমরা জিতেছি। ব্যাটিঙের সময় শুধু তোমাকে ডেকে গেছি জানো? আর ইয়ে, বলছি কী, আমার এখনো আঠেরো বছর হয় নি, ফ্লাইং কিস কি খুব খারাপ বল? আচ্ছা রাতে কথা বলি? অয়নকাকু এসেছে, স্পেশাল চা করে দি। আসছি দাঁড়াও...”

রান্নাঘরে চা বসাতে ছুটল রাহুল।

বাইরের ঘরে তখনও অয়ন সেন রাহুলের বাবার পা জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কেঁদে চলেছে...

মূর্তি

১।

২০০৬ সাল।

পার্টি অফিসের সামনে নীলমণি পাল দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিলেন।

লোকাল কমিটির সেক্রেটারি এবং এলাকার বিধায়ক রঞ্জন বিশ্বাসের গাড়ি এসে দাঁড়াল।

নীলমণি পালকে দেখে রঞ্জন গাড়ি থেকে নেমেই বললেন, "আরে নীলমণিদা, কতদিন পরে দেখা! অফিসে চল। এখানে কী করছ?"

নীলমণি পাল বিড়িটাকে কয়েক বার টেনে মাটিতে ফেলে দিয়ে বললেন, "আমি অফিস যামু না"।

রঞ্জন বললেন, "কেন? কী হল?"

নীলমণি পালের বয়স হয়েছে। ষাট পেরিয়েছে। তবু গা হাত পা বেশ শক্তিশালী। অনেকটা পথ সাইকেল চালিয়ে পার্টি অফিসে আসেন। রঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "শুনলাম তোমার বাবার মূর্তি বসাইতাসো?"

রঞ্জন বললেন, "হ্যাঁ, সবাই খুব জোর করে ধরল। বাবার স্মৃতিরক্ষা কমিটি করা হয়েছে। তোমরা তো জানোই পার্টিতে বাবার অবদান কী..."

নীলমণি পাল রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ, জানি। উদ্বাস্তু আন্দোলনে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করসি। তা বইলা কমিউনিস্ট পার্টিতে মূর্তিপূজা করবা? তোমাগো মাথা ঠিক আসে? তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিল। সে লোকের মূর্তিতে কাকে হাগবে, সেটা আমারে দেখতে হইব?"

রঞ্জন বিরক্ত গলায় বললেন, "এটা আপনি কী কথা বললেন নীলমণিদা? বাবার সব অনুগামী কমিউনিস্ট ছিল? তুমি তো জানোই বাবার অনুগামী সব দলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা যদি মূর্তিটা করতে চায়, তাহলে কী বলার আছে? আর হ্যাঁ, সাজেশনটা ভাল দিয়েছেন অবশ্যই। আমরা বাবার মূর্তির মাথায় একটা শেড করে দেব যাতে কাক টাক বসতে না পারে। আসি নীলমণিদা, এল সি মিটিং শুরু হবে"।

রঞ্জন নীলমণিকে পাশ কাটিয়ে পার্টি অফিসে প্রবেশ করলেন। পাশের একজন অনুগামীকে বললেন, "বুড়োটাকে বেশি লাই দিবি না তো। ফালতু বকে বেশি"।

নীলমণি পার্টি অফিসের বাইরে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ বন্ধ করে মনে করলেন সেদিনের কথা যেদিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসার পর সবাই মিলে লড়াই করেছিলেন এলাকার জন্য। আদর্শ ছিল। কত ঝড় গেছে, কত খুনের চেষ্টা হয়েছে। কতভাবে দমন করা হয়েছে তাদের গণ আন্দোলনকে। তবু লড়াই ছাড়েন নি কেউ। দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে গেছেন। ভাবতেও পারেন নি কোন দিন তারা সরকারে আসবেন।

সমস্যাটা প্রথমে বোঝা যায় নি। কিছু দিন পর থেকে বোঝা গেল। যে লোকগুলোর পার্টিতে কোন কালে কোন অবদান ছিল না, তারাই বড় বড় পদ দখল করতে শুরু করল।

আসল কর্মীরা কোণঠাসা হতে হতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

রঞ্জনের চামচা মন্টু এসে নীলমণিকে বলল, "ও কাকু, বাড়ি যাও। চোখে ছানি আছে না? বুড়ো হয়েছো, বোঝ না কেন?"

নীলমণি তার বজ্র কঠিন হাতে মন্টুর হাত ধরে বললেন, "দেখ তো ছ্যামড়া, শক্তি কম মনে হইতাসে কি না? তুই বিল্টার ছেলে, না? এখন রঞ্জনের চামচা হইছস? তোর বাপেরে জিগাইস, নক্সালরা যখন তর বাপকে মাইরা ফেলতাছিল, তখন ওদের মাইরা কে তোর বাপরে বাঁচাইসিল? চাকরি পাইবি শোনলাম পার্টি

ধইরা? আর কী কী গুছানোর ধান্দা করতাসস? আর এই ছ্যামড়া, তোর হাতে আংটি ক্যান রে? কীসের কমিউনিস্ট পার্টি করস তুই? আংটি পরসস ক্যান?"

মন্টু কোন মতে নীলমণির হাত ছেড়ে পালিয়ে বাঁচল। নীলমণি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সাইকেলে উঠলেন। ছোড়া ঠিকই বলেছে। বাড়ি যেতে হবে। পার্টির তাদের আর দরকার নেই এখন।

২।

২০১২ সাল। পার্টি অফিসে একা একা বসে মাছি তাড়াচ্ছিল মন্টু আর রঞ্জন। রঞ্জন ২০১১র ভোটে গোহারান হেরেছেন। প্রমোটারের গাড়িটা প্রমোটার নিয়ে নিয়েছে। মন্টুর বাইকের পিছনে করে পার্টি অফিসে এসেছে।

মন্টু একটু ইতস্তত করে বলল, "দাদা, বলছি বাড়িতে একটু কাজ আছে। যাব?"

রঞ্জন উদাস গলায় বললেন, "যা"।

মন্টু বলল, "বলছিলাম, দাস পাড়ায় আমাদের ছেলেদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। কী করা যায়?"

রঞ্জন বললেন, "এখন শান্তি চাই আমরা"।

মন্টু বলল, "সেটা আমরা চাইছি। ওরা চায় না। বুঝলে?"

রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দাস পাড়ায় আমাদের পার্টির ছেলেগুলো সব চাকরি পেয়েছিল আমাদের পার্টি ধরে। এখন সবাই ফুলবাবু হয়ে গেছে। কী করে হবে?"

নীলমণি ঢুকলেন অফিস ঘরে। বয়সের ভারে খানিক ন্যুব্জ হয়েছেন। রঞ্জন বললেন, "আসুন নীলমণিদা। বসুন"।

নীলমণি বললেন, "বসতে আসি নাই। ওরা গরীবগো ঘর জ্বালায় দিতাসে, তোমরা এইখানে বইসা আসো, তমাগো লজ্জা লাগে না? এই নেতা হইস তোমরা?"

রঞ্জন বললেন, "নীলমণিদা, এখন আমরা অ্যাকশান নিলে হীতে বিপরীত হয়ে যাবে"।

নীলমণি বললেন, "সেডা কথা না, কথা হইল গিয়া তোমরা ভয় পাইসো। দেখসো কেমন লাগে বিনা যোগ্যতায় পার্টির পতাকা একদিন ধরা লোকরে চাকরি দিয়া? দেখলা? সবাই পালটি খাইসে এখন। এই মন্টুও খাইব। তোমার খাইবার উপায় নাই, তোমার বাবা ছিল বইলা। নইলে তুমিও পালটি খাইতা রঞ্জন। যাউক, বাজে কথা কইলাম। কিছু মনে নিও না। আসলাম"।

৩।

২০১৪।

মিউনিসিপালিটি থেকে চৌমাথার মোড়ের মূর্তি ভাঙা হচ্ছে। শোভা বর্ধনের কাজ হবে।

রঞ্জন শুনেছেন সবটা। যান নি।

পার্টি অফিসে বসে আছেন। মন্টু আসে নি। শাসক দলে জয়েন করেছে।

নীলমণি এলেন। রঞ্জনের সামনে চেয়ারে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে বললেন, "মন খারাপ লাগতাসে না রঞ্জন? সব শেষ হইয়া গেল বল? এত অহংকার, এত একাধিপত্য, সব নিমেষে শেষ হইয়া গেল। মন খারাপ লাগতাসে না? তোমারে একটা গল্প কই রঞ্জন। তোমার বাবা উদ্বাস্তু ছিলেন না। তোমাগো বর্ধমানে জমিদারী ছিল। তোমার বাবা সব জমি জিরেত পার্টির নামে লিখে দিয়া পার্টি করসিলেন। সর্বহারা হইসিলেন। তার ছেলে হইয়া তুমি কী করলা? প্রমোটারের টাকায় গাড়ি চড়লা, আর বাবারে সম্মান দেখাইতে মূর্তি বানাইলা। ঐ মূর্তি গড়লেও কী, আর ভাঙলেও কী! কিসসু না রঞ্জন। মূর্তি সেদিনই ভাংসিল যেদিন আদর্শ ভুইলা তোমরা প্রমোটারের কথায় চলতে শুরু করলা। পার্টি করসিলো তোমার বাবায়, সব দিয়া। উদ্বাস্তু কলোনীতে কাজ করসিলো। তোমরাই মূর্তিটা ভাঙসিলা যেদিন অন্য পার্টি করে বলে গরীব লোকরে বিপিএল কার্ড দিলা না। কমিউনিস্ট পার্টি করা এত সহজ রঞ্জন? সবাই সদস্য হইয়া গেল? দেখতাসো তো এখন, এত বছর

শাসন কইরাও এখন শ্মশানের মইধ্যে বইসা রইসো। মূর্তি ভাঙসে বইলা দুঃখ কর? আদর্শটারে যেদিন টুকরো টুকরো কইরা ছিইড়া ফেললা, সেদিন দুঃখ কর নাই?”

রঞ্জন মাথা নিচু করলেন।

নীলমণি বললেন, “আমি বাড়ি যাই রঞ্জন। নিজের খেয়াল রাইখো। মনে রাইখো ভোট সব না। একটাও ভোট পাইবা না, কিন্তু যেন সৎ থাকতে পারো। কমিউনিস্ট হওয়া পৃথিবীর সব থেকে কঠিন কাজ রঞ্জন। আমি এত বছর পরেও হইতে পারলাম না। তুমি অন্তত চেষ্টা কইরো। বাবারে মনে করেই চেষ্টাটা কইরো। ভাল থাইকো, বিরক্ত হইতাসো বুঝি। তবু তরুণের ছেলে তো, আর অফিসটা আমাদের রক্ত দিয়া করা তো, ভুলতে পারি না। সব কিছু টাইনা নিয়া আসে আমারে। আমাগো কথা তোমাগো চিরকাল অপ্রিয় লাগে জানি, কিন্তু কী জানো তো, প্রিয় জিনিস শুনতে শুনতে তোমাগো লড়াই করার ইচ্ছাটাই চইলা গেসে”।

নীলমণি বেরোলেন পার্টি অফিস থেকে।

রঞ্জন নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন।

একা…

পারফিউম

গ্রামের বাড়িতে অমিয় যখন পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যে হয়েছে। গাড়িটা পার্ক করে রেখে চাবি বের করে তালা খুললেন। জমিদার বাড়ি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে। বাড়ি আসা খুব কমই হয়।

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ব্যাঙ ডাকছে। কলকাতার ফ্ল্যাটে এই শব্দটা এখন বিরল হয়ে গেছে।

অমিয় ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই লোডশেডিং হয়ে গেল।

এ আরেক সমস্যা। গ্রামের দিকে এখনো এই সমস্যা রয়ে গেছে।

মোবাইলে টর্চ জ্বেলে ব্যাগ থেকে মোমবাতি বের করে জ্বালালেন। জামাকাপড় পাল্টে বৈঠকখানার ঘরে বসে ব্যাগ থেকে আনা জল বের করে খেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাধব এসে হাজির হল। মাধব তাদের বাড়ির পুরনো চাকর। বাবার শেষ বয়স অবধি বাবাকে সেই দেখে রেখেছিল। বাবা চলে যাওয়ার পর বাড়িতে তালা চাবি পড়ে যায়।

মাধব বলল, "দেখলাম আসতে। বাড়িতে কাজ ছিল বলে দেরী হল"।

অমিয় বললেন, "কারেন্ট কখন আসবে?"

মাধব বলল, "কোন ঠিক নেই। কাল এই সময় গিয়ে মাঝরাত্তিরে এসেছিল"।

অমিয় বললেন, "ও। তা পাওয়া গেল, যেটা বলেছিলাম"?

মাধব ইতস্তত করে বলল, "হ্যাঁ। তবে ভোরের মধ্যে বের করে দিতে হবে। গ্রামের লোক জানলে অসুবিধা হতে পারে"।

অমিয় বললেন, "হু। নিয়ে এসো। আর একটা কাঁচের গ্লাস দিয়ে যাও"।

মাধব একটা কাঁচের গ্লাস বের করে টেবিলের ওপর রেখে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে চলে গেল।

ব্যাগ থেকে স্কচের বোতল, সোডা আর জল বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। চিপসও কিনেছিলেন।

প্যাকেট থেকে চিপস বের করে কামড় বসিয়ে স্কচের গ্লাসে চুমুক দিলেন অমিয়। মোমের আলোয় বৈঠকখানা আবছা হয়ে ফুটে উঠছে। এ বাড়িতেই বড় হয়েছেন। অবশ্য সে সময়েই তাদের অবস্থা পড়তির দিকে। সোনা দানা বিক্রি করতে হত। কত জমিজিরেত গেছে। মাস্টার্স করতে গ্রাম ছেড়েছিলেন। মা চলে যাবার পর আসা হয়ে উঠল না তেমন।

চাকরিতে ঢোকার পর থেকে বাবা অনেকবারই ফোন করেছিলেন বাড়ি সারানোর টাকার জন্য। মাধব খুব বেশি দিতে পারেন নি। এখন দু তিনটে ঘর ছাড়া বাকি ঘরগুলোর অবস্থা খারাপ। যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে। প্রথম পেগ শেষ হবার আগেই মেয়েটাকে নিয়ে মাধব এল। আঠেরো উনিশ বছর বয়স হবে। গায়ের রঙ কালো। শাড়ি পরে এসেছে। যেটা সব থেকে বেশি অবাক লাগল, সেটা হল মেয়েটার কোলে একটা বেড়াল। বেড়ালটার গায়ে আবার বাচ্চাদের জামা পরানো আছে। অমিয় ভ্রু কুঁচকে বললেন, "বেড়াল নিয়ে ঘোরে নাকি?"

মাধব বলল, "পুষ্যি। অসুবিধা নেই"।

অমিয় বিরক্ত মুখে মাধবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জোগাড়ও কর। ঠিক আছে, তুমি যাও"।

মাধব বলল, "খাবার টেবিলে ঢাকা দেওয়া আছে। গরম করে দেব"।

অমিয় বললেন, "দরকার নেই। যাও"।

মাধব আবার কেমন জুবুথুবু হয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে চলে গেল।

মেয়েটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।
হালকা নেশা হয়েছিল। মোমের আলোয় মেয়েটাকে কেমন ঝাপসা লাগছে। অমিয় বললেন, “এদিকে এসে বস। পাশে আয়”।
মেয়েটা বিড়ালটাকে নিয়ে তার পাশে বসল।
অমিয় বললেন, “তোর নাম কী?”
মেয়েটা বলল, “ময়না”।
অমিয় বললেন, “আর তোর বিড়ালের?”
মেয়েটা বলল, “পুচকি”।
অমিয় দ্বিতীয় পেগটা শেষ করলেন। ময়নাকে বললেন, “পুচকির গায়ে জামা পরিয়েছিস কেন?”
ময়না বলল, “ওর গায়ে ভাতের ফ্যান ঢেলে দিয়েছিল। পুড়ে গেছে। তাই জামা পরিয়ে রাখি”।
অমিয় বললেন, “কে ঢেলে দিয়েছিল?”
ময়না বলল, “মা”।
অমিয় বললেন, “কেন? তোর মা পছন্দ করে না?”
ময়না মাথা নাড়ল।
অমিয় বললেন, “এখানে কেন এসেছিস জানিস?”
ময়না বলল, “হ্যাঁ”।
অমিয় বললেন, “অসুবিধে হবে না তোর?”
ময়না তার দিকে তাকাল। পুচকিকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে বলল, “কী করতে হবে?”
অমিয় ব্যাগ থেকে একটা পারফিউমের শিশি বের করলেন। দামী একটা লেডিস পারফিউম।
ময়নার সারা শরীরে পারফিউমটা দিয়ে দিলেন। ময়না কিছু বলল না। অমিয় গ্লাসে আরেক পেগ স্কচ ঢেলে সোডা, জল ছাড়াই একবারে খেয়ে নিয়ে বললেন, “চল, শোয়ার ঘরে”।
ময়না বারণ করল না। অমিয় মোবাইলের টর্চ জ্বেলে ময়নার হাত ধরে বেডরুমে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে ময়নার শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া সব খুলে টর্চ বন্ধ করে নিজের জামা খুলে ময়নাকে জড়িয়ে ধরল।
ময়না কোন সাড়া দিল না। অমিয়র শরীর জাগছিল। ময়নার ঘাড়ে গলায় চুমু খেতে শুরু করে তাকে শুইয়ে দিলেন।
ময়না কুমারী। প্রথমবার প্রবেশ করতে গেলে কেঁদে উঠল। অমিয় হাত দিয়ে ময়নার মুখ চাপা দিলেন। ময়না গোঙাতে লাগল।
শরীর ঠান্ডা হলে অমিয় হাঁফাতে লাগলেন। লোডশেডিং বলে ফ্যান চলছে না। ময়না নিঃশব্দে ফোঁপাতে লাগল।
অমিয় একটু সামলে নিয়ে বললেন, “কষ্ট হচ্ছে?”
ময়না বলল, “না”।
অমিয় বললেন, “হলে বলতে হয়। হচ্ছে?”
ময়না বলল, “হ্যাঁ”।
হাতড়ে মোবাইল খুঁজে অমিয় বিছানায় ফেললেন।
বিছানায় চাপ চাপ রক্ত। অমিয় চাদরটা সরালেন।
অমিয় বললেন, “পুচকি কোথায়?”
ময়না ঠান্ডা গলায় বলল, “ও ঘরে”।

অমিয় বললেন, “তোর খারাপ লাগছে?”
ময়না কিছু বলল না। শুয়ে শুয়ে কাঁপতে লাগল।
অমিয় বললেন, “তোর বাড়িতে কে কে আছে?”
ময়না বলল, “মা আছে”।
অমিয় শুলেন চুপ করে।
ময়না ছটফট করতে লাগল।
অমিয় মোবাইলে অনীতার ছবি বের করলেন। এই পারফিউমটাই মাখিয়ে দিয়েছিলেন ফুলশয্যায়।
আজ বিবাহবার্ষিকী তাদের।
অনীতা ক্যান্সারে চলে গেছে গত বছর।
এই উদ্ভট খেয়ালটা কেন তার মাথায় চেপেছিল নিজেও জানেন না।
মাধব ফোনে তার কথাটা শুনে কেমন অবাক হয়ে গেছিল। না করে নি। জমিদার বাড়ির পুরাতন ভৃত্য বলে কথা। মনিবের কথা বারণ করাও তার রক্তে নেই।
অমিয় না খেয়েই শুয়ে পড়েছিলেন।
ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। অমিয় উঠে দেখলেন ময়না বিবস্ত্র হয়ে শুয়ে আছে। তার পাশে পুচকি শুয়ে।
চুপ করে কিছুক্ষণ দেখে ময়নার গায়ে চাদর দিয়ে বসার ঘরে গিয়ে বসলেন।
আর এক ফোঁটাও মদ খেলেন না।
ভোর চারটেয় মাধব এল।
তাকে দেখে বলল, “নিয়ে যাই?”
অমিয় মাধবের দিকে তাকালেন। অন্ধকারে বোঝা যায় নি, মাধবের চুল পেকে গেছে। মুখে বলিরেখা। এই লোকের কাছে তিনি বড় হয়েছেন। এই লোককে এই ক'দিন অস্থির করে দিয়েছেন মেয়ে চাই বলে।
মাধব উত্তর না পেয়ে আরেকবার বলল, “নিয়ে যাব?”
অমিয় বললেন, “পুচকি আর তার মাকে আমিই নিয়ে যাব। বুড়ো বয়সে কে দেখবে আমাকে? ও তোমার নাতনি, তাই না? ভেবেছো আমি বুঝি নি?”
মাধব খানিকটা কেঁপে উঠল। উত্তর দিতে পারল না। চোখ দিয়ে খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ল শুধু...

প্রপোজ ইত্যাদি

সৌম্য অপালাকে প্রপোজ করেছে মাঝরাতে।
হঠাৎ করেই।
অপালা রোজের মতই কথা বলছিল।
সৌম্য হুট করে বলে বসল, "তোকে একটা কথা বলি?"
অপালা বলেছিল, "বল"।
সৌম্য বলল, "আমাকে বিয়ে করবি?"
অপালা অবাক হয়ে গেছিল।
কই, এরকম কোন ইঙ্গিত তো কোন কালে সৌম্য দেয় নি!
অপালা বলল "ইয়ার্কি মারছিস?"
সৌম্য বলল "মেসির দিব্যি"।
মেসির দিব্যি মানে সত্যি। সৌম্য মেসির নাম নিয়ে কখনও মিথ্যে কথা বা ইয়ার্কি মারে না।
অপালা আঙুল দিয়ে মাথা চেপে ধরে বলল "ফোন রাখি। কাল কথা বলব"
ফোন অফ করে দিয়েছিল সে। সৌম্য যাতে আর ফোন বা মেসেজ না করতে পারে।
লক ডাউনের জন্য অনেকের মাথাই খারাপ হয়ে গেছে।
সৌম্যরও তাই হবে।
এপাশ ওপাশ করতে করতে রাত আড়াইটায় ঘুম এল।
ঘুম ভাঙল রবীন্দ্রসংগীতে। "আমার পরান যাহা চায়"।
বড় মন কেমন করা গান। ঘড়ি দেখল সে। সকাল সাতটা।
উঠেই সৌম্যর কথা মনে পড়ল।
অপালা দেখেছে রাতে মন অনেক বেশি দুশ্চিন্তা করে, মাথায় নানা রকম চিন্তা এসে বাসা বাধতে শুরু করে। সকালে এই সমস্যাটা থাকে না। জানলা খুলে দিল। মাঠ দেখা যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা।
আবহাওয়া অফিস বলেছে এই ক'দিন ঝড় বৃষ্টি হবে।
বাবা চা খাচ্ছিল। সে বাবার সামনে বসল।
বাবা চিন্তিত মুখে বলল, "কী হবে বলত পলা? এই লকডাউনের ঝামেলা কবে মিটবে?"
অপালা ঠোঁট উল্টাল।
বাবা বলল, "কত রকম কাজ পড়ে আছে। ফ্ল্যাটের কাজ অবধি আটকে আছে। তোর পড়াশুনার খবর কী? থিসিস জমা দেওয়া পিছোল?"
অপালা ক্লান্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ, আর কী"।
মা তাকে চা দিয়ে বলল, "তোর বাবা বলছিল আজ খিচুড়ি আর ডিমের কারি করতে। তোর কোন ডিমান্ড আছে?"
অপালা মাথা নাড়ল।
মা বলল, "কী হয়েছে রে তোর? সারাক্ষণ ফোন ঘেটে ঘেঁটে বাবা মার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না, তাই না?"

অপালা বলল, "না না। সেরকম কিছু না"।
মা বলল, "তাহলে কী হয়েছে?"
অপালা বলল, "সৌম্য মাঝরাতে বলে বসল বিয়ে করতে চায়"।
বাবা নাক কুচকাল, "ছেলেটা তো ভাল ছিল। সুস্থ স্বাভাবিক ছেলে। কথা বার্তাও ঠিক ঠাক বলত"।
অপালা বলল, "হ্যাঁ, তো?"
বাবা বলল, "ছেলেটা পেগলে গেল কেন হঠাৎ? পৃথিবীতে আর কোন মেয়ে পেল না? শেষে তুই?"
অপালা মার দিকে তাকাল। মা ফিক ফিক করে হাসছে। সে রাগী গলায় বলল, "তুমিও কি আমার সম্পর্কে এমন মত পোষণ কর?"
মা ঘাড় নাড়ল, "কম বেশি তাই। রান্না জানিস না, অকর্মার ঢেকি, ঘরের অবস্থা এমন করে রাখিস, ঘর না আমাজনের জঙ্গল বোঝা যায় না। তোকে কেউ কেন ভালবাসবে? ধুস?"
অপালার নাক ফুলে উঠল। রেগে গেলে তার নাক ফুলে ওঠে। সে দুম দুম করে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। এবার গান শুরু হল, "প্রাণচায় চক্ষু না চায়, মরি এ কী তোর দুস্তর লজ্জা"।
ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে অপালা সৌম্যকে ফোন করল। রিং হয়ে গেল, সৌম্য ধরল না।
আবার ফোন করল।
এবার ঘুম ঘুম গলায় সৌম্য ধরল, "হ্যাঁ বল"।
অপালা বলল, "এই তুই আমায় প্রপোজ করেছিস কেন? জানোয়ার ছেলে, তুই জানিস না আমি একটা অকর্মার ধাড়ি, রান্না জানি না, ঘর নোংরা করে রাখি, আমার কোন গুণ নেই?"
সৌম্য বলল, "তার আগে বল তুই ফোন অফ করে দিলি কেন ?"
অপালা বলল, "আমি... তো ওসব নিয়ে কিছু ভাবিই নি। তুই আগে বল আমায় তুই কেন প্রপোজ করেছিস? আমি কোন কাজেরই না"।
সৌম্য বলল, "সে তো জানি তুই কাজের না। সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই"।
অপালা বলল "তবে?"
সৌম্য বলল, "তবে অনেক ভেবে দেখেছি তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। সময় কাটাতেও ভাল লাগে। এরকম তো কোন ব্যাপার নেই, মেয়েটাকেই সব রান্না বান্না করতে হবে, ঘর গোছাতে হবে। বরং ব্যাপারটা এরকম হলেও হয়, যে মেয়েটার সঙ্গে আমার সময় কাটাতে ভাল লাগে তার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করা যায়, তাকে বিয়ে করলাম। আর রান্না তুই জানিস না তো কী হয়েছে, আমি তো জানি। আমি করব! তুই একটু একটু হেল্প করবি। দুজনে মিলেই যা করার করব। এরকম কথা তো আমি দিচ্ছি না যে আমিই রান্না করব। সেটা সম্ভব না। আমারও বিরক্তি লাগে। তবে দুজনে মিলে করলে বোর লাগবে না ব্যাপারটা। দেখ তুই আর কিছু পারিস না পারিস, ম্যাগী বানাতে ভালই পারিস। সেটা বানালি। সন্ধ্যের টিফিন সরটেড। সকালে ভাত করা থাকবে। কোন দিন তরকারি, কোন দিন ডিম, কোন দিন মাছ, কোন দিন মাংস। সিঙ্গল মেনু হবে"।
অপালা অবাক হয়ে বলল, "এত কিছু কখন ভাবলি?"
সৌম্য বলল, "এই তো, এখন। কথা বলতে বলতে ভেবে ফেললাম। শোন, তোর কাছে তো আমার কিছু লুকনোর নেই। তুই আমাকে জানিস। আমি তোর সঙ্গে সারাজীবন থাকতে পারলি খুশি হব"।
অপালা বলল, "হু। ঠিক আছে। রাখ এখন"।
সৌম্য বলল, "উত্তরটা দিয়ে যা?"

অপালা বলল, “তুই ঘুমো। রেজাল্ট এত তাড়াতাড়ি বেরোয় দেখেছিস? ভেবে নে আমি সি ইউ। রাখ এখন, বাবার সাথে বোঝাপড়া আছে”।

সৌম্য কিছু বলার আগেই অপালা ফোন কেটে ড্রয়িং রুমে গেল।

বাবা আর মা গল্প করছিল। সে বলল, “সৌম্য বলল রান্না নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ও আর আমি দুজনে মিলে করব। ও আমাকে ভালবাসে বুঝলে?”

মা আর বাবা দুজনেই হেসে ফেলল।

অপালা আবার রেগে গিয়ে বলল, “কী হল?”

বাবা বলল “ছেলেটার বুদ্ধি শুদ্ধি নেই। আই কিউ লেভেল পাঁচ বছরের বাচ্চার থেকেও কম। নইলে তোকে পছন্দ করে?” বিচ্ছিরিভাবে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল বাবা। সঙ্গত দিল মা।

শ্যামল মিত্রের গান শুরু হয়েছে “কী নামে ডেকে বলব তোমাকে”।

অপালা আবার ঘরে গিয়ে সৌম্যকে ফোন করল, সৌম্য ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সৌম্যর ঘুম কুম্ভকর্ণ লেভেলের। এবারেও একবার রিং হয়ে কেটে গেল।

অপালা রাগে দাপাতে দাপাতে আবার ফোন করল।

অনেকক্ষন রিং হবার পর সৌম্য ধরে বলল “হ্যাঁ বল?”

অপালা বলল, “বাবা বলেছে তোর আই কিউ পাঁচ বছরের বাচ্চার লেভেলের”।

সৌমা বলল, “সে হতে পারে। আমি তো জানিসই তোর উপর কতটা ডিপেন্ড করি। তোর আই কিউ বেশি বলেই তো আমি টিকে আছি”।

অপালা বলল, “তা তো বটেই। যত আলফাল মেয়ে তোর পিছন পিছন ঘোরে। আমি দেখি না ভেবেছিস? সব দেখি। এর পর যদি ঘুরতে দেখি, ঠ্যাঙ ভেঙে দেব মনে রাখিস”।

সৌম্য বলল “সেও তো করেছিস। হিস্ট্রির মৌসুমী কথা বলতে এসেছিল, কী না করলি”।

অপালা বলল, “করব না? ওসব মেয়েকে তুই চিনিস না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছেড়ে দিয়ে দুদিন পর বেটার অপশন পেলে চলে যাবে। তুইই বা ওকে এত পাত্তা দিস কেন? এই শুয়োর”।।

সৌম্য বলল “আচ্ছা। কান ধরলাম। আর দেবো না পাত্তা। খুশি? মেসীর দিব্যি। এবার তো হ্যাঁ বল”।

অপালা বলল “হ্যাঁ আবার কী? ছেলে মেয়ের নাম তুই ঠিক করবি না, আমি ঠিক করব”।

সৌম্যর এবার অবাক হবার পালা, বলল “এত দূর ভেবে ফেললি?”

অপালা বলল, “চুপ থাক। বেশি কথা বলবি না। সাবধানে থাকবি। রাখছি এখন। হিসেব বোঝার আছে”।

সৌম্য একটু থমকে বলল, “ভালবাসি”।

অপালা বলল, “একদম ন্যাকামি করবি না। ওঠে খা কিছু। সারাদিন শুধু ঘুম আর ঘুম। অখাদ্য একটা”।

ফোন রেখে অপালা বিজয়ীর মত বাবার সামনে বসে বলল, “সৌম্য বলেছে আমার বুদ্ধি বেশি। আর আমার ওপর ও ডিপেন্ড করে”।

বাবা মন দিয়ে কাগজ পড়তে পড়তে বলল, “ভাল। তোর মত গাধারও কেউ জুটে গেল”।

অপালা আবার রাগল “আমি গাধা?”

বাবা বলল, “ওই আর কী”।

মা হাসতে হাসতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “সৌম্য খুব ভাল ছেলে, তোকে ভাল রাখবে, মিলিয়ে নিস”।

অপালা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, “বাবা আমায় গাধা বলল কেন?”

মা বলল, “ছেলেটা তোকে ভালবাসে। এত দিন আমাদের বাড়ি আসত, আমি আর তোর বাবা দেখেই বুঝে যেতাম, তুইই এতদিন বুঝলি না তো, তাই বলল আর কী”।

অপালা বলল, “ভাল হয়েছে যাও”।

বাবা বলল, “রিলেশনে গেলেই বস হয়ে যাস না যেন। যেমন আছিস, তেমনই থাকবি। তোর মার মত হয়ে যাস না। এত প্রেম, এত প্রেম, বিয়ের পরে, বাবারে”!

অপালা অবাক হয়ে বলল, “মানে? তোমাদের অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ না? মা যে এতদিন বলত?”

মা বাবার দিকে চোখ পাকিয়ে রেগে মেগে রান্না ঘরে চলে গেল।

এবার বাবা মেয়ে হো হো করে হাসতে শুরু করল।

ব্যাকগ্রাউন্ডে মান্না দে গেয়ে উঠলেন, “বাঁচাও কে আছো মরেছি যে প্রেম করে”...

ফুলশয্যার পরের দিন

ভোর বেলা।
ঐত্রেয়ীর ঘুম ভাঙল। অচেনা বাড়ি, অচেনা বিছানায় ঘুম হয় না। পাশে রোহিত খালি গায়ে ঘুমোচ্ছে। ঐত্রেয়ী রোহিতকে ঠেলল, "এই"।
রোহিত ধড়মড় করে উঠে বসল, "কী?"
ঐত্রেয়ী বলল, "ওঠ। আমি বাথরুমে যাব"।
রোহিত বলল, "তো যা। আমি কী করব?"
ঐত্রেয়ী বলল, "তোর বাবা, মেসো, মাসীরা সব গিজগিজ করছে ঘরে। এসে দাঁড়া"।
রোহিত বলল, "ওরা কি ভূত নাকি? যা যা"।
ঐত্রেয়ী রোহিতকে চিমটি কাটল, "চল শালা। চল"।
রোহিত বিরক্ত মুখে উঠে বসল, "মাইরি কাল কত রাতে ঘুমালাম। এখন সকাল থেকেই জ্বালাতে শুরু করে দিলি?"
ঐত্রেয়ী বলল, "এখন তোর বাড়িতে এসেছি। তোর দায়িত্ব। চল"।
রোহিত উঠে একটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে দরজা খুলল। ঘর ময় লোক। আগের দিন বউভাত গেছে। তাদের ঘর থেকে বেরোতে দেখে চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি পড়ল তার দিকে। ঐত্রেয়ী বাথরুমে ঢুকল। রোহিত বেসিনে দাঁত মাজতে শুরু করল।
বাথরুম থেকে বেরিয়ে বেডরুমে ঢুকে ঐত্রেয়ী দেখল রোহিতের মা আর মাসী খাটের চাদর আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে।
ঐত্রেয়ী বলল, "কী খুঁজছেন মা? রক্তের দাগ? আমার কুমারীত্বের প্রমাণ? আমি জানতাম আপনারা খুঁজবেন। এই যে"।
ফোন বের করে ঐত্রেয়ী একটা ছবি বের করে ওদের সামনে দেখিয়ে বলল, "হোটেল নীল সমুদ্র। বিয়ের আগে আমি আর আপনাদের ছেলে বেড়াতে গিয়ে ওখানকার বিছানার চাদরেই এই কম্মোটি সেরে এসেছি। আর কিছু চাই?"
রোহিতের মা আর মাসী তার দিকে একবার আপাদমস্তক তাকিয়ে ঘর থেকে দৌড় মেরে পালিয়ে গেল।
ঐত্রেয়ী হাসতে হাসতে খাটেই গড়িয়ে পড়ল...

লজ্জা

রূপ খাটে শুয়েছিল।

একগাদা পড়া আছে। পড়তে ইচ্ছে করছিল না।

লকডাউন চলছে চারদিকে। কলেজের পড়াও টিউশন করিয়ে কেনা স্মার্টফোনে হচ্ছে। টিউশনির হাল ভাল না। টাকা দেয় নি। সে চাইতেও পারে নি। পড়াচ্ছে না, টাকা চায় কী করে?

ঘরের বাইরে বাবা এসে দাঁড়িয়ে বলল, "কী করছিস বুবাই?"

রূপ উঠে বসে বলল, "শুয়ে আছি"।

বাবা ঘরে ঢুকে তার খাটে বসে হতাশ গলায় বলল, "একটা কাজ করতে হবে বুঝলি। টাকা পয়সা তো হাতে বেশি নেই। তোর মেসোর কাছে হাজার দশেক টাকা পেতাম। ফোন করছি, পাচ্ছি না। তুই কি একবার গিয়ে নিয়ে আসতে পারবি সাইকেলে করে?"

রূপ বলল, "সে তো অনেক দূর! প্রায় দশ কিলোমিটার সাইকেল চালাতে হবে"। কথাটা বলেই তার বাবার দিকে চোখ পড়ল। বাবার মুখটা কেমন শুকনো হয়ে গেছে। ব্যবসাটা বন্ধ যাচ্ছে। তার চিন্তাতেই কি? সে বলল, "ঠিক আছে, আমাকে তোমার প্রেসক্রিপশনটা দাও। আমি গিয়ে নিয়ে আসছি"।

বাবার মুখ আলো হল। বলল, "তোর মেসোর ওষুধের ব্যবসা তো রমরমিয়ে চলছে। দেখ, যদি কিছু ওষুধও দিতে পারে"।

রূপ উঠে পড়ল। টি শার্ট পরে মাস্ক মুখে দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরোল। সাইকেলের সিট কভারে ফুটো হয়েছে। বেশিক্ষণ চালালে ব্যথা করে। কষ্ট হচ্ছিল একটু। সেটাকে পাত্তা দিল না সে। বাবার মুখটা কেমন যেন। চিরকাল বাবাকে হাসি খুশি দেখে এসেছে। এই সময়টা বাবার এরকম মুখ নেওয়া যাচ্ছে না।

চৌরাস্তার কাছে আসতেই পুলিশ ধরল। মারতে যাচ্ছিল, সে চেঁচিয়ে উঠল, "স্যার, বাবার ওষুধ আনতে যাচ্ছি। এই যে প্রেসক্রিপশন"।

পুলিশ প্রেসক্রিপশনটা দেখে বলল, "এদিকে কোথায় যাচ্ছো? এলাকায় ওষুধের দোকান নেই?"

রূপ বলল, "আছে, কিন্তু প্রেশারের ওষুধটা সেই নবপাড়া থেকেই আনতে হবে স্যার। আমি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি"।

আর কিছু বলল না তাকে পুলিশ।

সে প্যাডেলে জোর দিল।

জমজমাট চত্বর সুনসান হয়ে আছে। পুলিশি কড়াকড়ি সত্ত্বেও রোগের রক্তচক্ষু তো আছেই।

মাসীর বাড়ি যখন পৌঁছল তখন দুপুর একটা বাজে।

দোতলা বাড়ি, বাইরে থেকে তালা দেওয়া। পাঁচিলে ডিঙোতে হল। কলিং বেল টিপতে মাসী এসে বলল, "কী রে, তুই?"

সে হাঁফাচ্ছিল। বলল, "বাবা পাঠাল। মেসো আছে?"

মাসী গেট খুলতে খুলতে বলল, "আয় আয়, মেসো পুজোয় বসেছে। ঈশ, কী অবস্থা তোর, যা বাথরুমে ঢুকে গায়ে হাতে মুখে জল দে শিগগিরি"।

সে বাথরুমে ঢুকল। হাত পা ধুয়ে বেরিয়ে মাসী বসাল। বলল, "কী ব্যাপার?"

রূপ বলল, "বাবা বলল মেসোর থেকে টাকা নিয়ে যেতে"।

মাসী বলল, “বস। মেসো আসছে। আমি রান্না করি”।
মাসী চলে গেল। রূপ খানিকক্ষণ উসখুশ করে টেবিলে রাখা ম্যাগাজিন পড়তে লাগল। মাসীরা বেশ বড়লোক। সোফাও ভারি নরম।
তাদের বাড়িতে সোফাটা পাল্টাতে হবে। স্প্রিং বেরিয়ে গেছে। বাবা কবে পাল্টাবে বাবাই জানে।
মেসো এল খালি গায়ে।
তাকে দেখে বলল, “কী ব্যাপার রূপ? এত কষ্ট করে এলি?”
রূপ বলল, “বাবা পাঠিয়েছে মেসো। তোমার কাছে নাকি দশ হাজারটাকা পায়। ওটা নিতে”।
মেসোর মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পরক্ষণেই মেসো চিৎকার করতে শুরু করল, “বেরিয়ে যা। বেরো এখান থেকে। জানোয়ার কোথাকার”।
রূপ ঘাবড়ে গেল। মেসোর এরকম রূপ সে কোন দিন দেখে নি। মাসী ছুটে এল। বলল, “কী করছো তুমি? রূপকে এরকম করছো কেন?”
মেসো হাওয়াই চটি পরে ছিল। সেটা খুলে তার দিকে তেড়ে এল।
রূপ লজ্জায় অপমানে আর দাঁড়াতে পারল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আবার পাঁচিল টপকে মাসীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সাইকেলে চড়ল। মেসোর হম্বি তম্বি শোনা যাচ্ছিল।
রূপ লাস্ট ইয়ারে পড়ে। কিন্তু তার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। এরকম ব্যবহারে সে অভ্যস্ত নয়। মাসীর বাড়িতে তো নয়ই। এটা কী হল সে কিছুতেই বুঝতে পারল না। তার পেট খালি ছিল, তার ওপর চড়া রোদ। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে বাড়ি ঢুকল সে।
বাড়ি ঢুকতেই বাবা তার দিকে আগ্রহী মুখে এগিয়ে এল, “দিল?”
রূপ বাবার দিকে তাকিয়ে বলল “জুতো নিয়ে তাড়া করল। কেন জানি না”।
বাবার মুখ পাংশু হয়ে গেল। বলল, “জুতো নিয়ে তাড়া করল”।
রূপ মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ বাবা”।
বাবা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে তার অবস্থা বুঝে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “ঘরে যা”।
বাবার হাত ছড়িয়ে রূপ ঘরে গেল। ঘরে গিয়ে সে কেঁদে ফেলল। সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না মেসো এটা করতে পারে। মা মারা যাবার পর বাবা আর সে থাকে। বাপ ছেলের চলে যায়। আজ যেটা হল, তার জন্য সে কিছুতেই প্রস্তুত ছিল না।
কিছুক্ষণ পর বাবা তার ঘরে এসে বসল। তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, “কষ্ট হচ্ছে, না রে?”
রূপের কান্না বন্ধ হয়ে গেছিল। বলল, “না বাবা, ঠিক আছে”।
বাবা বলল, “আমার ব্যবসা যখন খুব ভাল চলছিল, তোর মেসো তখন কিচ্ছু করে না। খেতে পেতো না। এই টাকাটা তোর মেসো আমার থেকে ধার নিয়েছিল। এখনকার হিসেবে সে টাকা এখন অনেক হবে, কিন্তু আমি কোন সুদ চাই নি। তোর মেসো তারপরে অনেক টাকা করল, অনেক বড়লোক হল। কিন্তু কিছুতেই আমার সে টাকা আর দিল না। আমি জানতাম ও দেবে না”।
রূপ অবাক হয়ে বলল, “তাহলে আমাকে পাঠালে কেন?”
বাবা ম্লান হেসে বলল, “তোকে পাঠালাম এই কারণেই, যে লজ্জা পাক আজ লোকটা। লোকের টাকা মেরে কেমন লাগে, সে লজ্জাটা পাক। তুই লজ্জা পাস না, লজ্জাটা ওদের পাওয়া উচিত। মানুষ যত বড় বাড়িই করুক, যে মানুষের বাড়ির ভিতে সৎ লোকের রক্ত লেগে থাকে, সে মানুষ কোন দিন সুখী হতে পারে না। আয়, খেয়ে নি দুজনে। আলুসিদ্ধ ভাত খাব। কিন্তু ভাল থাকব”।
রূপ বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

কথাগুলো সে আজীবন মনে রাখবে। অপমানটা নয়...

সৎ- অসৎ

অফিসে নিজের চেয়ারে বসে কাজ করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম নবীনদা এসেছেন। হাতে একটা কাগজ। নবীনদা পিওন অফিসের। লাজুক মানুষ। প্রায়ই তাকে আমরা খ্যাপাই কিছু না কিছু নিয়ে। অফিসের স্ট্রেস রিলিজের "খোরাক" বলা যেতে পারে ভদ্রলোককে।

ফরসা, ছোটখাটো মানুষ।

আমরা নবীনদার সাথে আদিরসাত্মক কথাও বলি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোন এক গ্রাম থেকে আসেন নবীনদা।

আজ নবীনদাকে এভাবে দাঁড়াতে দেখে অবাক হলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী কেস বস? বুড়ো বয়সে বাপ হচ্ছো নাকি?"

নবীনদা এক গাল হেসে বলল, "না বিশ্বাসদা, ঝড়ে আমাদের এলাকায় খুব ক্ষতি হয়েছে। আমি তোমাদের থেকে কথা কিছু টাকা তুলছি। যা পারো দিও। এলাকার লোক খুব কষ্টে আছে গো। রবিবার কিছু লোককে চাল, ডাল দেব। তাই আর কি..."

আমি বিরক্ত হলাম। মাসের শেষ। খরচের শেষ নেই। পকেট থেকে দশটাকা বের করে দিলাম।

নবীনদা যেন নিজেই লজ্জা পেল টাকাটা নিয়ে। দাঁড়াল না। চলে গেল।

কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। লাঞ্চ টাইমে অফিসের বাকিদের সাথে খেতে বসে নবীনদার কথা উঠল। রতন বলল,"আরে এই ঝড়ের নাম করে কত জন কত টাকা তুলে ফেলছে। এগুলো সব স্ক্যাম জানিস তো? আমাদের এলাকায় এক নেতা আছে। ঝড় টর হলে তার বাড়িতে একতলা করে দালান উঠে যায়।"

বাসু বলল, "আমি দিই নি। এমনিতেই মাসের শেষ। এসব ঢপবাজিতে বিশ্বাস করি না"।

আমি কুণ্ঠিত হলাম। বউকে আজকের ঘটনা বলা যাবে না। ও বার বার একটা কথাই বলে। কেন আমি বাসুর মত স্মার্ট হলাম না। বাসু আমাদের অফিসের সব থেকে স্মার্ট ছেলে। কী করে লোককে কাটাতে হয়, ওর থেকে ভাল কেউ জানে না। প্রমোশনের সময়েও বসকে ভজিয়ে ভাজিয়ে ঠিক সেটাকে বাগিয়ে নেবে। হিসেবীও ভীষণ। আমি লক্ষ্য করি বাসুকে ভালোমত। চেষ্টা করি ওর মত হওয়ার। পারি না। এই যে আজ ঠিক হাসি মুখ দেখিয়ে কী সুন্দর নবীনদা টাকা নিয়ে গেল। এই হয়। বসু কিন্তু দিল না। আমার দ্বারা এই জন্য কিছু হয় না।

রঞ্জন গম্ভীর মুখে বসে ছিল। বাসু বলল, "কী রে বালটা, তুই গম্ভীর হয়ে বসে আছিস কেন?"

রঞ্জন ব্যাজার মুখে বলল, "ভাই আমি বড় মুরগী হয়ে গেলাম। একশো টাকা দিয়ে দিলাম বাড় খেয়ে। তোরা আগে বলবি তো। সেরকম জানলে আমিও দিয়ে দিতাম"।

সবাই হেসে উঠলাম। আমিও খুশি হলাম। যাক আমার তাহলে কমের উপর দিয়েই গেছে। নবীনদা দূরে দাঁড়িয়ে টাকা গুণছিল। রতন বলল, "শোন, এক কাজ করি। রঞ্জন, তুই এইচ আর ডিপার্টমেন্টে থেকে তো এদ্দিন কোন কাজে এলি না। এবারে দেখি তো, একটা কাজ কর"।

রঞ্জন অবাক হয়ে বলল, "কী করতে হবে?"

রতন বলল, "নবীন খুড়োর ঠিকানা বের কর ফাইল ঘেঁটে। রবিবার বলল না গ্রামের লোককে কী সব দেবে? চ আমরা ঘুরে আসি। একটা আউটিংও হবে, আর যদি সত্যি ঢপ মেরে টাকা তোলে, তাহলে অফিসে নালিশ করে মালকে সাসপেন্ড করাব"।

রঞ্জন এই প্রস্তাবে খুশি হয়ে বলল, "এটা ভাল বুদ্ধি করেছিস। চ' ভাই। আমার গাড়িটা কেনা হয়েছে। লং ড্রাইভের জন্য মন কেমন কেমন করে। সঙ্গীদের অভাবে যাওয়াও হচ্ছিল না কোথাও। চল, তোদের সঙ্গে ঘুরেই আসি।"

বাসু বলল, "ভাই বিয়ারটা কিন্তু..."

সবাই হেসে উঠলাম।

২।

রবিবারের সকাল। বাড়িতে ঢপ মারলাম। অফিসের ট্রেনিঙে পাঠানো হচ্ছে বলে। নইলে মা, বাবা, বউ সব মাথা খারাপ করে দিত প্রশ্ন করে করে। কেন যাচ্ছি, কী জন্য যাচ্ছি, হ্যান ত্যান।

রবিবার বলে রাস্তায় ভিড় কম। বাসে করে বাড়ির দুটো স্টপেজ পরে নামলাম। রঞ্জন গাড়ি নিয়ে আসতেই গাড়িতে হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল।

বাসু ঠিক কায়দা করে রঞ্জনের পাশের সিটটা ম্যানেজ করে নিয়েছে। পিছনে গাদা গাদি করে আমি, রতন আর তন্ময়। জানতাম, এটা হবে। মনটাকে অন্য দিকে নিলাম। সব সময় বাসুকে নিয়ে ভাবলে নিজেকে ছোট মনে হয়। বেহালা পেরিয়ে ডায়মন্ড হারবার রোড দিয়ে গাড়ি চলল। নবীনদার গ্রামে একবার ঢু মেরে বকখালি চলে যাব ঠিক করেছি। ওখানে মাছভাজা দিয়ে মদ টদ খেয়ে রাতে বাড়ি। কমপ্যাক্ট প্ল্যান। বাসুরই করা। বাসুই করে এসব প্ল্যান। আমরা দেখি।

রঞ্জনের গাড়ি চালানোর হাত বেশ ভাল হয়েছে দেখা গেল। রাস্তায় এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে কচুরি, মিষ্টি খেয়ে নিলাম। অনেকটা পথ। রঞ্জন চা খেয়ে হাত পা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ড্রাইভিং সিটে বসল।

তন্ময় আর রতন আলোচনা করতে লাগল বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যাপারে। এসব আমি বুঝি না। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে একটা সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন আমরা কলকাতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রঞ্জন নবীনদার গ্রাম কী করে যেতে হয় জানতে চাইল। এক চায়ের দোকানী জানাল সামনের রাস্তা দিয়ে এক কিলোমিটার যাবার পর বাদিকের রাস্তায় ঢুকে যেতে হবে।

রঞ্জন বুঝে নিয়ে রওনা দিল।

বা দিকের রাস্তায় ঢোকার পর রাস্তা খারাপ। পাকা রাস্তা তবে পুরো ভাঙা রাস্তা।

রতন বলল, “কী বে, এতো খুব বাজে রাস্তা। বাদ দে। গাড়ি ঘুরিয়ে বকখালি রওনা দি চ”।

রঞ্জন দাঁতে দাঁত চিপে বলল, “না, এসেছি যখন, দেখে যাবো, আমার টাকাটা কার গাঁড়ে গেলো।

আমরা হেসে উঠলাম।

বাস্তবিকই রঞ্জন খচে ছিল। আমরা বাসু রঞ্জনকে খ্যাপাতে শুরু করল।

দু কিলোমিটার ভাঙা রাস্তায় গাড়ির দুলুনি খেতে খেতে পৌঁছে দেখি রাস্তার পাশের একটা মাঠে প্রচুর লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু ছেলে ধমক দিয়ে সে সব লোককে সামাল দিচ্ছে। একটা ছোট্ট সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। সেখানে একেবারে লোক গিজগিজ করছে।

রঞ্জন বলল, “এটাই হবে বোধ হয়। চ তো গিয়ে দেখি”।

নবীনদা দূর থেকে রঞ্জনের গাড়ি দেখেছিল।

গাড়ি থামতেই ছুটে এসে বলল, “আরে তোমরা, বলে আসবে তো? ঈস... এসো এসো...”

নবীনদা হাঁক ডাক শুরু করে দিল।

কতগুলো ছেলে এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে সামিয়ানার তলায় বসিয়ে গেল।

নবীনদা গ্রামের লোকদের বকা ঝকা দিয়ে দেখলাম সবার হাতে একটা করে প্যাকেট তুলে দিচ্ছে। রতন ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলল, "ঢপ না রে। সত্যি"।

সব থেকে খুশি হল রঞ্জন। আমাদের বলল, "দেখ, দেখ, ভাল কাজে টাকা দিয়েছি। দেখেও শান্তি"।

আমরা হেসে চুপ করে গেলাম।

কিছুক্ষণ উসখুশ করে আমরা যখন উঠব উঠব করছি, নবীনদা ছুটে এসে বলল, "দাদাবাবুরা, এসেছো যখন, আমার বাড়ি চাট্টি ডালভাত খেয়ে যেতে হবে"।

আমরা আপত্তি করলাম। রতন বলল, "আরে নবীনদা বকখালি যাব ভাবছিলাম"।

নবীনদা জোরে মাথা নেড়ে বলল, "তা হতে দেব না। আমার গ্রামে এসেছো, আর না খাইয়ে পাঠাব। তা হতে দেব না। চল"।

কী গলার জোর, কী ব্যক্তিত্ব। অফিসের সেই চুপ করে থেকে সারাক্ষণ আমাদের চাটাচাটি সহ্য করা লোকটার সঙ্গে এই লোকটার কোন মিলই নেই!

অবাক হলাম। নবীনদা জোর করে আমাদের তার বাড়ি নিয়ে গেল।

আধ পাকা বাড়ি। এক দিকে চাল নেই। নবীনদা মনে হয় পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে চিন্তে চারটে চেয়ার নিয়ে এল। আমাদের বসিয়ে বলল, "ঝড়ে সব উড়ে গেছে। কিচ্ছু নেই। আমার তাও মাইনে আছে। একটা ঘর মেরামত করে সব নিয়ে আছি। আমাদের গ্রাম শেষ হয়ে গেছে গো। কলকাতায় আর কী ঝড় হয়েছে, আমাদের এখনো কারেন্ট আসে নি"।

আমরা মুখ চাওয়া চাউয়ি করলাম। নবীনদা আমাদের বসিয়ে ভিতরের ঘরে গিয়ে বউদিকে নিয়ে এল। বউদি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি লজ্জিত হলাম। কতবার বউদিকে নিয়ে কুকথা বলেছি নবীনদাকে। অথচ এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে খারাপ লাগছে। আমরা কত লোককে কত বাজে কথা বলি, অথচ জানিও না, কী ভুল করে ফেলি।

মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা আমাদের বললেন, "ওনাকে বোঝান দাদারা। মাইনের সব টাকা গ্রামে খরচ করে ফেলেছে। দু বিঘে চাষের জমি ছিল, সেটাও বলছে বিক্রি করে গ্রামের লোকেদের জন্য খরচ করবে। আপনারা একটু বোঝান"।

নবীনদা বউদিকে ধমকে ঘরের ভিতরে পাঠাল।

আমাদের চির চালাক বাসুর মুখটা কেমন ছোট হয়ে গেছে। রঞ্জন, রতন মাথা নিচু করে বসে আছে। আর আমি নবীনদার দিকে তাকাতে পারলাম না আর।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের বসিয়ে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, ডাল, আর আলুভাজা পরম যত্ন করে খাওয়াল নবীনদা আর তার বউ। এত তৃপ্তি করে বহুদিন খাই নি যেন।

খেয়ে দেয়ে উঠে নবীনদাকে জড়িয়ে ধরে বাসু হঠাৎ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে যা টাকা ছিল সব নবীনদার হাতে দিয়ে বলল, "দিও নবীনদা। গ্রামের লোককে দিও। আর আমায় ক্ষমা কর"।

নবীনদা হাঁ হাঁ করে উঠে বলল, "কী বল দাদাবাবু, আমি ব্যবস্থা করে নিয়েছি তো"।

বাসু বলল, "না। আমি করব। জমি টমি বেচতে হবে না। আমি করব। বলছি শোন। ওসব কোর না"।

ছোটখাটো চেহারার নবীনদা হেসে উঠল।

আমরা মুগ্ধ হয়ে সে হাসি দেখলাম।

একজন নিস্পাপ, সৎ, পরোপকারী মানুষের হাসি...

সাবান

“তুমি কোন ব্র্যান্ডের সাবান ব্যবহার কর?”
সোফায় বসে ফোন ঘাঁটতে ঘাঁটতে রমলা জিজ্ঞেস করল পম্পাকে।
এখনই এসেছে মেয়েটা। মেইড ডট কম নামের একটা অ্যাপ থেকে কাজের মেয়েটাকে পাওয়া গেছে। বেশি বয়স না। তিরিশ বত্রিশ হবে। গায়ের রঙ ময়লা। খুব একটা সুশ্রীও নয়। আগে যে ছিল, সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। রমলার একজন সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে দরকার ছিল।
পম্পা প্রশ্নটা বুঝল না। রমলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।
রমলা এবার পম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, “সাবান ব্যবহার কর তো?”
পম্পা মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ বউদি”।
রমলা বলল, “তো কোন সাবান ব্যবহার কর সেটাই জানতে চাইছি”।
পম্পা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, “ওই যে পাঁচ টাকায় যা পাওয়া যায়”।
রমলা নাক কুঁচকে পম্পার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “ঠিক আছে, আজ থেকে তুমি এখানেই থাকবে। বাইরের ঘরে যে ওয়াশরুমটা আছে। সেখানে স্নান করে নাও। শাড়ি, ব্লাউজ সব আছে। চেঞ্জ করে নাও”।
পম্পা ঘাড় নাড়ল, তবে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল।
রমলা বলল, “কী হল? কী চাই?”
পম্পা বলল, “বউদি মাইনেটা যেটা বলা আছে, সেটাই তো?”
রমলা বলল, “টেন কে তো? হ্যাঁ তাই হবে। এখানে থাকবে। বাড়ি যাবে না। ফোন করার হলে করবে, কিন্তু বাইরে থেকে কেউ যেন এই ফ্ল্যাটে না আসে। মনে থাকবে”?
পম্পা আবার ঘাড় নাড়ল।
রমলা বলল, “ছুটি বেশি দিতে পারব না”।
পম্পা বলল, “ঠিক আছে বউদি। আমি একা বিধবা মেয়ে, ছুটি নিয়ে কী করব?”
রমলা খুশি হল, কিন্তু বুঝতে দিল না। বলল, “যাও। দাঁড়িয়ে থেকো না। ভাল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসো। তারপর বলছি কী করতে হবে”।
পম্পা যাওয়ার আগে দেওয়ালের দিকে তাকাল। রমলা আর অতীনের ছবি।
বলল, “বউদি, দাদা কোথায়?”
রমলা বলল, “দাদা মারা গেছেন। বেশি প্রশ্ন কোর না। যাও দয়া করে”।
পম্পা অতীনকে দেখতে দেখতে ঘর থেকে বেরোল।
রমলার ফোন বেজে উঠল।
পীযূষ ফোন করছে। রমলা ধরল, “হ্যাঁ, বল”।
পীযূষ বলল, “এলো? কামওয়ালী বাঈ? ফ্রম মেইড ডট কম?”
রমলা বলল, “এসেছে। একেবারেই ক্লাস নেই বুঝলে। বলে পাঁচ টাকার সাবান ইউজ করে নাকি। ব্লাডি লো ক্লাস, শিট”।

পীযূষ হাসল, “সে তুমি ঠিক করে নেবে আমি জানি নিজের মত করে। ওসব নিয়ে ভাবছি না। যাই হোক, আজ আসব নাকি?”

মধ্য চল্লিশের রমলা আয়নার দিকে তাকাল। আসতে বলবে? আসুক।

বলল, “শিওর। এসো”।

পীযূষ বলল, “না, তোমার নিউ বাঈ কিছু মনে করে যদি?”

রমলা বলল, “কী মনে করবে? আর ও কী মনে করবে তার জন্য আমি চুপ করে থাকব নাকি? অবশ্য এটা ঠিক, ওর কৌতূহল কম নয়। অতীনের কথা জিজ্ঞেসও করে ফেলেছে এর মধ্যে”।

পীযূষ বলল, “এগুলো মেয়েলী কৌতূহল। সবার হয়”।

রমলা রেগে গেল, “মেয়েলী কৌতূহল আবার কী কথা? সব কিছুকেই মেয়েলী বলেই দাগিয়ে দাও কেন তুমি?”

পীযূষ হেসে ফেলল, “ওকে ওকে। ওসব কিছু বলব না। রেগে যেও না। আচ্ছা এখন রাখছি, সন্ধ্যেয় দেখা হচ্ছে”।

রমলা একটু থমকে বলল, “সুনয়নাকে কী বলবে?”

পীযূষ বলল, “কেন? অফিসে কি মিটিং এর অভাব আছে নাকি? ওসব নিয়ে ভেবো না। গেট রেডি ফর টু নাইট”।

রমলা হেসে ফোনটা রেখে সামনের ঘরে গেল।

বাথরুম থেকে জলের শব্দ আসছে। মেয়েটা মনে হয় মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে স্নান করে।

বিরক্ত হল খানিকটা।

দরজা নক করল রমলা। জল পড়ার শব্দ বন্ধ হল। পম্পা বাথরুমের দরজা খুলে মুখ বাড়াল, “হ্যাঁ দিদি”।

রমলা বলল, “ওভাবে স্নান করে না। শাওয়ার ছেড়ে নাও”।

পম্পা হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, “হ্যাঁ?”

রমলা বলল, “সর। দরজা খোল”।

পম্পা সরল। বিবস্ত্র হয়ে স্নান করছিল। সিঁটিয়ে দাঁড়াল। রমলা শাওয়ারের নব দেখিয়ে বলল, “এইটা ঘুরিয়ে দাও। জল পড়বে, দাঁড়িয়ে থাকবে। হয়ে গেলে নবটা বন্ধ করে দেবে। বুঝেছো?”

পম্পা মাথা নাড়ল।

রমলা বেরিয়ে গেল বাথরুম থেকে। তবে দাঁড়াল দরজার বাইরে। পম্পা দরজা বন্ধ করল।

রমলা শাওয়ারের শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করল। সেটা কানে আসতে দরজা থেকে সরে আবার আগের ঘরে গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ পর পম্পা গা মুছে চেঞ্জ করে বেরোল।

রমলা বলল, “এসো তোমাকে রান্নাঘর ব্যবহার করা শিখিয়ে দি”।

পম্পাকে নিয়ে কিচেনে ঢুকল রমলা।

মধ্যবিত্তের রান্নাঘর নয়।

উচ্চবিত্তের কিচেন। ফ্রিজ থেকে গ্যাস, সব শেখানোর প্রয়োজন আছে। পম্পার খানিকটা ক্লাস নেওয়ার পর রমলা বুঝল, মেয়েটার তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। সে খুশি হল, তবে প্রকাশ করল না।

সবজি কাটতে কাটতে পম্পা জিজ্ঞেস করল, “দাদার কী হয়েছিল বউদি?”

রমলা বলল, “হার্ট অ্যাটাক। তোমাকে বলেছি না, বেশি প্রশ্ন করবে না। এই ফ্ল্যাটে কী হচ্ছে, না হচ্ছে, সেসব নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার যেটা কাজ, সেটায় মন দেবে শুধু। মাথায় ঢুকল, কী

বলতে চাইছি?”
পম্পা ঘাড় নাড়ল।
রমলা ডিপ ফ্রিজ থেকে মাছ বের করে বলল, “পাবদা আছে। কালো জিরে দিয়ে রাঁধো। মিক্সড ভেজ করে নাও। বুঝেছো?”
পম্পা বলল, “হ্যাঁ বউদি”।
রমলা বেরিয়ে যাচ্ছিল। কী মনে হতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, “সন্ধ্যেয় আমার এক বন্ধু আসবে। ওর সামনে আবার বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করে দিও না আমাকে। যা বলব, সেটুকু করবে শুধু। ঠিক আছে?”
পম্পা ঘাড় নাড়ল।
২।
সন্ধ্যেবেলা। রমলা স্যালাড কাটতে শিখিয়ে দিচ্ছিল পম্পাকে। কলিং বেল বাজল।
রমলা পম্পাকে বলল, “মনে রেখো, যেমনটা বলেছি। কোন প্রশ্ন করবে না। আর একবারও ও ঘরে যাবে না। কেমন?” পম্পা মাথা নাড়ল।
রমলা দরজা খুলল।
পীযূষ একটা দামী বিদেশী চকলেটের বাক্স হাতে দাঁড়িয়ে আছে। রমলা দরজা ছেড়ে দাঁড়াতে পীযূষ ফ্ল্যাটে ঢুকে বলল, “সো, হোয়ার ইজ শি?”
রমলা বলল, “কিচেন”।
পীযূষ চকলেটের বাক্সটা রমলাকে দিয়ে বলল, “ইওর ফেভ্রেট”।
রমলা হাসল, “এসো”।
ড্রয়িং রুমে বসল পীযূশ। রমলা বলল, “আসছি”।
পীযূষ বলল, “দেরী হবে?”
রমলা বলল, “একবারেই না। জাস্ট এক মিনিট”।
পীযূষ সোফায় বসল।
রমলার এক মিনিটেরও কম সময় লাগল। একটা ট্রেতে স্যালাড, স্ন্যাক্স, স্কচের দুটো গ্লাস নিয়ে টেবিলে রেখে বলল, “হেল্প ইওরসেলফ”।
পীযূষ বলল, “থ্যাংক্স। কিন্তু আমার পিপাসা কি এতে মিটবে?”
রমলা ক্লান্ত গলায় বলল, “অন্তত দুটো পেগ চড়াতে দাও। সারাদিন একে শিখিয়ে শিখিয়ে টায়ার্ড হয়ে গেলাম। একবারে অশিক্ষিত একটা। কোন ক্লাস নেই”।
পীযূষের হাত নিমেষে রমলার কোমরে গেল। রমলা পাতলা শিফনের শাড়ি পরে ছিল। পীযূষের হাত খেলা করতে শুরু করল রমলার শরীরে। রমলা চোখ বন্ধ করল। শরীর জাগছে।
সে মৃদু গলায় বলল, “দ্যাটস দ্য বেস্ট পার্ট অফ ইউ সুইটহার্ট। ইউ নো থিংস”।
পীযূষ এই কথাটার অপেক্ষায় ছিল। রমলার আরো কাছে ঘেঁষে সে রমলার ঘাড়ে চুমু খেল।
রমলা শিউরে উঠল আশ্লেষে। পীযূষকে প্রশ্রয় দিল।
পীযূষ সক্রিয় হতে শুরু করল।
রমলাও। শ্বাস ভারী হতে শুরু করল দুজনের। পীযূষের হাত রমলার শরীরে ঘোরাফেরা করতে শুরু করল। রমলা ঠোঁট কামড়ে পীযূষের জামা খামচে ধরল।
“খাবার দেব বউদি”?
মারাত্মক একটা ছন্দপতন ঘটল।

রমলা দেখল দরজায় পম্পা এসে দাঁড়িয়েছে। পীযূষ সরে গেল। অবিন্যস্ত পোষাকে রমলা চেঁচিয়ে উঠল, “গেট লস্ট। বেরোও এখান থেকে। তোমাকে কী বলেছিলাম আমি?”

পম্পা নিমেষে ছাই হয়ে পালিয়ে গেল।

রমলা বিরক্ত মুখে পীযূষকে বলল, “আমি একটু আসছি। একে এই মুহূর্তে বের করে দেব আমি। এটা ইচ্ছে করে করল বুঝতে পারলে? মজা দেখতে এসেছে। উফ! একে আমি রাখব না। কিছুতেই না”।

পীযূষ রমলার হাত ধরে আটকালো, “আহ... ছাড়ো না। জাস্ট লিভ ইট। বেডরুমে চল”।

রমলা পীযূষের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, “ভাল লাগছে না এখন। ছাড়ো”।

পীযূষ রমলাকে জড়িয়ে ধরতে গেল, “ছাড়ো না, কেন মাথা গরম করছো?”

রমলা ছাড়িয়ে নিল, “ভাল লাগছে না। আমি একে রাখব না”।

পীযূষ রমলার উরুতে হাত রাখল, “ওকে। রেখো না। বাট প্লিজ, ডোন্ট স্পয়েল দিস নাইট। প্লিজ। ওই সাইটে রিপ্লেসমেন্ট চাইবে। পেয়ে যাবে। কালকেই পাল্টে দেবে মেয়েটাকে। এখন রেগে যেও না। ঠান্ডা হও”।

রমলা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, “ওকে। ওকে। কিন্তু আমার রিপ্লেসমেন্ট চাই। তাড়াবোই”।

পীযূষ বলল, “উফ। ঠিক আছে তাড়িও। প্লিজ। ঠান্ডা হও”।

রমলা বলল, “মাথা ব্যথা করছে। ভাল লাগছে না”।

পীযূষ হাল ছেড়ে দিল, “ওকে। টেক ইওর টাইম”।

রমলা গলা তুলল, “পম্পা। এদিকে এসো”।

কেউ এল না।

রমলা আবার গলা তুলল, “পম্পা, আমি ডাকছি। এদিকে এসো”।

পম্পা ধীর পায়ে ভয়ে ভয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

রমলা বলল, “তুমি এখন এলে কেন? তোমাকে বলেছিলাম আমি, যে না ডাকলে আসবে না?”

পম্পা ঘাড় নাড়ল, “ভুল হয়ে গেছে বউদি”।

রমলা ফুঁসছিল। বলল, “সভ্যতা ভদ্রতা জানবে সেটা আশাও করি না, কিন্তু যেটা বলব, সেটা শুনবে সেটা তো আশা করতেই পারি। তাই না? তুমি বাড়ি চলে যাও। তোমাকে আর থাকতে হবে না। আমি তোমার কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে নেব”।

পম্পা কোন কথা বলল না। কোথাও গেলো না।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রমলা বলল, “কী হল? যাও!”

পম্পা রমলার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “সাবানটা খুব ভাল বউদি। ওটা নিয়ে যাব?”

রমলা অবাক একবার পম্পা আরেকবার পীযূষের দিকে তাকাল।

তারপর পম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, “মানে?”

পম্পা মাথা নিচু করে বলল, “আজকের হিসেবে যে টাকাটা হয়, সেটা নেব না। সাবানটা নিয়ে যাই বউদি? খুব ভাল গন্ধ। আপনার মত আমার বরও মরেছে কিছুদিন আগে। একা থাকি, কেউ খোঁজও নিতে আসে না। নিয়ে যাব সাবানটা? যদি এই সাবানের গন্ধে কেউ খোঁজ নিতে আসে?”

অদ্ভুত একটা আর্তি ঝরে পড়ল পম্পার গলায়।

রমলা কেঁপে উঠল প্রশ্নটা শুনে। পম্পাকে কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না।

পম্পা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রমলার উত্তরের প্রতীক্ষায়...